উপনিষৎ-প্রসঙ্গ

তৃতীয় খণ্ড

কেনোপনিষৎ

শ্রীমৎ অনির্বাণ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
বর্ধমান

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত-প্রসার-গ্রন্থমালা—৮

উপনিষৎ-প্রসঙ্গ

তৃতীয় খণ্ড

কেনোপনিষৎ

শ্রীমৎ অনির্বাণ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
বর্ধমান
১৯৯৮

Upanishat Prasanga
(Volume III : KENOPANISHAT)
By Srimat Anirban 1984

প্রথম প্রকাশ ঃ শ্রীপঞ্চমী ১৩৯০
৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৭ই কার্তিক ১৪০৫
৪ নভেম্বর ১৯৯৮

মূল্য ঃ ৩০ টাকা

প্রকাশক ঃ
মৃদুলকান্তি সেন
ইন-চার্জ, পাব্লিকেশন্‌স্‌ ইউনিট
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
বর্ধমান ৭১৩ ১০৪

মুদ্রক ঃ
অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়
জ্ঞানোদয় প্রেস
৫৫বি কবি সুকান্ত সরণি
কলিকাতা ৭০০ ০৮৫

[১১০০]

নিবেদন

উপনিষৎ-প্রসঙ্গের তৃতীয় খণ্ডে আলোচিত হল সামবেদের অন্তর্গত 'কেনোপনিষৎ'। এটি ওই বেদের জৈমিনীয়শাখার জৈমিনীয়োপনিষদ্-ব্রাহ্মণের অংশবিশেষ। এই শাখাটির এখন তেমন প্রচার নাই। অথচ মরমীয়া রীতিতে অধ্যাত্মবিদ্যার রহস্যাখ্যানে সমগ্র ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে এর জুড়ি মেলে না। জৈমিনীয়োপনিষদ্-ব্রাহ্মণটি আরণ্যকধর্মী, তার নিষ্কর্ষ হল 'কেনোপনিষৎ' তাইতে উপনিষৎটির আলোচনা করা হয়েছে ওই আকর-গ্রন্থের ভিত্তিতে।

ঋক্‌সংহিতা 'শস্ত্র' বা কবিতায় দেবপ্রশস্তির সংকলন। কবিতার কথায় 'সাম' বা সুর বসালে তা হয় 'স্তোত্র'। গানগ্রন্থসমেত সামবেদসংহিতা দেবস্তোত্রের সংকলন। শস্ত্রাবলম্বনে ঋগ্‌বেদের সাধনা যেমন 'উক্‌থ', তেমনি স্তোত্রাবলম্বনে সামবেদের সাধনা হল 'উদ্‌গীথ'। শেষপর্যন্ত একটি সাধনা 'মননে'র বা জপের, আরেকটি 'কীর্তনে'র। ঋগ্‌বেদে দেবতার 'নামের মনন' এবং 'নামের কীর্তন' দুয়ের কথাই আছে। একই বাণীর সাধনায় এরা দুটি ধারার দ্বিবেণী। উভয়ের পরম আলম্বন হল একপদী বাক্‌ বা ওঙ্কার— ঋক্‌সংহিতায় যা দেবতার 'অপীচ্য' বা 'গুহ্য' নাম। উক্‌থ উদ্‌গীথ হয়ে ওঠে—মন্ত্রের মনীষাসহগত মননের ফলে যখন হৃদয়ে সুর জাগে। কেনোপনিষদে সেই সুর-ব্রহ্মকে বলা হয়েছে 'বন' বা বঁধু। তাঁকে পাওয়ার অর্থ হল প্রজ্ঞানের আনন্দে পর্যবসান। ঐতরেয়োপনিষদের মহাবাক্য যেমন 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম', তেমনি কেনোপনিষদের মহাবাক্য 'তদ্‌ বনম্‌'। এই আনন্দ রূপ ধরে আকাশের 'যক্ষ' বা অনির্বচনীয় রিক্ততায় হৈমবতী উমার আবির্ভাবে। তিনিই এই উপনিষদের মর্মাধিষ্ঠাত্রী।

উপনিষৎটি রচিত হয়েছে আচার্য এবং অন্তেবাসীর মধ্যে সংলাপের আকারে। মরমী হৃদয়ের উদ্বেলন তার মধ্যে একটি নিবিড় নাট্যরসের সঞ্চার করেছে।

'ধর্মসভা'য় এই উপনিষদের উপর ভাষণ দেওয়ার সময় তার টেপ-রেকর্ডিং এবং অনুলেখন করা হয় পদ্মশ্রী শ্রীমতী বীণা দাসের উদ্যোগে। অনুলেখনটি গ্রন্থরচনার সময় আমাকে অনেক সাহায্য করেছে। এবারও নির্ঘণ্টটি করে দিয়েছেন শ্রীমতী নারায়ণী দেবী। গ্রন্থের মুদ্রণব্যয় বহন করেছেন

এলাহাবাদের বন্ধু শ্রীতেজেশচন্দ্র ঘোষ। মুদ্রণ ব্যাপারে সহায়তা করেছেন শ্রীবিমলশংকর ধর। এঁদের সবাইকে আমার গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই।

হৈমবতী সবার হৃদয়াকাশে বহুশোভায় বিদ্যোতিত হ'ন—এই প্রার্থনা।

"হৈমবতী" অনির্বাণ

বিজয়া, ১৮৯১ শকাব্দ

প্রাক্‌কথন

শ্রীমৎ অনির্বাণ তাঁর রচিত উপনিষৎ-প্রসঙ্গের দু'টি খণ্ড বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রকাশ করার অনুমতি দান ক'রে ধন্য করেছিলেন। এর তৃতীয় খণ্ডটি তাড়াতাড়ি প্রকাশ করার জন্য তখন তিনি নিজেই উদ্যোগী হ'ন এবং শ্রীগৌতম ধর্মপাল সেটি প্রকাশ করেন। তিনটি উপনিষৎ-প্রসঙ্গেরই প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হ'য়ে যাওয়াতে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাঁদের প্রকাশিত প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডটির পুনর্মুদ্রণ করেছেন। তৃতীয় খণ্ডটিও পুনর্মুদ্রণের জন্য শ্রীগৌতম ধর্মপাল হৈমবতী-অনির্বাণ ট্রাস্টের পক্ষ থেকে বর্ধমান বিশ্ব-বিদ্যালয়ের হাতেই এবার তুলে দিয়েছেন। সে-হিসাবে তিনটি খণ্ডই এখন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনার অন্তর্গত হওয়াতে ক্রেতা বা পাঠকবর্গের পক্ষে সন্ধান করতে আর কোন অসুবিধা হবে না এবং সকলেই সেজন্য হৈমবতী-অনির্বাণ ট্রাস্ট ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়কে আন্তরিক কৃতজ্ঞ অভিনন্দন জানাবেন, সন্দেহ নেই।

শ্রীমৎ অনির্বাণ প্রজ্ঞা ও মনীষার ক্ষেত্রে এক পরম বিস্ময়। এযুগে বেদ ও উপনিষদের মর্মাবগাহী যে ভাষ্য তিনি রচনা ক'রে দিয়ে গেলেন তার আলোক সুদূরপ্রসারী এবং তা অনুসরণ ক'রে ভবিষ্যতের অনেক সাধক ও গবেষক তাঁদের আপন আপন লক্ষ্যে উপনীত হ'তে পারবেন। যাঁরা শুধু অর্থ বুঝতে চা'ন অথবা যাঁরা তত্ত্ব উপলব্ধি করতে চা'ন, দুইয়ের পক্ষেই তিনি নির্ভরযোগ্য দিশারী। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে তাঁর জীবদ্দশায় তিনি অন্ততঃ তিনখানি উপনিষদের বিস্তৃত ব্যাখ্যা লিখে যেতে পেরেছেন, যার মধ্যে শুক্ল যজুর্বেদের ঈশোপনিষৎ, ঋগ্বেদের ঐতরেয়োপনিষৎ এবং সামবেদের এই কেনোপনিষৎ স্থান পেয়েছে। ঋক্-সাম-যজু এই ত্রয়ীর ত্রিতন্ত্রীতেই তাঁর অনুপম ভাষ্য ঝংকৃত হ'য়ে এক পরম ঐকতান সৃষ্টি করে গিয়েছে। এই খণ্ডে বিশেষ ক'রে কাব্য যেন সংগীতে উত্তীর্ণ হয়েছে, 'শস্ত্র' বা কবিতায় দেবপ্রশস্তি 'স্তোত্র' বা গানে রূপান্তরিত হয়েছে, মনন হয়ে দাঁড়িয়েছে কীর্তন।

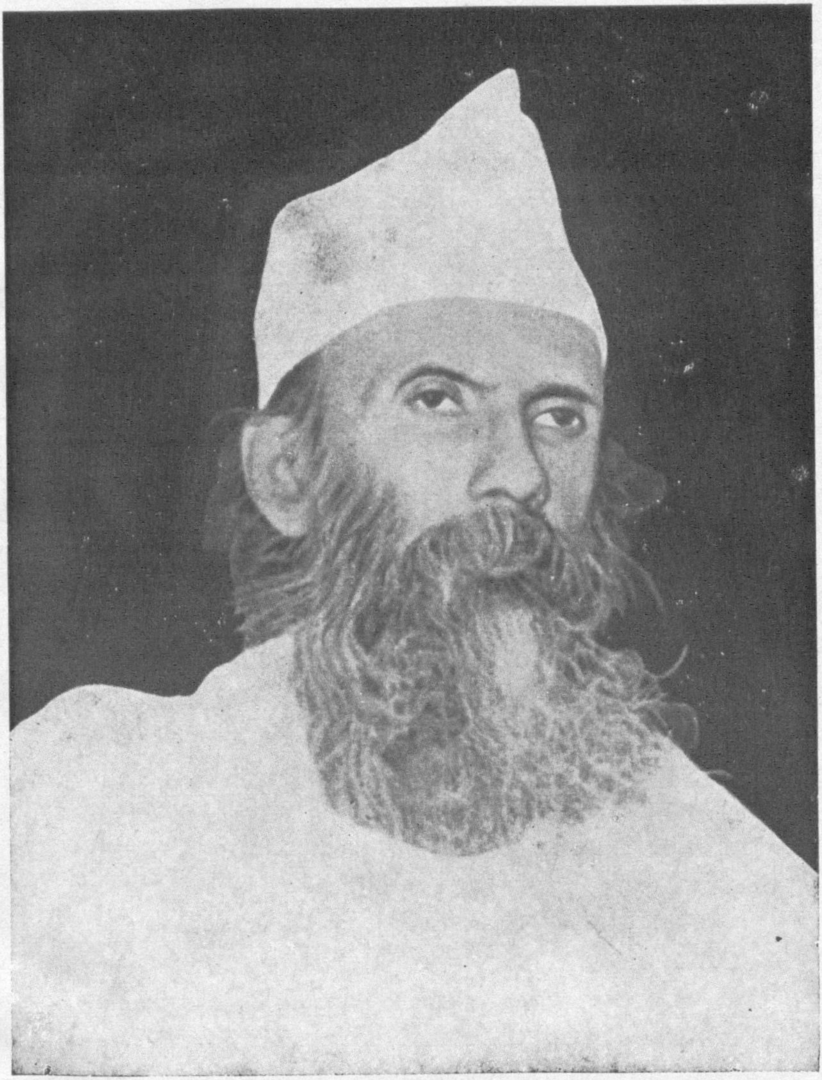
শ্রীমৎ অনির্বাণ এখন লোকান্তরিত। আকাশের শূন্যতায়, অনির্বচনীয় রিক্ততায় জীবনেও যেমন তিনি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তেমনি সেই রিক্ততার মধ্যেই বহুশোভমানা বিবিধবর্ণরঞ্জিতা বাগ্‌বাদিনী হৈমবতী উমার আবির্ভাব ঘটেছিল, যিনি তাঁর তনুটি মেলে ধরেছিলেন অসংকোচে সর্ব আবরণ মুক্ত ক'রে এই

মহাসাধকের কাছে। এই উপনিষদের মর্মাধিষ্ঠাত্রী উমা হৈমবতীই তাই ছিলেন তাঁর একমাত্র আরাধ্যা ও আশ্রয়স্বরূপা। তাঁর দিব্য স্বরূপ তিনি যতটুকু উদ্ঘাটন ক'রে দিয়ে গিয়েছেন, আশা করি তার মাধ্যমে পাঠকমাত্রেরই পক্ষে বরদা বেদমাতার অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভ করার সুযোগ ঘটবে এবং 'হৈমবতী সবার হৃদয়াকাশে বহুশোভায় বিদ্যোতিত হ'ন'। তাঁর এই শেষ প্রার্থনাও সার্থক হবে।

শ্রীপঞ্চমী
১৩৯০ বঙ্গাব্দ

গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র



মনীষী শ্রীমৎ অনির্বাণ

জন্ম : ২৪ আষাঢ় ১৩০৩ তিরোভাব : ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৫

উপনিষৎ-প্রসঙ্গ

কেনোপনিষৎ

ভূমিকা

কেনোপনিষৎ সামবেদের অন্তর্গত। সাম মানে 'স্বর' বা সুর।[১] ঋক্-মন্ত্রে সুর বসিয়ে গান করা হত—কেবল সোমযাগে, যা সমস্ত যাগের শ্রেষ্ঠ। মন্ত্রগুলিকে বলা হত সামের যোনি। সামবেদ সামের যোনিমন্ত্র এবং স্বরলিপির সংগ্রহ—ব্রাহ্মণে তার প্রয়োগ এবং রহস্যের বিবৃতি। ঋত্বিকদের মধ্যে যাঁরা সামগান করতেন, তাঁদের প্রধান ছিলেন উদ্গাতা, তাইতে গানের ব্যাপারের সংজ্ঞা হল 'ঔদ্গাত্র কর্ম'। ব্রাহ্মণে এই কর্মের এবং আরণ্যকে ও উপনিষদে তার রহস্য ও তত্ত্বের আখ্যান। সোম আনন্দতত্ত্ব,[২] গান বাকের আশ্রিত একটি 'নান্দন'শিল্প।[৩] সামগানের চরম উল্লাস তার 'উদ্গীথে'।[৪] ঐতরেয়োপনিষৎ-প্রসঙ্গে যেমন দেখেছি ঋগ্বেদের সাধনা 'উক্থে'র, তেমনি সামবেদের সাধনা 'উদ্গীথে'র। এই বেদের উপনিষৎ-প্রতিপাদিত তত্ত্বে ঋষিরা পেঁছেছিলেন আনন্দগীতির মাধ্যমে—এই ইঙ্গিতটি মনে রাখা ভাল।

সামবেদের বহু শাখার মধ্যে মাত্র তিনটি অবশিষ্ট আছে—'গুর্জর দেশে (এবং বাংলায়) কৌথুমী, কার্ণাটকে জৈমিনী, মহারাষ্ট্রদেশে রাণায়নী।'[৫] চরণব্যূহসূত্রের মতে কৌথুমী এবং জৈমিনীয়েরা রাণায়নীয়দেরই অবান্তর ভেদ।[৬] আমরা কৌথুমীশাখার সঙ্গেই বিশেষভাবে পরিচিত। জৈমিনীশাখার গ্রন্থ মাত্র সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এই শাখার জৈমিনীয়ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণসাহিত্যে শতপথব্রাহ্মণেরই মত একটি বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী। এতে যত রহস্যোক্তি আছে, এমন আর-কোনও ব্রাহ্মণে নাই। এ যেন বৈদিক ভাবনা-সাধনার এক অনন্য আকর। অথচ এর উপর কোনও ব্যাখ্যাগ্রন্থ আজও পাওরা যায়নি।

সামবেদের যেসব ব্রাহ্মণ এখনও পাওরা যায়, তাদের মধ্যে তিনটি প্রধান—তাণ্ড্য, ছান্দোগ্য এবং জৈমিনীয়। কিন্তু তাণ্ড্য আর ছান্দোগ্য একই তাণ্ডিসম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ এবং দুটিতে মিলিয়ে এদের নাম ছিল চল্লিশ অধ্যায়ের 'চত্বারিংশব্রাহ্মণ'—এমন-একটা প্রাচীন প্রসিদ্ধি আছে।[৭] তাহলে বস্তুত সামবেদের প্রধান ব্রাহ্মণ দুটি—চত্বারিংশ এবং জৈমিনীয়। চত্বারিংশব্রাহ্মণের প্রথম পঁচিশ অধ্যায়ের নাম পঞ্চবিংশ বা তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ। তারপর পাঁচটি অধ্যায়

বা প্রপাঠকে তার অনুবৃত্তি 'ষড়্‌বিংশব্রাহ্মণে'। তারপর দশটি প্রপাঠকে ছান্দোগ্য- বা মন্ত্র- বা উপনিষদ্‌-ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণের শেষ আটটি অধ্যায় বিখ্যাত ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

জৈমিনীয়ব্রাহ্মণের মোটের উপর আটটি অধ্যায়। প্রথম তিনটি অধ্যায়ে বা কাণ্ডে বর্ণিত হয়েছে কর্মকাণ্ড। এর বিষয়বস্তু চত্বারিংশব্রাহ্মণের প্রথম বত্রিশ অধ্যায়ের অনুরূপ। তারপর চার হতে সাত অধ্যায়ের নাম উপনিষদ্‌ব্রাহ্মণ—যা ছান্দোগ্যোপনিষদের অনুরূপ। শেষ অধ্যায়টির নাম আর্ষেয়ব্রাহ্মণ। আমাদের আলোচ্য কেনোপনিষৎ জৈমিনীয়ব্রাহ্মণের সপ্তম অধ্যায়ের (উপনিষদ্‌-ব্রাহ্মণের চতুর্থ অধ্যায়ের) অষ্টাদশ খণ্ডে আরম্ভ হয়ে একবিংশ খণ্ডে শেষ হয়েছে। এই উপনিষৎটিকে বলা যেতে পারে উপনিষদ্‌-ব্রাহ্মণের নিষ্কর্ষ এবং তার আলোচনা ওই ব্রাহ্মণেরই পরিপ্রেক্ষিতে হওয়া সঙ্গত। জৈমিনীয় উপনিষদ্‌-ব্রাহ্মণকে কেউ-কেউ বলতে চান জৈমিনীয়োপনিষৎ। এই নামকরণ সমীচীন, কেননা এটি ছান্দোগ্যোপনিষদেরই অনুরূপ। দুটিই আরণ্যকধর্মী।

চত্বারিংশ এবং জৈমিনীয় দুটি ব্রাহ্মণের বিষয়বস্তু এবং তার বিন্যাসে বেশ সাদৃশ্য আছে। দুয়ের মধ্যেই উপনিষদ্‌ভাগের প্রাধান্য লক্ষণীয়। কিন্তু দুটি উপনিষদের বিবৃতি এক রীতিতে নয়। ছান্দোগ্যের বাচনভঙ্গি বেশ গোছানো এবং আঁটসাঁট, কিন্তু জৈমিনীয়ের বাচন মরমীয়ার সন্ধাভাষায়। তার মধ্যে কেনোপনিষদের বিবৃতি গাঢ়বন্ধ হলেও তার প্রবক্তা যে একজন নেপথ্যচর মরমীয়া, তা তাঁর বলার ধরন থেকে বেশ বোঝা যায়। সন্ধাভাষার বাহুল্যের জন্যই সম্ভবত জৈমিনীয়োপনিষৎ ক্রমে বিরলপ্রচার হয়ে গেছে এবং অপেক্ষাকৃত স্পষ্টতার জন্য তার অন্তঃস্থ কেনোপনিষৎটি এখনও টিকে আছে। এইভাবে দেখলে উপনিষৎটির প্রথম দুটি খণ্ড পদ্যে রচিত বলে যাঁরা সমস্ত উপনিষৎ-টিকেই অর্বাচীন বলতে চান, তাঁদের যুক্তি খুব জোরালো মনে হয় না। বস্তুত পদ্যাংশগুলি ব্রহ্মবিদ্যাবাচক প্রাচীন শ্লোকের সংগ্রহ। এমন শ্লোকের উল্লেখ বৃহদারণ্যকোপনিষদেও আছে। তার মধ্যে দুটি শ্লোক একেবারে কেনোপ-নিষদের অনুরূপ।[৮] ব্রাহ্মণের মধ্যেও এমনতর গাথা ঋক্‌ বা শ্লোক অনেক পাওয়া যায়। কেনোপনিষৎ স্বতন্ত্র কিছু নয়—জৈমিনীয়োপনিষদের আবহেই তা রচিত।

জৈমিনীয়ব্রাহ্মণের আরেক নাম 'তলবকারব্রাহ্মণ'। তলবকার একজন সম্প্রদায়প্রবর্তক ঋষি – পাণিনিসূত্রের গণপাঠ থেকে আর জৈমিনীয়গৃহ্যসূত্র থেকে এইটুকু মাত্র জানা যায়।[৯] জৈমিনির সঙ্গে তাঁর কি সম্পর্ক তা বোঝা যায় না। মাধ্যন্দিনসংহিতায় পাই, 'আনন্দায় তলবম্‌' অর্থাৎ তলব পুরুষমেধের একটি পশু, তাকে উৎসর্গ করতে হবে আনন্দদেবতার উদ্দেশে।[১০] তৈত্তিরীয়-

ব্রাহ্মণভাষ্যে সায়ণ বলেন, তলব ঢাক বাজায় অথবা গালবাদ্য করে।[১১] শব্দটি বাদ্যে উপচরিত হওয়া সম্ভব। তাহলে 'তলবকার' সংজ্ঞার অর্থ দাঁড়ায় আনন্দ-বাদ্যকার। সোমযাগ ও সামগানে তার অনুষঙ্গ লক্ষণীয়।[১২] ঋষি মহিদাস ঐতরেয়ের মতই তলবকার বা জৈমিনি একটি অখণ্ড ব্রাহ্মণগ্রন্থের প্রবক্তা। তলবকারের নাম জৈমিনির নামের আওতায় পড়ে গেছে। শৌনকের চরণব্যূহ-সূত্রে জৈমিনির নাম আছে, তলবকারের নাম নাই। ভাগবতপুরাণেও কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন জৈমিনিকেই সামবেদ বা ছন্দোগসংহিতা পড়িয়েছিলেন বলা হয়েছে।[১৩] সুতরাং জৈমিনিকেই আমরা এক্ষেত্রে প্রমাণপুরুষ বলে গণ্য করব যদিও কেনোপনিষদের আরেক নাম তলবকারোপনিষৎ।

জৈমিনীয়ব্রাহ্মণের প্রথম তিন অধ্যায়ে বা কাণ্ডে তাণ্ড্যব্রাহ্মণেরই মত একাহ অহীন দ্বাদশাহ সূত্র গবাময়ন প্রভৃতি সোমযাগের ঔদ্গাত্রকর্মের[১৪] বিবৃতি আছে। কিন্তু জৈমিনীয়ব্রাহ্মণের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, তার আরম্ভ অগ্নিহোত্রযজ্ঞের রহস্যাখ্যান দিয়ে—যা সোমযাগের অন্তর্ভুক্ত নয় বলে এখানে অনুপেক্ষিত। কিন্তু অগ্নি সব যজ্ঞের মূলাধার। সোমাহুতিও অগ্নিতেই দিতে হয়। তাছাড়া যে-শ্রৌতযজ্ঞের প্রধান লক্ষ্য নিঃশ্রেয়স, তার আদিমতম এবং সরলতম রূপ হল 'অগ্নিহোত্র'। অগ্নিহোত্র একটি নিত্যকর্ম, কোনও কারণেই তাকে বাদ দেওয়া চলে না। রহস্যদৃষ্টিতে অগ্নির সঙ্গে সোমের সম্পর্ক অতি নিবিড়। বেদে 'অগ্নীষোম' একটি যুগনদ্ধ তত্ত্ব—সুষুম্ণতন্তুতে যাদের উজান-ভাটার কথা[১৫] সন্ধাভাষায় ঋক্‌সংহিতার সোমমণ্ডলে বহুপ্রপঞ্চিত। এইদিক দিয়ে সামবেদের ব্রাহ্মণের গোড়াতেই অগ্নিহোত্রের সমীক্ষা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

ব্রাহ্মণকার এ-প্রসঙ্গে বলছেন, 'তাইতো তাঁরা বলেন, কি দিয়ে আহুতি দেয়, কিসেই-বা দেয়? না প্রাণ দিয়েই আহুতি দেয় প্রাণে। তাইতো এই যে অগ্নিমন্থন করেন (ঋত্বিকেরা), তাতে তাঁরা যজমানেরই প্রাণবৃত্তিদের জন্ম দেন।...মথ্যমান অগ্নির ভস্ম পড়ে থাকে। তা হল এই (যজমানের) অন্ন। সঙ্গে-সঙ্গে ধোঁয়া ওঠে এঁকেবেঁকে, তাইতে তার মনের জন্ম হয়।...এমনি করে অগ্নিমন্থনের সঙ্গে-সঙ্গে যজমানের মন চক্ষু শ্রোত্র প্রাণ এবং বাক্‌—এই পঞ্চপ্রাণের জন্ম হয় ওই অগ্নি হতে। তারা দিব্য প্রাণবৃত্তি। যজ্ঞের আহুতি ওই দেবতাদের মধ্যেই দেওয়া হয়। ফলে যজমান আহুতিময় মনোময় প্রাণময় চক্ষুর্ময় শ্রোত্রময় বাঙ্‌ময়, আবার ঋঙ্‌ময় চক্ষুর্ময় সামময় ব্রহ্মময়—এককথায় হিরণ্ময় অতএব অমৃত হয়ে সম্ভূত হন। তাঁর প্রাণ হয় অমৃত। (আহুতি) তাঁর এই শরীরকেও করে অমৃত।'[১৬]

এমনি করে ব্রাহ্মণের একেবারে গোড়াতেই সূত্রাকারে অগ্নিসাধ্য যজ্ঞরহস্যের একটি বিবৃতি দিয়ে বৈদিক কর্মানুষ্ঠানের তাৎপর্যটি ঋষি আমাদের কাছে স্পষ্ট করে তুলেছেন। এখানে উল্লিখিত মুখ্য প্রাণের পাঁচটি বৃত্তিকে আমরা ঐতরেয়ারণ্যকে পেয়েছিলাম 'ব্রহ্মগিরি'রূপে, ছান্দোগ্যোপনিষদে স্বর্গলোকের বা ব্রহ্মের 'দ্বারপা' রূপে।[১৭] এইথেকেই তৈত্তিরীয়সংহিতায় সাতটি শীর্ষণ্য প্রাণের ভাবনা—যারা বৈশ্বানর অগ্নির সপ্তশিখা বা ভুক্ত অন্নের পরিণাম মূর্ধন্য চিদ্‌-বৃত্তিরূপে।[১৮] কেনোপনিষদের গোড়াতেই আমরা এই পঞ্চপ্রাণের দেখা পাই। সেখানে কি করে এদের ভিতর দিয়েই এদের উজানে গিয়ে ব্রহ্মকে জানা এবং পাওরা যায় তার সঙ্কেত আছে। ব্রাহ্মণে পাচ্ছি এদের আপ্যায়ন এবং তার ফলে অমৃতসম্ভূতির কথা। আর উপনিষদে আছে সম্ভূতির উজানে গিয়ে অসম্ভূতিতে 'অতিষ্ঠাঃ' হওবার সঙ্কেত। দুটি সিদ্ধি যে ওতপ্রোত, সম্ভূতি এবং অসম্ভূতির সহবেদনেই যে সাধনার পূর্ণতা—এ আমরা ঈশোপনিষৎ-প্রসঙ্গে জানতে পেরেছি।[১৯]

অগ্নিহোত্রই যে সমস্ত যজ্ঞের সার এবং প্রতিভূস্থানীয়, নানা রহস্যোক্তি এবং আখ্যায়িকা দিয়ে এইটি প্রপঞ্চিত করে[২০] ব্রাহ্মণে সোমযাগের ঔদ্‌গাত্রকর্মের বিবৃতি চলেছে তৃতীয় অধ্যায় বা কাণ্ড পর্যন্ত। কাণ্ডগুলির আয়তন বিপুল এবং তাদের বিভাগ শুধু খণ্ডে। প্রথম কাণ্ডে খণ্ডের সংখ্যা ৩৬৪, দ্বিতীয়ে ৪৪২ এবং তৃতীয়ে ৩৮৬। এর পরেই চতুর্থ অধ্যায় হতে উপনিষদ্‌ব্রাহ্মণ বা জৈমিনীয়োপনিষদের আরম্ভ, যার বিষয়বিভাগ অধ্যায় অনুবাক খণ্ড এবং কণ্ডিকায়। প্রাচীন উপনিষৎগুলিতে অনুবাকবিভাগ নাই। জৈমিনীয়ব্রাহ্মণেও নাই, অথচ তার উপনিষদে আছে। কোনকালে এই গূঢ়ার্থক উপনিষৎটির পঠন-পাঠন ছন্দোগদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল—এ কি তারই সূচক?

উপনিষদের আরেকটি পরিচয় ছিল 'শাট্যায়নী গায়ত্রস্যো-পনিষৎ' অর্থাৎ ঋষি শাট্যায়নি হতে বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত গায়ত্রসামের প্রতিবোধজ তত্ত্ব। সৈ-যা···এবম্‌ উপাসিতব্যা,—এই উপনিষদের উপাসনা এইভাবেই করতে হবেঃ কথাগুলি আছে ঠিক কেনোপনিষৎ আরম্ভ করবার আগে।[২১] শাট্যায়নির আদিপুরুষ অগস্ত্যঃ 'এবং বা এতৎ গায়ত্রস্যো-দ্‌গীথম্‌ উপনিষদম্‌ অমৃতম্‌ ইন্দ্রোঽগস্ত্যায়ো-বাচ' অর্থাৎ গায়ত্রসামের যে উদ্‌গীথ, তা উপনিষৎ এবং অমৃত; আর ইন্দ্র তার প্রবক্তা—ঋষি অগস্ত্যের কাছে।[২২] এই উক্তির একটু বিস্তার দরকার।

সামবেদের যে গানগ্রন্থ আছে, তা আরম্ভ করা হয়েছে গায়ত্রসাম দিয়ে। এই সামের যোনি হল ঋষি বিশ্বামিত্রের দ্বারা গায়ত্রীচ্ছন্দে রচিত এবং আমাদের সুপরিচিত একটি সাবিত্রী ঋক্‌ঃ তৎ সবিতুর্‌ বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি,

ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।' গায়ত্রসামের ঋষি পরমেষ্ঠী প্রজাপতি অর্থাৎ এটি বিশ্বসৃষ্টির আদিসুর। এই উপনিষদেরই অন্যত্র আছে, ব্রহ্ম প্রজাপতিকে সৃষ্টি করলে পর রক্ষঃশক্তি যখন তাঁতে অনুষক্ত হল, তখন এই সাম গান করেই তাঁকে ত্রাণ করাতে এর নাম হল গায়ত্র।[২৩] এই রক্ষঃশক্তি বেদান্তের মূলাবিদ্যা, সপ্তশতীতে যাকে বলা হয়েছে কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণুর 'কর্ণমল' অর্থাৎ নির্মল আকাশতত্ত্বে মালিন্যের আভাস—যাহতে মধু-কৈটভের উৎপত্তি; আর তাদের মেদ হতেই মেদিনী। দর্শনের ভাষায় এই মেদ সৃষ্টির জড় উপাদান, যা চিৎতত্ত্বের প্রতিষেধক এবং বাহন দুইই। প্রজাপতিতে এই মলের সংক্রমণ দূর হল গায়ত্রসামের ঝঙ্কারে—যার মধ্যে আছে সৃষ্টির উষায় স্ফুরিত তিমিরবিদার সবিতার 'বরেণ্য ভর্গঃ', যা জীবের ধীকে প্রচোদিত করছে শাশ্বত জ্যোতির দিকে।

এইদিক দিয়ে গায়ত্রসাম এবং তার যোনি সাবিত্রী ঋক্‌কে বাস্তবিক বলা চলে 'বিশ্বামিত্রের সেই ব্রহ্ম, যা ভারতজনকে (তথা বিশ্বজনকে) রক্ষা করছে'।[২৪] তাণ্ড্যব্রাহ্মণেও বলা হয়েছে, 'গায়ত্রই এইসব লোক বা বিশ্বভুবন।'[২৫] আবার বলা হয়েছে, 'মহাব্রতের শীর্ষস্থানীয় হল গায়ত্র।'[২৬] ঐতরেয়োপনিষৎ প্রসঙ্গে দেখেছি, মহাব্রতের মাধ্যন্দিনসবনে পাঠ্য নিষ্কেবল্যশস্ত্র হল মহদুক্থ, যার পর্যবসান হয় অকারে বা আদিম স্বরে। গানের সুরও টানা হয় স্বরকে ধরে। হোতৃপাঠ্য শস্ত্রের আর উদ্‌গাতৃগেয় স্তোত্রের মর্মগত সাম্য এইখানে।

ব্যাপারটা এই। প্রত্যেক সামের শীর্ষ হল 'উদ্‌গীথ'—ছান্দোগ্যোপনিষদে যার রহস্যবিস্তার আছে।[২৭] সেখানে প্রথমেই বলা হয়েছে, ওম্‌ এই অক্ষরটি হল উদ্‌গীথ। অর্থাৎ প্রত্যেক সাম বা সুরের 'রস' বা আত্মা হল বিশ্বমূল নিত্য ওঙ্কারের ঝঙ্কার। তেমনি প্রত্যেক ঋকের আত্মা হল অকার। ঋক্‌ সামের যোনি। সুতরাং অকার হল ওঙ্কারের যোনি। যজ্ঞে হোতার সাধনা হল ঋক্‌কে অকারে পর্যবসিত করা, আর উদ্‌গাতার সাধনা হল সামকে ওঙ্কারে পর্যবসিত করা। অকার তখন একটানা একটা স্বর—যা সমস্ত স্বরের বীজ। তেমনি ওঙ্কার একটা একটানা সুর—যা সমস্ত সুরের বীজ। একটি আদিম স্বর, আরেকটি আদিম সুর। দুইই বৈদিক ঋষির কাছে বাক্‌। স্বরে আর সুরে, ঋকে আর সামে একটি মিথুন।[২৮] এই মিথুনে বা বাকের দ্বিদল বীজে পেঁছিতে গেলে, তার যত বি-ভূতি সব গুটিয়ে আনতে হয় সম্‌-ভূতিতে। তখন অন্তরাবৃত্ত চেতনায় একটি একরসপ্রত্যয়ের আবির্ভাব হয়। এই প্রত্যয়ই উপনিষদের 'ব্রহ্ম', যার অনুভব আমরা পাই আত্মায়। অধিযজ্ঞ-দৃষ্টিতে কেনোপনিষদের ব্রহ্ম হলেন গায়ত্রসামের উদ্‌গীথে ঝঙ্কৃত ওঙ্কার।

আরণ্যকে অথবা আরণ্যকধর্মী ব্রাহ্মণে (যেমন ছান্দোগ্য বা জৈমিনীয় উপনিষদে) হোতা বা উদ্গাতা কি করে তাঁদের উপজীব্য বাকের উল্লাসকে উপশমে গুটিয়ে আনতেন, তার সঙ্কেত দেওয়া আছে। উপনিষৎ এই উপশমের ফলশ্রুতি। ওটি আরণকের অনাত্মীয় বা প্রতিবাদ নয়, তার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক সাধ্য ও সাধনার।

ঐতরেয়োপনিষৎ-প্রসঙ্গে দেখেছিলাম, শস্ত্রকে কি করে অকারে গুটিয়ে আনতে হবে, আরণ্যকে তার বিবৃতি। বলা হয়েছিল, 'এই অকারই ব্রহ্ম, আর তাতে অনুস্যূত রয়েছে "অহম্" বা আত্মা।'[২৯] তার পরেই শুরু হয়ে গিয়েছিল উপনিষৎ—যার প্রতিপাদ্য হল কি করে ব্রহ্মভুত এই আত্মা হতে প্রপঞ্চের সৃষ্টি হয় এবং তাতেই তার প্রলয় ঘটে। কেনোপনিষদেরও ভূমিকা রচিত হয়েছে আরণ্যকধর্মী জৈমিনীয় বা গায়ত্র উপনিষৎ দিয়ে—যার প্রতিপাদ্য হল সাম আর উদ্গীথের রহস্য এবং গায়ত্রসামের মহিমা। তার প্রথমেই পাই ঃ সামবেদের 'রস'[৩০] হল 'স্বর্' এই ব্যাহৃতিটি। তা-ই হল দ্যুলোক, যার রস হল আদিত্য। এই আদিত্যকে ছাপিয়ে আছে 'ওম্', যার রস হল প্রাণ। এই ওঙ্কারই একাধারে গায়ত্রসাম আর অষ্টাক্ষরা গায়ত্রী। আর দুইই ব্রহ্ম।[৩১]

এখানে দেখতে পাচ্ছি, ঐতরেয়ারণ্যকে যেমন উক্থের সাধনায় সমস্ত শস্ত্রের মধ্যে নিষ্কেবল্যশস্ত্রকে মুখ্য বলে গ্রহণ করে তাকে পর্যবসিত করা হয়েছিল অকারে, তেমনি উদ্গীথের সাধনায় সমস্ত সামের মধ্যে গায়ত্রসামকে মুখ্য ধরে তাকে পর্যবসিত করা হচ্ছে ওঙ্কারে, যা আদিত্যকেও ছাপিয়ে আছে। বৈদিক প্রসিদ্ধিতে আদিত্যের উজানে সোম—যার ষোড়শী কলা ধ্রুবা অর্থাৎ হ্রাসবৃদ্ধিহীন।[৩২] সংহিতার সোম আনন্দতত্ত্ব। তার আধিজ্যোতিষ রূপ হল আদিত্যোত্তর এই ধ্রুবা কলা—যার বাঙ্ময় অভিব্যক্তি ওঙ্কারে, তথা গায়ত্রী ছন্দে এবং গায়ত্র সামে। সামটি তত্ত্বত ওঙ্কারের অনুরণন। এবং তা-ই ব্রহ্ম।

আর কেনোপনিষদে এই আনন্দ-ব্রহ্মের অনুভবের বিবৃতি। ঋষি তাঁকে পেয়েছেন সাম বা 'উদ্গীথ' বা গানের সাধনায়, যেমন ঐতরেয় পেয়েছিলেন 'উক্থ' বা বাকের শংসনের সাধনায়। যেমন ঐতরেয়োপনিষদে, তেমনি এখানেও আরণ্যকোক্ত সাধনা এবং ভাবনা ব্রহ্মানুবের প্রস্তুতি। ব্রাহ্মণ আরণ্যক আর উপনিষদে সাধনার একটি সুনিরূপিত ক্রম আছে। ব্রাহ্মণে প্রধান হল কর্ম, আরণ্যকে ভাবনা, আর উপনিষদে অপরোক্ষ অনুভব। অনুভব কর্ম থেকেই আসে ভাবনার ভিতর দিয়ে।

এইবার অতিসংক্ষেপে জৈমিনীয়োপনিষদের প্রাসঙ্গিক তত্ত্বগুলির একটা পরিচয় দিয়ে নিই। তাতে কেনোপনিষৎ-রচনার আবহটি বোঝা সহজ হবে।

যেমন ছান্দোগ্যোপনিষদে, তেমনি জৈমিনীয়োপনিষদেও ঋষি সামের ভাবনা হতে পেঁছেছেন ব্রহ্মের তত্ত্বে। তবুও দুটি উপনিষদে বিবৃতির ধরন এক নয়। ছান্দোগ্যোপনিষদের প্রথমটায় কর্মাঙ্গোপাসনার বাহুল্য থাকলেও তার শেষের দিকে সোজাসুজি ব্রহ্মবিদ্যার প্রসঙ্গই প্রধান হয়ে উঠেছে। জৈমিনীয়োপনিষদে কিন্তু কর্মপ্রসঙ্গের জের টানা হয়েছে একেবারে শেষ পর্যন্ত। সমস্ত উপনিষৎটিতে কর্ম আর জ্ঞান অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। নিছক ব্রহ্মবিদ্যার প্রসঙ্গ আছে কেবল কেনোপনিষদে।

আবার ছান্দোগ্যে দেবতার চাইতে ঋষিদের কথা বেশী, জৈমিনীয়ে তার বিপরীত। ছান্দোগ্যে ইন্দ্র একজন গৌণ দেবতা, কিন্তু জৈমিনীয়ে তিনি প্রধান দেবতা—ঋগ্বেদের আরণ্যক এবং উপনিষৎগুলির মত। কেনোপনিষদে তাঁর স্থান মাঝামাঝি—তিনি ব্রহ্মজিজ্ঞাসু এবং দেবতাদের মধ্যে তিনিই ব্রহ্মকে সবচাইতে কাছে গিয়ে স্পর্শ করেছিলেন বলে সব দেবতাকে তিনি ছাপিয়ে গেছেন।[৩৩] ইন্দ্রের প্রাধান্য সূচিত করে, উপনিষদের অধ্যাত্মদৃষ্টি অধিদৈবত-দৃষ্টির অনুগত—অতএব তার ভাবনায় ঋষিধারার প্রভাব এখনও অব্যাহত।

জৈমিনীয়োপনিষদের প্রথমেই গায়ত্র সাম এবং গায়ত্রী ছন্দকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে।[৩৪] সঙ্গে-সঙ্গে এও বলা হয়েছে, গায়ত্রী বাক্‌স্বরূপা এবং তাঁর পর্যবসান ওম্ এই অক্ষরে। উপনিষদে বারবার একথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।[৩৫] সৃষ্টির প্রথম হতেই গায়ত্র সর্বপাপঘ্ন।[৩৬] গায়ত্র এবং তার উপনিষদ্ই অমৃত।[৩৭] আর গায়ত্র সাম অমৃত এইজন্য যে অন্য যত সাম সবই কাম্য, কেবল এইটি তা নয়।[৩৮] এই উক্তিটি লক্ষণীয়, কেননা 'কামনাই পাপ এবং কামনা হতে মুক্তিই অমৃতত্ব'—এই প্রসিদ্ধ বেদান্তসিদ্ধান্তের ধ্বনি এখানে পাওয়া যাচ্ছে।

কেনোপনিষদের উপক্রমে গায়ত্রোপনিষৎ। কেনোপনিষদের পরেও জৈমিনীয়োপনিষদের অনুবৃত্তি চলেছে—ওটিকে কেনোপনিষদের উপসংহার বলতে পারি। ওখানে আবার গায়ত্রীর দেখা পাই সাবিত্রীরূপে। আর এই সাবিত্রী যে দ্বিজাতির নিত্যজপ্য সাবিত্রীমন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তার সুস্পষ্ট উল্লেখ ওখানে আছে। সাবিত্রী ওখানে সবিতার শক্তি, দুয়ে মিলে একটি মিথুন—পুরুষ আর স্ত্রীর মিথুনের মত। এই মিথুনতত্ত্ব অধিদৈবত এবং অধ্যাত্ম বিশ্বের সর্বত্র। 'যেখানে পুরুষ, সেইখানে স্ত্রী ; যেখানে স্ত্রী, সেইখানেই পুরুষ। তারা দুটি যোনি এবং একটি মিথুন।··এই স্ত্রী এবং পুরুষ হতেই সব-কিছুর প্রজাতি।'[৩৯]

এই মিথুনতত্ত্বের পরেই ব্যাহৃতিযুক্ত সমস্ত সাবিত্রমন্ত্রটির একটি ব্যাখ্যা আছে। তিনটি ব্যাহৃতিকে সেখানে এক-এক করে স্থাপন করা হয়েছে মন্ত্রের

তিনটি পাদের আদিতে। ব্যাখ্যায় তিনটি পাদ হতে তিনটি পদ বেছে নেওয়া হয়েছে—প্রথম পাদ থেকে 'বরেণ্য', দ্বিতীয় পাদ থেকে 'ভর্গঃ' এবং তৃতীয় পাদ থেকে 'প্রচোদয়াৎ'। তারপর বলা হয়েছে, যথাক্রমে অগ্নি অপ্ এবং চন্দ্রমা 'বরেণ্য', অগ্নি আদিত্য এবং চন্দ্রমা 'ভর্গঃ', আর 'প্রচোদিত করে' যজ্ঞ স্ত্রী এবং পুরুষ। অধিজ্যোতিষদৃষ্টিতে যা চন্দ্রমা, অধিদৈবতদৃষ্টিতে তা-ই সংহিতার সোম বা আনন্দতত্ত্ব। অগ্নি সর্বত্র পৃথিবীস্থান—জাতবেদারূপে তিনি জীবের আত্মচৈতন্য। অপ্ অন্তরিক্ষস্থান প্রাণশক্তি। অপ্-এর পরে যে-চন্দ্রমা, তাও অন্তরিক্ষস্থান[৪০] এবং আদিত্যের নীচে বলে তার হ্রাস-বৃদ্ধি আছে। আর আদিত্যের ওপারে যে-চন্দ্রমা, তার আছে ক্ষয়িষ্ণু পঞ্চদশ কলার পরে ষোড়শী ধ্রুবা কলা। তা-ই সংহিতার অমৃত সোম বা 'ইন্দু'। তৈত্তিরীয়োপনিষদে একেই বলা হয়েছে প্রজাপতির আনন্দের শতগুণ ব্রহ্মের আনন্দ অর্থাৎ যে-আনন্দ বিশ্বব্যাপারের নিরপেক্ষ।[৪১] আবার এই আনন্দ হতে জাগে প্রচোদনা, যা একাধারে বিসৃষ্টি এবং অতিসৃষ্টির হেতু। সাবিত্রমন্ত্রের তৃতীয় পাদের ব্যাখ্যায় বলা হচ্ছে, যজ্ঞই প্রচোদনা। আমরা জানি, যজ্ঞ দুরকম—দেবযজ্ঞ বা পরমপুরুষের বিসৃষ্টিতে নেমে আসা, আর মনুষ্যযজ্ঞ বা দেবতার দিকে মানুষের উজিয়ে যাওয়া। লক্ষণীয়, জৈমিনি পূর্বমীমাংসাসূত্রে ধর্মের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলছেন, 'চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্মঃ'[৪২] অর্থাৎ মনুষ্যযজ্ঞের মূলে রয়েছে একটা ঊর্ধ্বমুখী প্রেষণা, সংহিতার ভাষায় যা 'সবিতার প্র-সব' অথবা 'সোমের উৎ-সব'। সাবিত্রমন্ত্রের তৃতীয়পাদে তারই কথা বলা হয়েছে। ব্যাখ্যায় বলা হচ্ছে, যজ্ঞের প্রচোদনার পর স্ত্রী এবং পুরুষ প্রজাসৃষ্টি করেন। এই পাদটির বীজ হল তৃতীয় ব্যাহৃতি 'স্বর্', যার অর্থ আলো এবং সুর দুইই হয়। সংহিতায় পাই 'স্বর্ বৃহৎ'[৪৩] বা ব্রহ্মজ্যোতিই আমাদের পরমপুরুষার্থ। সুতরাং এই স্ত্রী-পুরুষ সাবিত্রী এবং সবিতৃরূপী আদিমিথুন। অধিদৈবত এবং অধিযজ্ঞ দৃষ্টির সমাহারে বলা যায়, যজ্ঞের ফলে এঁরাই স্বর্গলোকে যজমানের হিরণ্যশরীরের জন্ম দিয়ে থাকেন—যে-দেবজন্ম বৈদিক প্রসিদ্ধিতে যজ্ঞের লক্ষ্য। এইভাবে সাবিত্রমন্ত্রটির ব্যাখ্যা করে ঋষি এই ফলশ্রুতি দিয়ে উপনিষৎটি শেষ করেছেন: 'যে সাবিত্রীকে এইভাবে জানে, সে পুনর্মৃত্যুকে হটিয়ে দিয়ে পার হয়ে যায় এবং সাবিত্রীরই সালোক্যকে জয় করে।'

দেখা যাচ্ছে, উপক্রম এবং উপসংহারের দিক থেকে বিচার করলে কেনোপনিষৎটি গায়ত্রসামের উদ্গীথের যে-উপনিষৎ,[৪৪] তারই নিষ্কর্ষ। আর তাতে যে হৈমবতী উমার প্রসঙ্গ এসে গেছে তা আকস্মিক নয়। জৈমিনীয়োপনিষদের গায়ত্রী বা সাবিত্রীই কেনোপনিষদের ওই 'স্ত্রী'—যক্ষারিক্ত আকাশে ইন্দ্র যাঁর দেখা পেয়েছিলেন। আর পুরুষ স্বয়ং 'যক্ষ' বা অনির্বচনীয় ব্রহ্ম।

এঁরাই অধিদৈবতদৃষ্টিতে যেমন বিশ্বের, তেমনি অধ্যাত্মদৃষ্টিতে আমাদের দেবজন্মের জননী এবং জনক। এঁরাই সংহিতায় উল্লিখিত বাক্ এবং ব্রহ্মের মিথুন।[৪৫]

ছান্দোগ্যোপনিষদের প্রথমেই আছে : 'বাক্ হল পুরুষের রস, বাকের রস হল ঋক্, ঋকের রস সাম। আর উদ্গীথ হল সামের রস। ওম্ এই অক্ষরকে উদ্গীথ জেনে উপাসনা করবে।[৪৬]

রসের মৌলিক অর্থ হল 'যা আস্বদনীয়' অতএব যা আনন্দন। সংহিতায় শব্দটির বিশিষ্ট প্রয়োগ সোমের বেলায়। সোম সেখানে 'ইন্দ্রয়ো রসঃ', সোজা কথায় ইন্দ্রের আনন্দ। তা-ই অমৃত। উপনিষদে তা-ই ব্রহ্মানন্দ বা ভূমার অনুভবজনিত সুখ।[৪৭] এই রস বা সুখ বা আনন্দ সোমযাগের লক্ষ্য। একমাত্র সোমযাগেই সামবেদের প্রয়োগ। সুতরাং সামবেদের উপনিষৎগুলিতে রস বা আনন্দই পরমপুরুষার্থ। ছান্দোগ্য এবং জৈমিনীয় উপনিষদে রসতত্ত্বের কথা নানাজায়গায় নানাভাবে এসে গেছে। কেনোপনিষদেও তার পরোক্ষ প্রসঙ্গ আছে, সেকথা যথাস্থানে বলব।

তৈত্তিরীয়োপনিষদের আনন্দমীমাংসার মত[৪৮] ছান্দোগ্যের উদ্ধৃতিটিও একটি রসমীমাংসা। ভূত হতে[৪৯] ওঙ্কার পর্যন্ত, জড় হতে পরমচৈতন্য পর্যন্ত সৃষ্টিতে আছে রসের একটা উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি। আমরা পুরুষ। আমাদের মধ্যে বাক্‌শক্তির স্ফুরণই আমাদের বিশিষ্ট করেছে পশু থেকে। এই বাকের চরিতার্থতা ঋকে বা অগ্নিমন্ত্রে। ঋক্ কাব্য, সাম বা সুরের যোগে তা গান হয়ে ওঠে। তখন তার নিহিতার্থটি মুক্তি পায় আনন্দলোকে। কথার আবেদন বুদ্ধির কাছে, আর সুরের আবেদন হৃদয়ের কাছে—যে অগম রহস্যের ব্যঞ্জনা নিয়ে আসে। সামগানে সুর চরমে ওঠে উদ্গীথে বা সামভক্তিগুলির মধ্যম পর্বে।[৫০] সুরটি তখন বিশ্বমূল ওঙ্কারের ঝঙ্কার—সোমমণ্ডলে যাকে বলা হয়েছে 'ব্রহ্মী বাক্'[৫১] বা চরাচরব্যাপী বৃহতের আনন্দময় ছন্দঃস্পন্দ। ঐতরেয়োপনিষৎ-প্রসঙ্গে দেখেছি, ওঙ্কার হল অকার আর হিঙ্কারের মাঝামাঝি। ঋক্‌ও ওঙ্কার, সামও ওঙ্কার। কিন্তু ঋক্ বা উক্‌থ ঝোঁকে অকারের দিকে, আর সাম বা উদ্গীথ ঝোঁকে হিঙ্কারের দিকে। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে একটির লক্ষ্য প্রজ্ঞা-জনিত উপশম, আরেকটির লক্ষ্য প্রাণের উল্লাস। কিন্তু ঋক্ আর সাম একটি মিথুন—একথা ছান্দোগ্য এবং জৈমিনীয় দুটি উপনিষদেই বারবার বলা হয়েছে।

রসের আধার হল ক্রমান্বয়ে পুরুষের বাক্ ঋক্ সাম উদ্গীথ এবং ওম্।

বৈদিক অধ্যাত্মসাধনারও এগুলি মুখ্য উপজীব্য। জৈমিনীয়োপনিষদে এদের সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। সূত্রাকারে তার নিদর্শন দিচ্ছি।

বাকের প্রসঙ্গে জৈমিনীয়োপনিষৎ ঋক্‌সংহিতা থেকে পর-পর দুটি মন্ত্র উদ্ধার করে তাদের একটা সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। প্রথম মন্ত্রটি দীর্ঘতমার, যাতে বাকের চারটি পদের কথা আছে—তিনটি পদ গুহানিহিত, বাইরে তাদের ইঙ্গিত পাওরা যায় না, কেবল চতুর্থ পদটি ফোটে মানুষের কথায়।[৫২] ব্যাখ্যায় উপনিষৎ বলছেন,[৫৩] বাকের গুহাহিত তিনটি 'পাদ' হল যথাক্রমে মন চক্ষু এবং শ্রোত্র ; আর চতুর্থ পাদ হল এই বাক্—মানুষ যা বলে। তন্ত্রে চতুর্থী বাককে বলা হয় বৈখরী, আর গুহাহিত তিনটি বাককে মধ্যমা পশ্যন্তী এবং পরা। ঐতরেয়োপনিষৎ-প্রসঙ্গে এদের কথা কিছু বলেছি। মধ্যমা বাক্ হল মানসী বাক্—আমরা সবসময় মনে-মনে যা বলি। তারও মূলে আছে বক্তব্যের চিন্ময় দর্শন—তন্ত্রে 'পশ্যন্তী'। তারও মূলে বাকের চিন্ময় শ্রবণ—বাক্ সেখানে আকাশের স্পন্দমাত্র, তন্ত্রের সংজ্ঞায় 'পরা'। জৈমিনীয়োপনিষদের ব্যাখ্যায় তন্ত্রোক্ত ওই সংজ্ঞাগুলির একটা হদিশ পাওরা যাচ্ছে। এ যেন বেদ আর তন্ত্রের মধ্যে একটি লুপ্ত পর্বের সঙ্কেত। লক্ষণীয়, বাক্ মন চক্ষু এবং শ্রোত্র উপনিষদের সুপরিচিত ব্রহ্মপুরুষ, যাদের প্রসঙ্গ দিয়ে কেনোপনিষদের আরম্ভ। এই চারটি ব্রহ্মপুরুষ ছাড়া আরেকটি হল প্রাণ। তার কথায় উপনিষৎ বলছেন, প্রাণই হল বাকের অসু, কেননা এই প্রাণেই বাক্ সব-কিছু 'অসুত' কিনা প্রসব করলেন।[৫৪]

অবশ্য 'অসু' সংজ্ঞার এটি লৌকিক ব্যুৎপত্তি—ধ্বনিসাম্য ধরে। বস্তুত তার নিরুক্তিলভ্য অর্থ হল শক্তির বিক্ষেপ বা বিচ্ছুরণ – যেমন সূর্যবিম্ব হতে রশ্মিজালের। এর পরের খণ্ডেই উপনিষৎ বলছেন, বাকের এই অসুকে আশ্রয় করে দেবগণ পিতৃগণ মনুষ্য পশু গন্ধর্বাপ্সরোগণ সবার জীবন। এই প্রাণ যেমন বাকে প্রতিষ্ঠিত, বাক্ তেমনি প্রাণে প্রতিষ্ঠিত—তারা অন্যোন্য-প্রতিষ্ঠ।[৫৫] অর্থাৎ প্রাণ ও বাক্ একটি মিথুন। এই প্রাণ অবশ্যই ব্রহ্ম—প্রাণব্রহ্মবাদ উপনিষদের একটি মুখ্য দর্শন।

আরেকটি মিথুন হল ব্রহ্ম এবং বাক্—যার কথা পাই সংহিতাতে।[৫৬] এই উপনিষদের আগের খণ্ডটিতেও তার কথা আছে : 'যা-কিছু ব্রহ্মের নীচে, সেসবই হল বাক্। আর যা-কিছু বাকের উজানে, তাকে বলা হয় ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মকে দিয়ে ঋত্বিক্‌কর্ম কেউ করে না। যা পরোক্ষ ব্রহ্ম অর্থাৎ বাক্ (এখানে ঋক্ সাম যজুর প্রসঙ্গ আছে) তা-ই দিয়ে কর্ম করা হয়।'[৫৭] এখানে দেখেছি, ব্রহ্ম সেই নৈঃশব্দ্য, যেখান থেকে 'বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য'[৫৮] —ব্রহ্মের নৈঃশব্দ্যে বাক নিমেষিত, সংহিতার ভাষায় 'নি-বিষ্ট'। স্মৃতির ভাষায় পর-ব্রহ্ম

এবং শব্দ-ব্রহ্ম সেখানে একাকার। এই অশব্দের যে-শব্দায়ন, অক্ষরের যে-ক্ষরণ,[৫৯] অপ্রবর্তি আকাশের[৬০] যে পরিস্পন্দ, তা-ই হল প্রাণ-ব্রহ্ম—সংহিতায় যাঁর উপমান হল 'গৌরী' বা শ্বেতমৃগী।[৬১] নিঘণ্টুতে 'গৌরী' বাকের নাম।[৬২] সংহিতায় তিনি 'বভুবুষী' কিনা বিশ্বাকারে আত্মরূপায়ণের আকৃতি-স্বরূপা।[৬৩] এই রূপকৃৎ আকৃতিই প্রাণব্রহ্ম—বাক্ যাঁর সঙ্গে যুগনদ্ধ।

জৈমিনীয়োপনিষদে এই বাককে বলা হয়েছে অদিতি।[৬৪] ঋষি ঋক্‌সংহিতার বিখ্যাত অদিতিমন্ত্রটি[৬৫] এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। তাতে আছে, 'অদিতি দ্যৌঃ, অদিতি অন্তরিক্ষ। অদিতি মাতা, তিনিই পিতা, তিনিই পুত্র। অদিতিই বিশ্বদেবগণ, তিনিই আবার পঞ্চজন। যা জন্মেছে তা অদিতি, যা জন্মাবে তাও অদিতি।' এই অদিতি যে বাক্, এর ইঙ্গিত ঋক্‌সংহিতাতেই আছে। সেখানে এই সমীকরণগুলি পাই: 'বাক্‌ধেনু।[৬৬] অদিতি রুদ্রগণের মাতা, বসুগণের দুহিতা এবং আদিত্যগণের সখা—তিনি অমৃতের নাভি; তিনি নিরঞ্জনা এবং গোরূপা। তিনি বচোবিৎ, বাককে উদ্দীপিত করেন, সমস্ত ধী তাঁতে সঙ্গত হয়, তিনি আসেন বিশ্বদেবগণ হতে, আবার ফিরে যান তাঁদেরই মধ্যে।'[৬৭] মন্ত্রগুলিতে অদিতি বাক্ আর ধেনুর ভাবনা ওতপ্রোত। নিঘণ্টুতে অদিতি এবং ধেনু দুইই বাকের নাম।[৬৮] বসু রুদ্র ও আদিত্যগণের সঙ্গে বাকের সহচারের কথা বাক্‌সূক্তেও আছে।[৬৯] আবার বৃষভ-ধেনু আদি জনক-জননীর উপমানরূপে ঋক্‌সংহিতাতে প্রসিদ্ধ। উল্লিখিত ঋকে, অদিতির সর্বব্যাপিত্ব ও সর্বজনীনত্ব এইসব কারণে অতিসহজেই বাকে উপচরিত হতে পারে। ঋকের পঞ্চজনের ব্যাখ্যায় উপনিষদে একটু নূতনত্ব আছে। ঋষি বলছেন, 'পঞ্চজন কারা?—যে-দেবতারা অসুরদের আগে পঞ্চজন ছিলেন। তাঁরা হলেন এই-যে আদিত্যে পুরুষ, এই-যে চন্দ্রে, এই-যে বিদ্যুতে, এই-যে অপ্‌-সমূহে, এই-যে অক্ষিতে—তাঁরাই।' এখানে আদিত্য চন্দ্র ও বিদ্যুৎ মূর্ধন্যচেতনার তিনটি ক্রমোর্ধ্ব স্তর—এদের কথা ছান্দোগ্যেও আছে।[৭০] আপ্য পুরুষ প্রাণরূপী। আর অক্ষিপুরুষ জীবচৈতন্য। এঁরা সবাই অদিতি বাকের বিভূতি।

এই বাক্ যে শেষপর্যন্ত ওম্ অক্ষর, একথা আগেই বলা হয়েছে।[৭১] সেখানে এও বলা হয়েছে, এই ওঙ্কাররূপিণী বাকের রস হল প্রাণ। এই বাক্ অষ্টাক্ষরা গায়ত্রী ঋক্ এবং তাহতে উদ্‌ভূত গায়ত্র সাম। দুইই ব্রহ্ম। আর যেহেতু গায়ত্রী বাক্ প্রাণস্বরূপিনী, তাইতে তাঁর দ্বারা যে-ব্রহ্মকে পাওয়া যায়, তাঁর আধার হল প্রাণ—পশুরা যার প্রতীক। পশুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল গো। গায়ত্রীর যেমন আট অক্ষর, তেমনি তারও 'শফ' বা চেরা খুর হল আটটি। গায়ত্রী বাক্ এই গো—যে একাধারে প্রাণ ও প্রজ্ঞার আলোর প্রতীক।[৭২]

এই ওম্ আর বাক্ আবার একটি মিথুন। ঋষি বলছেন, 'এই-যে ওম্,

সে হল অগ্নি ; আর বাক্ পৃথিবী। ওম্ বায়ু, বাক্ অন্তরিক্ষ। ওম্ আদিত্য, বাক্ দ্যৌঃ। ওম্ প্রাণ, আর বাক্ বাক্ই।'[৭৩] এখানেও পাচ্ছি চতুষ্পাৎ ওঙ্কার[৭৪] এবং চতুষ্পাৎ বাক্। প্রথম তিনটি পাদ অধিদৈবত, চতুর্থ পাদটি অধ্যাত্ম। ফলিতার্থ এই, পিণ্ডে-ব্রহ্মাণ্ডে যা-কিছু সবই ওম্ এবং বাক্।

ওম্ অক্ষর পরব্রহ্ম, আর বাক্ 'বভূর্বুষী' শব্দব্রহ্মরূপিণী। দুটিতে একটি মিথুন। তাহতে ওম্এর 'ও' আর বাক্এর 'বা' এই দুটি অক্ষর নিয়ে গায়ত্র সুরে একটি গান রচিত হল 'ওবা ওবা ওবা হুং ভা ওবা'।[৭৫] সুরের টানে এদিকে এইভাবে ষোড়শাক্ষর করা যায় ঃ 'ওবা৩ চোবা৩ চোবা৩ চ্ হুং ভা ওবা।'[৭৬] 'ওবা' মিথুনের বীজমন্ত্র, আর 'হুং ভা' হল স্তোভাক্ষর। 'হুম্' হল চন্দ্রমা,[৭৭] আর 'ভাঃ' আদিত্য।[৭৮] ষোড়শাক্ষর বোঝাচ্ছে ষোড়শকল পুরুষকে। ব্রহ্মও ষোড়শকল[৭৯] অর্থাৎ পঞ্চদশকলায় ক্ষর, আর ধ্রুবা ষোড়শী কলায় অক্ষর। ষোড়শকলার ভাবনা খুব প্রাচীন, ঋক্সংহিতাতেও তার উল্লেখ আছে।[৮০] ষোড়শকল সোম বা চন্দ্রমা বোঝায় অমৃততত্ত্বকে। সুতরাং ষোড়শকল পুরুষ অমৃতপুরুষ। ষোড়শাক্ষর সাম তাঁর বাচক। চন্দ্রমার যে পঞ্চদশ কলা, হ্রাস-বৃদ্ধি আছে বলে তা শরীর, ষোড়শী কলাটি অশরীর। 'যা অশরীর, তা অমৃত। অশরীর সাম দিয়ে তাই শরীরকে ছাপিয়ে যাওয়া যায়।'[৮১] ওম্ আর বাক্এর মিথুন তাহলে চন্দ্র-সূর্যের মিথুন এবং অমৃতত্বের সাধক। সংহিতায় এই মিথুনতত্ত্বটি প্রপঞ্চিত হয়েছে সোমের সঙ্গে সূর্যের বিবাহে।[৮২] সোম সেখানে সূর্যের ওপারে, অতএব অনিরুক্ত। এখানেও 'হুম্' অনিরুক্ত।[৮৩]

মোটের উপর পেলাম, বাক্ গায়ত্রী এবং গায়ত্র সাম, বাক্ ওঙ্কার, বাক্ অমৃতত্বের সাধক। সোমযাগে উদ্গাতা যজমানকে ওম্ এই অক্ষরের দ্বারা আদিত্যে বা দেবলোকে পৌঁছিয়ে দেন।'[৮৪]

তারপর ঋক্ আর সামের কথা। একই বাকের দুটি ভেদ—ঋক্ আর সাম। দুটিতে একটি মিথুন। সোজা কথায়, কথার পরম উৎকর্ষ সুরে, আর সুরের আশ্রয় কথা। অধিদৈবত এবং অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে ঋক্-সামের মত কারা অন্যোন্যসংসক্ত, তার বিবৃতি ছান্দোগ্যে আছে।[৮৫] জৈমিনীয়োপনিষদে মিথুন ভাবনাটি একটু অন্যরকমের— দুটিতে যেন সংহিতার যম-যমীর মত।[৮৬] ঋক্ এসে সামের সঙ্গে মিথুনীভূত হতে চাইল। সাম তাকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কে?" ঋক্ বলল, "আমি সা" কিনা আদি স্ত্রী বা অদিতি। সাম বলল, "আমি হচ্ছি অম" কিনা বল। এই যে সা আর অম, তা-ই হল গিয়ে সাম। এইখানেই সামের সামত্ব'[৮৭] অর্থাৎ তন্ত্রের ভাষায় সাম হল যেন শিব-শক্তির

সামরস্য। এই 'সাম' বা মিথুনের তত্ত্বটি উপনিষদে দাম্পত্যধর্মের বেলাতেও প্রয়োগ করা হয়েছে।[৮৮]

তারপর ঋক্ বলল, 'এস, আমরা সঙ্গত হই (সংভবাব)।' সাম বলল, 'না। তুমি যে আমার বোন্। আর কারও সঙ্গে মিল গিয়ে।' ঋক্ বলল, 'এমন কাউকে তো পাচ্ছি না যার সঙ্গে মিলতে পারি। তোমার সঙ্গেই আমি মিলতে চাই।'[৮৯]

কিন্তু অপূতা ঋক্‌এর সঙ্গে সাম মিলতে চাইল না। তখন তাকে পূত করা হল মধু দিয়ে। মধু সোম্য আনন্দ, সংহিতায় তার অনেক উল্লেখ আছে। সোমের সঙ্গে সামের নিবিড় যোগ—দুইই আনন্দতত্ত্ব। আর এই আনন্দের উপমান মিথুনের আনন্দ।[৯০] তাই ব্রহ্মচারীকে মধু খেতে নাই। তবে আচার্য দিলে খেতে পারে বটে।

তারপর সাম নিজেও পূত হয়ে[৯১] ঋক্‌কে বলল, 'আমি হলাম অম, আর তুমি সা; তুমি সা, আমি অম। সেই তুমি আমার অনুব্রতা হও, তারপর আমরা প্রজাসৃষ্টি করব। এস, আমরা সঙ্গত হই।' তারপর ঋকের সঙ্গে মিলতে গিয়ে সাম উপচে পড়ল। অর্থাৎ কথাকে ছাড়িয়ে গেল সুর, স্ত্রীকে ছাপিয়ে গেল পুরুষ। তখন সাম বলল, 'আমি যে তোমাকে আর অনুভবে পাচ্ছি না। এস, আমরা বিরাট হয়ে প্রজাসৃষ্টি করি।' ঋক্ বলল, 'আচ্ছা, তা-ই হ'ক।' তারপর তারা বিরাট হয়ে প্রজাসৃষ্টি করল। সৃষ্টি করল সামভক্তি আর বষট্‌কার, সৃষ্টি করল আদিত্য। তারপর তারা দুটিতে গলে গেল।[৯২]

দেখতে পাচ্ছি, সামকে জড়িয়ে আছে সোম্য মধু আর মিথুনতত্ত্ব। বৈদিক ভাবনার এটি একটি মুখ্য ধারা—বিভিন্ন উপনিষদে তার নজির আছে। এইটিই পরে প্রবাহিত হয়েছে তন্ত্রের খাতে।

ছান্দোগ্যোপনিষদে পাই, ঋকের রস সাম, আর সামের রস হল উদ্‌গীথ। উদ্‌গীথ একটি 'সামভক্তি' অর্থাৎ সুরের বিভাগ বা পর্ব। সাধারণত সামকে পাঁচটি পর্বে ভাগ করা হয়। উদ্‌গীথ তার মধ্যপর্ব। সাম হল 'স্বর্' বা আলোর সুর। সে যেন আদিত্যের আকাশ-পরিক্রমার মত। উদয়নের প্রাক্‌কাল যেন সামের প্রথম পর্ব 'হিঙ্কার', আর অস্তময়ন যেন শেষ পর্ব 'নিধন'। দুয়ের মধ্যে মাধ্যন্দিন আদিত্য 'উদ্‌গীথ'।[৯৩] এমনি করে ছান্দোগ্য এবং জৈমিনীয় দুটি উপনিষদেই নানা ব্যাপারে উদ্‌গীথকে শীর্ষস্থানীয় ভাবনা করবার অনেক অনুশাসন আছে। অধিকন্তু জৈমিনীয়োপনিষদে বলা হচ্ছেঃ 'উদ্‌গীথ অমৃত। সৃষ্টির আদিতে প্রজাপতি তা দিলেন দেবতাদের।[৯৪]···বৃহস্পতি উদ্‌গীথকে জয় করলেন স্বধার দ্বারা অর্থাৎ আত্মস্থিতির বীর্যে।[৯৫]···উদ্‌গীথ প্রাণ।[৯৬]······আকাশের যে উত্তর দিক্, তাতে যা-কিছু আছে, সব

উদ্‌গীথরূপী।[৯৭]...এই উদ্‌গীথরূপী প্রাণ হল দীপ্তাগ্র—যে সব-কিছুকে বশ করেছে। তাই সে আভূতি সম্ভূতি প্রভূতি এবং ভূতি। সবাইকে সে ঠেকিয়ে রাখে, কিন্তু তাকে কেউ ঠেকাতে পারে না।[৯৮] অধ্যাত্মদৃষ্টিতে পুরুষই উদ্‌গীথ।'[৯৯] চরম কথাটি পাই ছান্দোগ্যে: উদ্‌গীথ ওঙ্কার।

এমনি করে দেখতে পাচ্ছি, ঋক্‌ সাম আর উদ্‌গীথ অগ্র্যা ধীর ক্রমসংক্ষেপতায় পর্যবসিত হচ্ছে ওঙ্কারে, যা আকাশের আদ্যস্পন্দ এবং ব্রহ্মের বাচক। এসবই বাকের বিভূতি এবং বাক্‌ যে ব্রহ্মের সঙ্গে অবিনাভূত—একথা আমরা সংহিতাতেই পাচ্ছি।[১০০] বাক্‌-ব্রহ্মের এই মিথুনভাবই মীমাংসায় এসে দাঁড়িয়েছে শব্দ-ব্রহ্মবাদে।

কেনোপনিষদে এই বাদটি উহ্য। কিন্তু ছান্দোগ্য এবং জৈমিনীয় দুটি উপনিষদেই সামের রাহস্যিক উপাসনায় এটি খুবই স্পষ্ট। কেনোপনিষদের উপজীব্য ব্রহ্ম নিঃসন্দেহে পর-ব্রহ্ম। কিন্তু তাঁর প্রতিষ্ঠা যে শব্দ-ব্রহ্মে, এটি আমরা অনুমান করতে পারি জৈমিনীয়োপনিষদের মধ্যে এই উপনিষৎটিকে যেভাবে স্থাপন করা হয়েছে তা থেকে। গায়ত্র এবং সাবিত্রীর রহস্যাখ্যানের দ্বারা সম্পুটিত করে এর উপস্থাপনা যেন বলতে চাইছে, এটি সামোপাসনার ফলশ্রুতি। জৈমিনীয়োপনিষদের গোড়াতেই বাক্‌ গায়ত্র (গায়ত্রী) ওম্‌ এবং ব্রহ্মের সমীকরণও এক্ষেত্রে লক্ষণীয়।

কেনোপনিষদে ব্রহ্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত আরও তিনটি তত্ত্বের উদ্দেশ পাই—আকাশ বিদ্যুৎ এবং ইন্দ্র। প্রথমটি ব্রহ্মের অধিষ্ঠান, দ্বিতীয়টি তাঁর 'আদেশ' আর তৃতীয়টি তাঁর বেত্তা এবং দ্রষ্টা।[১০১] জৈমিনীয়োপনিষদে এদের সম্পর্কে কিছু বিস্তৃত আলোচনা আছে, যা কেনোপনিষদের মর্মাবগাহনের সহায়ক।

ব্রহ্মসূত্রে আকাশ ব্রহ্মের বোধক, কেননা ব্রহ্মের লক্ষণগুলি আকাশেও পাওয়া যায়।[১০২] ছান্দোগ্যোপনিষদে আকাশের প্রসঙ্গ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। আকাশভাবনা যে ব্রহ্মোপলব্ধির মুখ্য সাধন, এটি বেশ প্রাঞ্জলভাবে সেখানে বোঝানো হয়েছে।[১০৩] জৈমিনীয়োপনিষদে আকাশকে স্থাপন করা হয়েছে একেবারে সৃষ্টির আদিতে। ঐতরেয়োপনিষদে আত্মা যেমন সবার অগ্রে এখানে আকাশও তা-ই। যা আকাশ, তা-ই বাক্‌। অর্থাৎ বাক্‌ আকাশের অবিনাভূত স্বরূপশক্তি। প্রজাপতি এই বাক্‌কে নিঙ্‌ড়ে যে-রস বার করলেন, তা-ই হল 'লোক'। তাদের নিঙ্‌ড়ানো রস হতে 'দেবতা'। এমনি করে নিঙ্‌ড়ে-নিঙ্‌ড়ে ক্রমান্বয়ে পাওয়া গেল ত্রয়ী বিদ্যা, তিনটি ব্যাহৃতি, আর সবার শেষে ওম্‌। ওম্‌ হল অক্ষর কিনা যার ক্ষরণ আছে কিন্তু ক্ষয় নাই।[১০৪] আবার এই আকাশই হল আদিত্য—যার উদয়ে সব-কিছুর প্রকাশ।[১০৫] আবার আকাশ

ইন্দ্র—সংহিতায় যাকে বলা হয়েছে 'সপ্তরশ্মি বৃষভঃ'। এই রশ্মিগুলি বাঙ্‌ময়। সে-বাকের পরিকীর্ণতার সংখ্যা হল 'ব্যোমান্ত'—যাকে পাওয়া যায় একের পিঠে বারোটি শূন্য বসিয়ে।[১০৬] রশ্মিগুলি বাক্‌ হয়ে প্রতি জীবে অবস্থান করছে।…এই প্রসঙ্গে আকাশ সম্বন্ধে অনেক রহস্যোক্তি আছে, এখানে যার বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। আকাশ বাক্‌, আবার আকাশ আদিত্য—এটি বিসৃষ্টিক্রম। আকাশ বা নাসদীয় অপ্রকেততা থেকে[১০৭] বেরিয়ে আসে সুর এবং আলো। বৈদিক প্রসিদ্ধিতে দুয়েরই নাম 'স্বর্‌'—যা আবার সামের সুর। বিলোমক্রমে আলো মিলিয়ে যায় সুরে, সংহিতার ভাষায় 'চক্ষুঃ' হয় 'শ্রবঃ' অর্থাৎ দেখা হয় শোনা। এখনকার মরমীয়া বলবেন, রূপ লীন হয় নামে। তবে কিনা আকাশ নাম এবং রূপ দুয়েরই নির্বাহক।[১০৮]

কেনোপনিষদে দেখছি, যক্ষ যখন অন্তর্হিত হলেন, তখন রইল আকাশ। সেই আকাশে আবির্ভূত হলেন হৈমবতী উমা। ইন্দ্রকে তিনি বললেন, এই যক্ষই ব্রহ্ম।[১০৯] হৈমবতী এখানে বাগ্‌রূপিণী, আকাশ তাঁর অধিষ্ঠান। আকাশ ব্রহ্মেরও অধিষ্ঠান এবং ইন্দ্রের পরায়ণ। ইন্দ্র যে এখানে আদিত্য, তা মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে, যথাস্থানে তার আলোচনা করব। 'যক্ষ' এবং 'স্ত্রী' এখানে ব্রহ্ম ও বাকের মিথুন, ইন্দ্র তার প্রজা বা বিভূতি। এ যেন অদিতির পিতা মাতা এবং পুত্র হওয়া।[১১০] আকাশ এই ত্রিপুটীর আধার। জৈমিনীয়োপনিষদে আকাশই বাক্‌ এবং ইন্দ্র। অনুভবের দিক দিয়ে দুটি প্রকল্পের একই ব্যঞ্জনা। আর দৃষ্টির দিক দিয়ে কেনোপনিষৎ কতকটা বিভজ্যবাদী (analyst), কিন্তু জৈমিনীয়োপনিষৎ মরমীয়া।

কেনোপনিষদে বিদ্যুৎকে বলা হয়েছে ব্রহ্মের 'আদেশ' অর্থাৎ সূচক এবং প্রাপক। বৈদিক ভাবনায় বিদ্যুৎ মুখ্যত অন্তরিক্ষস্থান জ্যোতি।[১১১] কিন্তু বিদ্যুৎ আকাশে দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়—এইথেকে উপনিষদে তাকে লোকোত্তর তত্ত্বের উপমানরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। কঠোপনিষদে অগ্নির পর বিদ্যুৎ, তারপর সূর্য চন্দ্র এবং তারকা। কিন্তু ছান্দোগ্যে অগ্নির পর সূর্য, তারপর চন্দ্র, তারপর বিদ্যুৎ।[১১২] মরমীয়ার দৃষ্টিতে এই বিদ্যুৎ হল মহাশূন্যে 'প্রতিবোধে'র বা বোধির (institution) ঝলক—সংহিতায় যাকে বলা হয়েছে 'কেতু' বা 'চিত্তি'। কেনোপনিষদের বিদ্যুৎ অতিচেতনার আকাশে এই হঠাৎ আলোর ঝলকানি। জৈমিনীয়োপনিষদে বিদ্যুতের তত্ত্বটি বেশ প্রাঞ্জল।[১১৩] সেখানে বিদ্যুৎ একটি অধ্যাত্মজ্যোতি। বলা হচ্ছে,[১১৪] 'যা আকাশ, তা-ই আদিত্য। এই আদিত্যের রূপ তিনফেরতা—শুক্ল কৃষ্ণ আর পুরুষ। যা শুক্ল তা সপ্রকাশ, যা কৃষ্ণ তা অপ্রকাশ; পুরুষ দুয়ের অন্তর্যামী।[১১৫] এই অধিদৈবত আদিত্যই আবার অধ্যাত্ম চক্ষু। সেও তিনফেরতা—শুক্ল কৃষ্ণ এবং

পুরুষ বা আবৃত্তচক্ষুর দ্বারা প্রত্যগ্‌দৃষ্ট অন্তরাত্মা। উভয়ক্ষেত্রেই যিনি পুরুষ, তিনি হলেন প্রাণ—তিনিই সাম, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত।' এই আবৃত্তচক্ষু দিয়ে ব্রহ্মকে দেখা হল তাঁর সম্পর্কে 'উৎক্রান্তি' কিনা পরাক্‌ দৃষ্টিকে ছাপিয়ে উঠে তাঁকে দেখা। কিন্তু তারও পরে আছে ব্রহ্মের 'পরাক্রান্তি' বা 'আক্রান্তি' অর্থাৎ সব ছাপিয়ে তাঁকে দেখা এবং নিবিড় করে (আ) পাওয়া। এইটি ঘটে বিদ্যুতের উন্মেষে-নিমেষে। বিদ্যুৎ যখন ঝলসে ওঠে,[১১৬] তখন তার রূপ শুক্ল; যখন মিলিয়ে যায়, তখন নীল বা কৃষ্ণ। আর এই বিদ্যুতে যে-পুরুষ[১১৭] তিনি প্রাণ, তিনি সাম, তিনি ব্রহ্ম, তিনি অমৃত। আবার প্রাণই সাম, ব্রহ্মই অমৃত।... এমনি করে আমরা পাই তিনটি পুরুষ—চক্ষুতে অক্ষিপুরুষ, আদিত্যে অতি-পুরুষ, আর বিদ্যুতে পরমপুরুষ। অক্ষিপুরুষ অধ্যাত্ম, অতএব অনুরূপ।[১১৮] অতিপুরুষ অধিদৈবত, অতএব রূপে-রূপে প্রতিরূপ।[১১৯] আর দুয়ের সমাহারে পরমপুরুষ বাইরে-ভিতরে সর্বরূপ।...আবার পাহাড়গুলি বেয়ে নানা পথ যেমন পাহাড়ের চূড়ায় এসে মেলে, তেমনি আদিত্যের রশ্মিরা চারদিক বেয়ে বিলোমক্রমে আদিত্যে এসে মিলিয়ে যায়। এটি যিনি বুঝতে পারেন, তিনি এখান থেকে ওম্‌ বলতে-বলতে ওই রশ্মিদের ধরে আদিত্যে এসে মিলিয়ে যান। অর্থাৎ পৃথিবীতে তিনি সর্বভূতাত্মা, কেননা আদিত্যরশ্মিরা জীবে-জীবে নিহিত[১২০] এবং তিনি আদিত্যরশ্মিময়; আবার দ্যুলোকে প্রেতির ফলে তিনি আদিত্যপুরুষ। এমনি করে আদিত্যের মধ্যে তাঁর মিলিয়ে যাওয়া হল সর্বতোম্বার এবং অনিষেধ সাম অর্থাৎ এমন একটি সকল-ছাওয়া আলোর সুর যার মধ্যে সবার প্রবেশ অবারিত।[১২১] আর এই-যে আলোর সুর হয়ে আদিত্যমণ্ডল থেকে সবদিকে ছড়িয়ে পড়া তপনরূপে, এই হল বিদ্যুৎ।[১২২]

জৈমিনীয়োপনিষদের এই অংশটি কেনোপনিষদের বিদ্যুৎপ্রসঙ্গের ভাষ্য বলা যেতে পারে।

এর পর ইন্দ্রের কথা। ঋগ্‌বেদের সংহিতা ব্রাহ্মণ এবং আরণ্যকে ইন্দ্র নিঃসন্দেহে পরমদেবতা—সোমযাগের মাধ্যন্দিন সবন তাঁর উদ্দিষ্ট বলে। মধ্যদিনে সূর্য থাকেন মাথার উপরে। তারপর তাঁকে আর ঢলতে না দেওয়াই হল বৈদিক সাধনার মুখ্য তাৎপর্য। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এর অর্থ হল, চেতনার প্রত্যক্ষচর তুঙ্গতায় পেঁছে তার উজানে চলে যাওয়া অধ্বর গতিতে বা পরা গতিতে—আর ভাটিয়ে আবর্তনের মধ্যে ফিরে না আসা। এইটি ঘটতে পারে মাধ্যন্দিনসবনের দেবতা সোমপাতম নিষ্কেবল্য ইন্দ্রের প্রসাদে। তাইতে তত্ত্বত এবং কার্যত তিনি বেদের প্রধান দেবতা।

তাঁর এই মহিমা অক্ষুণ্ণ রয়েছে ঋগ্‌বেদের উপনিষৎ দুটিতে। সেখানে তিনি সত্যস্বরূপ, তিনি প্রজ্ঞাত্মক প্রাণ, তাঁকে জানাই মানুষের পরমপুরুষার্থ,

তাঁর দর্শনই পরমদর্শন।[১২৩] অথচ ছান্দোগ্যোপনিষদে দেখি, ইন্দ্র প্রজাপতির কাছে আত্মবিদ্যার উমেদার। কেনোপনিষদেও তিনি ব্রহ্মজিজ্ঞাসু। উভয়ত্র তাঁর তত্ত্বভাব চাপা পড়ে গেছে দেবত্বের গৌণবিভাবের কাছে। কিন্তু জৈমিনীয়োপনিষদে তিনি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। দেবতা হলেও সেখানে তিনি ইষ্টদেবতা—আমাদের ইষ্টদেবতার মতই কৈবল্য এবং বিভূতি দুইই তাঁর মধ্যে উজ্জ্বল। ইন্দ্রের মহিমাখ্যাপনের জন্য উপনিষদে বিশিষ্ট কয়েকটি ঋঙ্‌মন্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে, এও লক্ষণীয়।

জৈমিনীয়োপনিষদে ইন্দ্রের প্রধান পরিচয়, তিনি আদিত্য—সংহিতায় যাঁকে বলা হয়েছে 'সপ্তরশ্মি বৃষভঃ'।[১২৪] তাঁর সাতটি রশ্মি বাক্ মন চক্ষু শ্রোত্র প্রাণ অসু (জীবনস্পন্দ[১২৫]) এবং অন্ন হয়ে দিকে-দিকে সর্বভূতে সন্নিহিত অর্থাৎ তিনিই জড় প্রাণ ও চৈতন্যের সমাহারে প্রজাত হয়েছেন সর্বভূতরূপে। আবার সোমযাগের সামগানে তিনিই উদ্‌গাতা[১২৬] এবং উদ্‌গীথ[১২৭]—আলোর সুর এখান থেকে উঠে গিয়ে মাথার উপর যখন কাঁপতে থাকে, তখন ইন্দ্রই যে ওখানে আসেন, সাধারণ ঋত্বিকেরা তা বুঝতে পারে না। কেবল শ্রোত্রিয়েরা জানেন এবং বলেন, ইন্দ্রই ঋক্ সাম উক্‌থ উদ্‌গীথ ব্রহ্ম (সব বাকের ভেদ), প্রাণ ব্যান এবং অপান (সব প্রাণের ভেদ), চক্ষু শ্রোত্র এবং মন—একই পুরুষ ভূতে-ভূতে বহুধা নিবিষ্ট।[১২৮] আবার আদিত্যের উজানে যে-আকাশে সৃষ্টির আগে সব-কিছু নিবিষ্ট ছিল, তাও ইন্দ্রই।[১২৯] তাই সংহিতাতে বলা হয়েছে, শত-শত দ্যুলোক-ভূলোক আর সহস্র সূর্যও তাঁর নাগাল পায় না।[১৩০] এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, ছান্দোগ্যের আদিত্যান্তর্গত হিরন্ময় পুরুষ—যাঁর শুক্ল ভাতি এবং পরঃকৃষ্ণ নীলিমার সমাহারে রচিত হয়েছে বিশ্বভুবনের 'সাম'।[১৩১] এই হিরণ্ময় পুরুষ আর ইন্দ্র একই। ইনিই আবার পুরাণে কৌস্তুভবক্ষা বিষ্ণু।

ইন্দ্রই যে পরমদেবতা, এটি জৈমিনীয়োপনিষদের এই রহস্যোক্তিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'আচ্ছা, তুমি কিসের উপাসনা কর?—অক্ষরের। সেই অক্ষরটি কি?—যা ক্ষরিত হয়েও ক্ষয় পায়নি। কি বস্তুটি ক্ষরিত হয়েও ক্ষয় পায়নি? —ইন্দ্র। এই ইন্দ্র কোন্‌টি?—যিনি অক্ষিতে থেকে রমণ করেন। যিনি অক্ষিতে থেকে রমণ করেন, তিনি কোন্‌টি?—এই দেবতাই তো তিনি। চক্ষুতে এই যে পুরুষ, ইনিই ইন্দ্র, ইনিই প্রজাপতি। (তিনিই সাম, কেননা) তিনি পৃথিবীর সমান, আকাশের সমান, দ্যুলোকের সমান, সর্বভুতের সমান। ইনিই দ্যুলোকের ওপারে দীপ্তি পাচ্ছেন। ইনিই এই সব-কিছু হয়েছেন—এইভাবে তাঁর উপাসনা করতে হবে। যিনি এইভাবে এই তত্ত্বটি জানেন, তিনি হন জ্যোতিষ্মান্ প্রতিষ্ঠাবান্ শান্তিমান্ আত্মবান্ শ্রীমান্ ব্যাপ্তিমান্

বিভূতিমান্‌ তেজস্বী প্রভাবান্‌ প্রজ্ঞাবান্‌ রেতস্বী যশস্বী স্তোমবান্‌ কর্মবান্‌ অক্ষরবান্‌ ইন্দ্রিয়বান্‌ এবং সামস্বী। এই কথাই এই ঋকে বলা হচ্ছে, "রূপে-রূপে প্রতিরূপ হয়েছেন তিনি, এঁর এই রূপ দেখবার মত। ইন্দ্র বিচিত্র মায়ায় বহুরূপ হয়ে বিচরণ করছেন। (রশ্মিরূপী) হাজারটি বাহন এঁর জোতা রয়েছে।...রূপে-রূপে মঘবা বিচিত্র হয়ে আছেন—মায়া র'চে তাঁর আপন তনুর চারদিকে।"[১৩২]

এখানে দেখতে পাচ্ছি, অধিদৈবতদৃষ্টিতে ইন্দ্র সর্বময় প্রজাপতি, অধ্যাত্ম-দৃষ্টিতে আবৃত্তচক্ষু ধীরের অনুভবে অন্তর্যামী অক্ষিপুরুষ, অধিভূতদৃষ্টিতে এই যা-কিছু সব, অধিজ্যোতিষ দৃষ্টিতে আদিত্য। অক্ষররূপে তিনিই পরা বাক্‌, আবার সামরূপে বিশ্বমূল আলোর সুর। এই যে তিনি সব হয়েছেন, এই তাঁর মায়া।

পরমদেবতার আর দুটি সংজ্ঞা—ব্রাহ্মণে 'প্রজাপতি', আর উপনিষদে 'ব্রহ্ম'। প্রথমটির অনুভব পরাক্‌ (objective), দ্বিতীয়টির প্রত্যক্‌ (subjective)। জৈমিনীয়োপনিষদে ইন্দ্র যেন দুয়ের মাঝামাঝি—তিনি একদিকে বিশ্বব্যাপারে প্রজাপতি, আবার আরেকদিকে আত্মানুভবে ব্রহ্ম। এইটিই একটু বিচিত্র ভঙ্গিতে বলা হয়েছে এইভাবে: 'তিনফেরতা যে-সাম, তা হল চতুষ্পাৎ (চারপো)। ব্রহ্ম তার তৃতীয় পাদ, ইন্দ্র তার তৃতীয় পাদ, প্রজাপতি তার তৃতীয় পাদ; আর অন্ন হল গিয়ে চতুর্থ পাদ। যা ব্রহ্ম, তা হল প্রাণ; যিনি ইন্দ্র, তিনি হলেন বাক্‌; যিনি প্রজাপতি, তিনি হলেন মন। আর অন্নই চতুর্থ পাদ।'[১৩৩] এখানে প্রথম তিনটি পাদের প্রত্যেকটিকে তৃতীয় বলাতে বোঝাচ্ছে—এরা একে তিন, তিনে এক। আর এই ত্রিধাতত্ত্ব হল চৈতন্যরূপে সত্তার একটি মেরু, আরেকটি মেরু হল অন্ন বা জড়। প্রথম উক্তিটিতে দেবতার বিশ্বরূপ, দ্বিতীয়টিতে ব্যক্তিরূপ—অন্ন তখন স্থূলদেহ। মনের উজানে বাক্‌, তারও উজানে প্রাণ—এই ক্রমটি লক্ষণীয়। এই বাক্‌ প্রাণ-ব্রহ্মের শক্তি—মন উভয়ের বিসৃষ্টি। কেনোপনিষদের সঙ্গে এই ভাবনার কিছুটা মিল আছে। সেখানে প্রজাপতি ইন্দ্রের কুক্ষিগত, ইন্দ্র মানসী বাক্‌—যা সৃষ্টিতে প্রপঞ্চিত; উমা পরা বাক্‌, ব্রহ্ম প্রাণ। কিন্তু সবার পিছনে আকাশ। ইন্দ্র তখন সাধ্য নন—সাধন। জৈমিনীয়োপনিষদের অন্যত্রও ইন্দ্রকে 'প্রজাপতিমাত্রা' বলা হয়েছে।[১৩৪] এসবই হল সাধনার সৌকর্যের জন্য পরমদেবতাকে তাঁর বিভূতিতে নামিয়ে আনা। সাধ্য দেবতাই তখন সাধনসম্পদ।

আকাশ বিদ্যুৎ এবং ইন্দ্র ছাড়া জৈমিনীয়োপনিষদে আরও কয়েকটি চিত্তা-কর্ষক প্রসঙ্গ আছে—যেমন পুরুষ-যজ্ঞবাদ, ব্রহ্মলোকের অভিমুখে উৎক্রমণের বিস্তৃত বিবরণ যা আর-কোথাও পাওয়া যায় না, ব্রহ্মাসন্দ্যারোহণপ্রকার, ব্রহ্মলোক

হতে ইচ্ছাজন্ম ইত্যাদি।[১৩৫] কিন্তু কেনোপনিষদে এসব তত্ত্বের কোনও উদ্দেশ পাওয়া যায় না বলে বাহুল্যভয়ে এখানে তাদের আলোচনা করা হল না।

আগেই বলেছি, যে জৈমিনীয়োপনিষৎ কেনোপনিষদের আকর, তা বহুলাংশে আরণ্যকধর্মী। এইবার আরণ্যকের ভাবনা কি করে ঔপনিষদ-ভাবনায় উত্তীর্ণ হল, তা দেখা যাক। এসম্পর্কে অনেক কথাই আগে কিছুটা বিস্তৃত করে বলা হয়েছে, এখানে তারই একটা বিবৃতি দেব সূত্রাকারে।

জৈমিনীয়োপনিষদে আমরা পাই যজ্ঞ বা কর্ম-মীমাংসা, আর কেনোপনিষদে ব্রহ্ম-মীমাংসা। যজ্ঞ বা কর্ম ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, একথা এই উপনিষদেই আছে।[১৩৬] কর্মের অনুষ্ঠান করতে হয় ভাবনাপূর্বক। ভাবনার প্রাচীন সংজ্ঞা হল 'উপাসনা'। আর উপাসনার মুখ্য অঙ্গ হল 'দৃষ্টি'র বিধান কিনা চোখে দেখার মোড় ফিরিয়ে দেওয়া। যেমন ছান্দোগ্যোপনিষদের প্রথমেই পাই উদ্গীথে আদিত্যদৃষ্টি বা মুখ্য প্রাণদৃষ্টির কথা।[১৩৭] উদ্গীথ তখন শুধু সাম বা সুরের শীর্ষপর্ব নয়, ভাবনা করতে হবে তা যেন আদিত্যের মধ্যাহ্ন-দ্যুতিতে ভাস্বর—অধিদৈবতদৃষ্টিতে, অথবা আধারস্থ মুখ্যপ্রাণের মত অপাপবিদ্ধ এবং স্বরাট্—অধ্যাত্মদৃষ্টিতে। এই ভাবনার ফল হল একটা মহিমবোধ। আত্মার মহিমবোধই পরাক্-দৃষ্টিতে দেবতা, প্রত্যক্-দৃষ্টিতে ব্রহ্ম। অর্থাৎ 'ব্রহ্ম' আত্ম-চৈতন্যের বৃহত্ত্ব বা বিস্ফারণ। কর্মাঙ্গোপসনা এই বিস্ফারণের কারণ। এমনি করে ব্রহ্ম এবং কর্মের সমাধির দ্বারা ব্রহ্মে পেঁছনর উপায় পাই আরণ্যকে আর তার সিদ্ধির বিবৃতি উপনিষদে।

সমস্ত বৈদিক সাধনার কেন্দ্রে আছেন আদিত্য। আদিত্যের মত অজস্র তাপ ও দীপ্তির অধিকারী হওয়াই বৈদিক মতে মানুষের পরম পুরুষার্থ। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এই তাপ ও দীপ্তি হল যথাক্রমে আমাদের প্রাণ ও প্রজ্ঞা। এ-দুটির পরম উৎকর্ষের পরিণাম হল আদিত্যের সাযুজ্যলাভ করা—উপনিষৎ যাকে বলেন 'ব্রহ্মোপলব্ধি'। তখন আমার মধ্যে যে-পুরুষ আর ওই আদিত্যে যে-পুরুষ, দুইই এক বলে অনুভব হয়। একথাটি উপনিষৎগুলির নানা-জায়গায় নানাভাবে পাওয়া যায়।

দেবতা যেমন আছেন মুক্তির অনিবাধ ক্ষেত্র ওই আকাশে আদিত্যরূপে, তেমনি আছেন আমার আধারে অগ্নিরূপে—দেহের তাপে যাঁর শক্তির পরিচয় পাই। এই তাপের পারিভাষিক সংজ্ঞা 'তপঃ'। তাকে বাড়ানো হল 'তপস্যা'। বাড়ানোর উপায় হল 'দম' বা ইন্দ্রিয়দমন। এই উপনিষদেই আছে, কর্মের সহচরিত এই দুটি সাধনসম্পদ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। বেদের সন্ধাভাষায় অগ্নি আদিত্যের প্রতিষ্ঠা, পৃথিবী দ্যুলোকের প্রতিষ্ঠা। আমরা বলব, জড় চৈতন্যের

প্রতিষ্ঠা। অবশ্য চৈতন্য এক্ষেত্রে জড়ে সংবৃত্ত—বেদের ভাষায় 'আমাদের মধ্যে নিহিত রয়েছে আদিত্যের কেতু হয়ে।'[১৩৮]

পৃথিবী আর দ্যুলোকের মাঝখানে অন্তরিক্ষ। সেখানে বাতাস বইছে। অধিদৈবতদৃষ্টিতে বাতাস 'বায়ু', অধ্যাত্মদৃষ্টিতে 'প্রাণ'। আকাশজোড়া আলো, অন্তরিক্ষ জুড়ে প্রাণের প্রবাহ আর পৃথিবী জোড়া জড়ের মেলা—এই তিনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হলেন যথাক্রমে আদিত্য বায়ু এবং অগ্নি। আমাদের মধ্যে দেবতার প্রকাশ মনের জ্যোতিতে, প্রাণের শক্তিতে এবং দেহের তপস্ক্রিয়ায়। এই তিনটি দেবতার কথা কেনোপনিষদেও আছে—কেবল সেখানে আদিত্যের জায়গায় পাই ইন্দ্রকে। কিন্তু ইন্দ্র যে আদিত্য, একথা বারবার বলা হয়েছে জৈমিনীয়োপনিষদে। কেনতে বস্তুত একই আদিত্যের তিনটি বিভাব—ব্রহ্ম উমা এবং ইন্দ্র। এই প্রসঙ্গে আকাশের কথা এসেছে। যক্ষের তিরোধানে রইল শুধু আকাশ—এক বারুণী শূন্যতা। 'প্রথমো মনস্বান্' ইন্দ্র[১৩৯] পেঁছিলেন সেই আকাশে, আর তার মধ্যে চলতে-চলতে দেখা পেলেন উমার। আকাশে যক্ষ তিরোভাব, উমা আবির্ভাব, আর ইন্দ্র আগতি। সংহিতার ভাষায় উমাকে যদি বলি অদিতি, তাহলে এই ত্রিপুটী তাঁর সম্পর্কে গোতম রাহুগণের সেই বিখ্যাত উক্তি মনে করিয়ে দেয়—'অদিতির্ মাতা স পিতা স পুত্রঃ'।[১৪০] পিতা এখানে যক্ষ, পুত্র ইন্দ্র—দুজন যথাক্রমে অদিতির উজানে এবং ভাটিতে। এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা যথাস্থানে করা যাবে।

কেনোপনিষদের যক্ষোপাখ্যানে মোটের উপর পাঁচজন দেবতা পাচ্ছি—অগ্নি বায়ু ইন্দ্র উমা এবং যক্ষ। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এঁরা যথাক্রমে অন্নময় পুরুষ প্রাণময় পুরুষ মনোময় পুরুষ বিজ্ঞান এবং প্রজ্ঞান। তিনটি পুরুষে প্রাকৃত চেতনার অবধি। তার মধ্যে মনোময় পুরুষ আবার 'প্রাণ-শরীর নেতা'।[১৪১] প্রাকৃত চেতনাকে উত্তীর্ণ হতে হবে অপ্রাকৃত ভূমিতে—বিজ্ঞানের মাধ্যমে প্রজ্ঞানে। এইটি আখ্যায়িকার তাৎপর্য এবং আমাদের পরমপুরুষার্থ।

'কর্ম' হল এর সাধন। কর্ম হয় যজ্ঞ, নয়তো ভাবনা। যজ্ঞ বাইরের অনুষ্ঠান, ভাবনা অন্তরের। কিন্তু যজ্ঞেও যে ভাবনার অনুপ্রবেশ একান্ত আবশ্যিক, তার প্রমাণ—ব্রাহ্মণে সর্বত্র উপাসনা এবং দৃষ্টির বিধান। ছান্দোগ্যোপনিষদের স্পষ্ট উক্তি: 'দুজনেই কর্ম করে—যে তত্ত্ব জানে, আর যে জানে না। কিন্তু বিদ্যা আর অবিদ্যা আলাদা-আলাদা। যা বিদ্যা শ্রদ্ধা এবং "উপনিষৎ" সহকারে অর্থাৎ দেবাবিষ্ট হয়ে করা হয়, কেবল তা-ই বীর্যবত্তর হয়।'[১৪২]

ভাবনার দুটি সাধন—বাক্ এবং মন। দুটি এসে মিলেছে 'মন্ত্রে', যাস্ক যার লক্ষণ দিচ্ছেন 'মন্ত্রো মননাৎ'—মননের ফলে স্ফুরিত যে-বাক্, তা-ই মন্ত্র।[১৪৩] যজ্ঞে বা কর্মে মন্ত্রের প্রয়োগ অপরিহার্য।

মোটের উপর তিনরকম মন্ত্র—ঋক্ সাম আর যজুঃ। ঋক্ দেবতার প্রশস্তি, সাম তাঁর উদ্দেশে গান—ঋকে সুর বসিয়ে; আর যজুঃ কর্মের মন্ত্র। কর্মের সাধারণ লক্ষণ আত্মাহুতি। সোমযাগের প্রধান ঋত্বিকদের মধ্যে হোতা প্রশস্তি পাঠ করেন, উদ্গাতা সামগান করেন, আর অধ্বর্যু কর্মের অনুষ্ঠান করেন। সবই করা হয় মন্ত্রোচ্চারণ এবং মন্ত্রার্থভাবনা সহ। সংহিতার ভাষায় একজন মন্ত্রের পুষ্টিসাধন করেন, আরেকজন তাতে শক্তি সঞ্চার করেন, শেষের জন যজ্ঞের শরীর নির্মাণ করেন। সবার উপরে ব্রহ্মা—যিনি সর্ববিদ্যার আকর, যজ্ঞের অধ্যক্ষ এবং সংস্কারক।[১৪৪] ব্রহ্মা 'জাতবিদ্য' অর্থাৎ ব্রহ্মরহস্যবিৎ। ঋত্বিকদের মাধ্যমে তাঁর বিদ্যাকে তিনি সংক্রামিত করেন যজমানের মধ্যে। ফলে যজমান 'পাপ অপহত করে অনন্ত এবং জ্যেয়ান্ বা সর্বোত্তর স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত হন'। বিদ্যার ফলশ্রুতিরূপে এটি আছে কেনোপনিষদের শেষে। আর স্বর্গলোকের একটি সমৃদ্ধ বর্ণনা আছে ঋক্সংহিতার সোমমণ্ডলের শেষে। সেখানে অজস্র জ্যোতি, আপ্তকামতা, স্বধা, তৃপ্তি আর অমৃত আনন্দ। বেদান্তের সচ্চিদানন্দকে এর মধ্যে খুঁজে পেতে কষ্ট হয় না। স্বর্গলোক আর ব্রহ্মলোক, সোম্য আনন্দ আর ব্রহ্মানন্দে কোনও তফাত নাই।

যজ্ঞসাধনার দুটি বৈশিষ্ট্য এক্ষেত্রে লক্ষণীয়। প্রথমত, ক্রিয়াবিশেষবহুলতাকে খুব সংক্ষিপ্ত করা যায়। ছান্দোগ্যোপনিষদে তার একটি সুন্দর উদাহরণ আছে—সোমসবনের ফলে লোকদ্বার অপাবৃত করে যজমান কিভাবে রাজ্য বৈরাজ্য স্বারাজ্য এবং সাম্রাজ্য অধিগত করতে পারেন, তার অনুশাসনে।[১৪৫] দ্বিতীয়ত, যজ্ঞে অপরিহার্য মন্ত্রোচ্চারণকেও সংক্ষিপ্ত করে অবশেষে পর্যবসিত করা যায় উক্থের বেলায় অকারে এবং উদ্গীথের বেলায় ওঙ্কারে। এ-দুটির কথা আগেই উল্লেখ করেছি।

এমনি করে পরাক্-বৃত্ত চেতনাকে গুটিয়ে এনে প্রত্যক্-বৃত্ত করা যাগ ও যোগ দুয়েরই সাধারণ কৌশল। ফলে বাহ্যিক সাধন পরিণত হয় আন্তর সাধনে—চেতনা কর্ম হতে বিশ্রান্ত হয় বাকে, বাক্ হতে মনে। ব্রাহ্মণের ভাবনা হতে আরণ্যকের ভাবনায় এবং তাহতে উপনিষদের ভাবনায় উত্তীর্ণ হবার এটি সাধারণ রীতি। তাইতে উপনিষদে ওঙ্কারের উপাসনাকে একটি বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হয়েছে। কেনোপনিষদে ওঙ্কারের উল্লেখ নাই, কিন্তু জৈমিনীয়োপনিষদে অনেক জায়গায় আছে। কেন জৈমিনীয়ের ঠিক পরের ধাপ—শব্দব্রহ্মের চাইতে পরব্রহ্মের বিবৃতিতে সেখানে জোর দেওয়া হয়েছে বেশী। কেনতে অনেক প্রসঙ্গই উহ্য, যার বিস্তার আমরা পাই জৈমিনীয়োপনিষদে।

ভূমিকা শেষ হল। এইবার উপনিষৎপাঠের

প্রস্তাবনা

আগেই বলেছি, জৈমিনীয়োপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের চারটি খণ্ড নিয়ে কেনোপনিষৎ। ঈশোপনিষদের মতই 'কেন' শব্দ দিয়ে উপনিষদের আরম্ভ বলে নাম হয়েছে 'কেনোপনিষৎ'। প্রবক্তার নাম অনুসারে আরেক নাম 'তলবকারোপনিষৎ'। উপনিষৎটি শুরু করা হয়েছে সোজাসুজি ব্রহ্মের কথা দিয়ে—কর্মের কথা আছে শেষের দিকে।

উপনিষদের মূল প্রতিপাদ্য হল ব্রহ্মবিদ্যা। প্রথম খণ্ডে বেদান্তের নেতিবাদের আভাস পাওয়া যায়। বলা হচ্ছে, বাক্ মন চক্ষু শ্রোত্র কি প্রাণ দিয়ে ব্রহ্মকে জানা (বা পাওয়া) যায় না। এগুলি দিয়ে যা জানা যায়, ব্রহ্ম তাছাড়া আরও কিছু, আবার যা জানা যায় না, তিনি তার অধিষ্ঠান।

এই কথার জের টেনে দ্বিতীয় খণ্ডে বলা হচ্ছে, তাঁকে যেমন 'জানি' বলা চলে না, তেমনি এও বলা চলে না যে তাঁকে 'মোটেই জানি না'। আসলে তাঁকে জানা যায় 'প্রতিবোধে'র দ্বারা। তাছাড়া তাঁকে জানতেই হবে, নইলে মহতী বিনষ্টি।

যাঁকে জানা যায় না, আবার জানাও যায়, তিনি তাহলে অনির্বচনীয় এক রহস্য। এই কথাটি তৃতীয় খণ্ডে বোঝানো হয়েছে যক্ষ উমা এবং ইন্দ্রাদি দেবগণের আখ্যায়িকা দিয়ে।

চতুর্থ খণ্ডে ব্রহ্মের স্বরূপ এবং সাধন সম্পর্কে সূত্রাকারে কিছু কথা আছে। ব্রহ্ম 'বন' বা বৃদ্ধ। তাঁর উপলব্ধি বিদ্যুৎ-ঝলকের মত।

সমস্ত উপনিষৎটিতে ব্রহ্মের কোনও স্পষ্ট লক্ষণ দেওয়া হয়নি। সর্বত্র রয়েছে তাঁর রহস্যময়তার একটা প্রভাস। মরমীয়া অনুভবের এই অনির্বচনীয়তা উপনিষৎটির একটি বৈশিষ্ট্য।[১৪৬]

এর পর যথারীতি

শান্তিপাঠ

দিয়ে উপনিষদের শুরু। সামবেদীয় উপনিষৎগুলির নির্দিষ্ট শান্তিপাঠ ছাড়া কোথাও-কোথাও আরেকটি শান্তিপাঠ এই উপনিষদের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়—'সহ নাববতু' ইত্যাদি। এটি বস্তুত কৃষ্ণযজুর্বেদের উপনিষৎগুলির শান্তিপাঠ। তাদের মধ্যে প্রধান হল তৈত্তিরীয়োপনিষৎ। তার শুরু

'শীক্ষাবল্লী' দিয়ে—যাতে আচার্য-অন্তেবাসীর প্রসঙ্গ আছে। কঠোপনিষৎটিও যম ও নচিকেতায় 'সংবাদ' বা কথোপকথন। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের শুরুতে আছে ব্রহ্মবাদীদের প্রশ্ন, সমস্ত উপনিষৎটি তার উত্তর। এই সমস্ত উপনিষদের শান্তিপাঠও তাই আচার্য-অন্তেবাসীর একটি সংবাদ। কেনোপনিষদও যে আগাগোড়া একটি সংবাদ, তা একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। সম্ভবত এইজন্য 'সহ নাববতু' শান্তিপাঠটি এরও শান্তিপাঠ রূপে কল্পিত হয়েছিল। কিন্তু ভাবের দিক দিয়ে বিচার করলে তার মুখ্য শান্তিপাঠ হল

ওম্ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণঃ চক্ষুঃ শ্রোত্রম্ অথো বলম্ ইন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি। সর্বং ব্রহ্মৌপনিষদম্। মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং, মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ॥ অনিরাকরণম্ অস্তু, অনিরাকরণং মে হস্তু। তদাত্মনি নিরতে য় উপনিষৎসু ধর্মাস্ তে ময়ি সন্তু তে ময়ি সন্তু।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

—আপ্যায়িত হ'ক আমার অঙ্গ যত, (আমার) বাক্ প্রাণ চক্ষু শ্রোত্র, তার পর বল আর সব ইন্দ্রিয়। সবই (হল) ঔপনিষদ ব্রহ্ম। আমি যেন ব্রহ্মকে নিরাকৃত না করি, আমাকে যেন ব্রহ্ম নিরাকৃত না করেন। অনিরাকরণ হ'ক্, অনিরাকরণ হ'ক আমার (বা আমার দিক থেকে)। তাদাত্ম্যে নিরত থাকব যখন, তখন উপনিষৎসমূহে যেসব ধর্ম, তারা যেন আমাতে থাকে, তারা যেন আমাতে থাকে।

ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি॥

প্রত্যেক বেদের শান্তিপাঠে তার সাধনা ও সিদ্ধির একটা আভাস থাকে। ঈশোপনিষদের শান্তিপাঠে[১৪৭] আমরা পেয়েছিলাম অনুভবের অখণ্ড পরিপূর্ণতার একটা উদ্ভাস—যা ক্রতুময় পুরুষের জিজীবিষাপ্রচোদিত নির্লিপ্ত শুক্লকর্মের পরিণাম।[১৪৮] ঐতরেয়োপনিষদের শান্তিপাঠে[১৪৯] ছিল বাক্ ও মনের অন্যোন্যপ্রতিষ্ঠার উদ্‌ঘোষ—যা উক্‌থসাধনার ফল। তেমনি আবার সামবেদীয় কেনোপনিষদের শান্তিপাঠের মূল সুর হল এক সর্বতোভদ্র 'আপ্যায়নে'র। কথাটা তলিয়ে বোঝা দরকার।

বেদের নানাজায়গায় ঋক্ যজুঃ ও সামকে যথাক্রমে ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই তিন লোক এবং অগ্নি বায়ু আদিত্য এই তিন দেবতার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।[১৫০]

তিনটি লোক তিনটি আলোর ভুবন, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে চেতনার তিনটি ক্রমোধর্ব স্তর। সামের সাধনায় চেতনা পেঁছিয় স্বর্লোকে। সেখানে আছেন আদিত্য বা অদ্বৈতচেতনার দেবতা। ভূলোকে আমার মধ্যে আছেন অগ্নি—যিনি আমার ঊর্ধ্বমুখী অভীপ্সার দেবতা। যজ্ঞের মাধ্যমে অগ্নিশিখার আদিত্যে পেঁছিন হল মানুষের একাগ্র অভীপ্সার অদ্বৈতচেতনায় উত্তরণ। আদিত্যের একটি সংজ্ঞা হল 'রেন' বা বঁধু—ঋক্‌সংহিতায় যা সূর্য এবং সোম উভয়কেই বুঝিয়েছে।[১৫১] অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সূর্য প্রজ্ঞা, সোম আনন্দ। উদ্‌গীথের আদিত্যে পৌঁছনর তাহলে অর্থ দাঁড়ায় এক পরিব্যাপ্ত বৃহৎ চেতনায় পরম প্রজ্ঞার উদ্‌ভাস এবং পরম আনন্দের 'পরিস্রব' বা উচ্ছলন—আমরা এখন যাকে বলি ব্রহ্মের চিৎ ও আনন্দের অনুভব। এইটিকে ঋক্‌সংহিতার বহুজায়গায়—বিশেষ করে সোমমণ্ডলে—সোম-সূর্যের মিলন বলা হয়েছে। আবার সাম যেমন বোঝায় 'সুর', তেমনি বোঝায় 'সৌষম্য'।[১৫২] সুতরাং সোম-সূর্যের মিলন চেতনায় এক গীতিময় পরম সৌষম্যের আবির্ভাব ঘটায়—যার পারিভাষিক সংজ্ঞা হল 'বৃহৎ সাম' বা বৃহতের সুর। তা আদিত্যের সুর, দ্যুলোকের সুর, প্রাণের সুর, শ্রৈষ্ঠ্য এবং জ্যৈষ্ঠ্যের সুর।[১৫৩] এই সুরে উল্লসিত হওয়াই হল সমস্ত সত্তার আপ্যায়ন—যার একটি উচ্ছল বর্ণনা আছে তৈত্তিরীয়োপনিষদের শেষে ভার্গবী বারুণী বিদ্যার ফলশ্রুতিরূপে।[১৫৪]

সামবেদীয় উপনিষদের শান্তিপাঠের প্রথমেই **আপ্যায়ন্তু** কথাটি তাহলে একটি গভীর ব্যঞ্জনা বহন করছে। অন্যত্র বলেছি,[১৫৫] আর্যভাবনার মুখ্যত দুটি ধারা—একটি ঋষিধারা, আরেকটি মুনিধারা। সাধনার সময় দুটি ধারা ওতপ্রোত হয়ে জড়িয়ে থাকলেও ফলের দিক দিয়ে দুটির সুস্পষ্ট পার্থক্য ক্রমে এদেশে সম্প্রদায়ভেদের সৃষ্টি করেছে। ঋষিধারায় 'আপ্যায়নে'র প্রাধান্য, আর মুনিধারায় 'নিরোধে'র। একটির সাধনা হল আত্মচৈতন্যকে বিস্ফারিত করা, সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া ; আরেকটির সাধনা, তাকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে এনে সংহত করা। উপনিষদেই একটির মহাবাক্য হল ছান্দোগ্যের 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'[১৫৬]—এই শান্তিপাঠেই 'সর্বং ব্রহ্মৌপনিষদম্' ; আরেকটির মহাবাক্য বৃহদারণ্যকের 'নেতি নেতি'।[১৫৭] একটির দর্শন আদি-'বেদান্ত', আরেকটির 'সাংখ্য'। একটির দৃষ্টি 'অধিদৈবত'—এই চোখ মেলেই দেবতাকে দেখা বিশ্বের সর্বত্র ; আরেকটির দৃষ্টি 'অধ্যাত্ম'—আবৃত্তচক্ষু হয়ে আত্মাকে দেখা সত্তার গভীরে। একটির সাধন 'প্রতিবোধ'[১৫৮] বা বোধি (intuition) ; আরেকটির সাধন 'বুদ্ধি' (intellect)।

কিন্তু দুটি ব্যাদে বস্তুত কোনও বিরোধ নাই। রামকৃষ্ণদেবের ভাষায়, একটিতে যেন কেউ ছাতে উঠতে গিয়ে সিঁড়িতে পা দিয়ে বলছে 'এ ছাত নয়' ;

কিন্তু ছাতে গিয়ে নামবার সময় দেখছে, ছাত যেমন ইট-চুন-সুরকি, সিঁড়িও তা-ই। সাধনার সময় অবিদ্যার ঘোর কাটাবার জন্য নিরোধের প্রয়োজন হয়—এই কেনোপনিষদের প্রথমেই তার অনুশাসন পাচ্ছি। কিন্তু চক্ষু বাক্ মনের অগম লোকে[১৫৯] গিয়ে দেখছি, সেই অনালোকের আলোকেই এখানকার সব-কিছু উদ্‌ভাসিত; আর এখানে জানলেই তবে সত্যকে ঠিক-ঠিক জানা যায়।[১৬০]

সংহিতায় এবং ব্রাহ্মণে 'আপ্যায়ন' সোমসম্পৃক্ত একটি পারিভাষিক সংজ্ঞা—বোঝায় কলায়-কলায় চন্দ্রের উপচয়।[১৬১] আধারে সোমের এই আপ্যায়ন বজ্র-যোগের জন্য, অমৃতত্বের জন্য, দ্যুলোকে উত্তমশ্রবাঃ হওয়ার জন্য। এসমস্তই সোমযাগের ফলশ্রুতি এবং ঋষিধারায় পরমপুরুষার্থ। তৈত্তিরীয়োপনিষদের ভাষায় উত্তম পুরুষ[১৬২] তখন আনন্দসামগ, সর্বলোকানুসঞ্চারী, কামান্নী কামরূপী—একাধারে অন্ন এবং অন্নাদ, ঋতের প্রথম জাতক, দেবাদিদেব, অমৃতের নাভি, বিশ্বভুবনের অভিভবিতা।[১৬৩] আত্মানুভবের সম্প্রসারণে এই হল প্রত্যক্ষব্রহ্মরে অনুভব[১৬৪]—যা ঋষিধারার বৈশিষ্ট্য।

উপনিষদধ্যয়নের প্রস্তুতি আপ্যায়নের দ্বারা। কিসের আপ্যায়ন?—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের, বাক্ প্রাণ চক্ষু ও শ্রোত্রের, তার ফলে বলের এবং সর্বেন্দ্রিয়ের। ছান্দোগ্যোপনিষদে পাঁচটি ব্রহ্মপুরুষের কথা আছে, যারা 'স্বর্গলোকের দ্বার-পাল'।[১৬৫] তারা হল বাক্ চক্ষু শ্রোত্র মন এবং প্রাণ। এখানে মনের উল্লেখ নাই। কিন্তু কেনোপনিষদের প্রথমে পাঁচটিরই প্রসঙ্গ পাওরা যায়। ঐতরেয়ারণ্যকে এদের বলা হয়েছে 'ব্রহ্মগিরি'।[১৬৬]

এই ব্রহ্মপুরুষের ভাবনা অত্যন্ত প্রাচীন। ঋক্‌সংহিতার বাক্‌সূক্তে এদের প্রথম উদ্দেশ পাই।[১৬৭] তৈত্তিরীয়সংহিতায় উল্লিখিত সাতটি শীর্ষণ্য প্রাণেরই[১৬৮] বলতে গেলে এরা রকমফের। ভাবনার মূল এই। সাতটি প্রাণ শরীরস্থ বৈশ্বানর অগ্নির সাতটি অর্চিঃ। এই অগ্নিই আমাদের মধ্যে অন্নাদ। ভুক্ত অন্নকে তিনি রূপান্তরিত করেন প্রাণ ও মনের শিখায়।[১৬৯] শিখাগুলি নাভি হতে উজিয়ে যায় শীর্ষে, সেখানে সাতটি ছিদ্র দিয়ে ফুটে বের'য়। সাতটি ছিদ্রের দুটি চক্ষুর, দুটি শ্রোত্রের, নাসারন্ধ্ররূপে দুটি ঘ্রাণের এবং প্রাণের আর একটি মুখের বা বাকের। এই ছিদ্রপথে স্বয়ম্ভূ অন্তশ্চৈতন্যের সঙ্গে বাইরের জগৎএর যোগস্থাপন হয়।[১৭০] আমরা তাকে বলি ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষু আর শ্রোত্র এবং কর্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে বাক্ শ্রেষ্ঠ—কেননা মনশ্চৈতন্যের সমৃদ্ধি এবং ব্যাপ্রিয়ার এরাই মুখ্য সাধন। চৈতন্যের সঙ্গে নিত্যসহচরিত হল প্রাণ। লক্ষণীয়, যজুঃসংহিতায় শীর্ষণ্য প্রাণের বেলায় এখানকার মতই মনের উল্লেখ নাই—যেন মন এইসব প্রাণবৃত্তিরই সমাহার এবং অধিষ্ঠান। মনের কথা স্পষ্ট করে না বললেও এক্ষেত্রে তার প্রসক্তি এবং

অধ্যাহার হয় স্বাভাবিক রীতিতেই। ঋক্‌সংহিতার একজায়গায় সূর্যের পিপাসায় চক্ষু শ্রোত্র মন এবং বাকের উড়ে চলার কথা আছে—কিন্তু প্রাণের কথা নাই, তার জায়গায় আছে হার্দজ্যোতির কথা।[১৭১] হৃদয় প্রাণের সগোত্র এবং মনের সহচর—সেও আঁতিপাঁতি করে সত্যকে খোঁজে, এমন-একটা ইশারা নাসদীয়সূক্তে আছে।[১৭২] ছান্দোগ্যোপনিষদের ব্রহ্মপুরুষেরা প্রাণবৃত্তিও। সেখানে জীবের অন্তর্যামী ব্রহ্মজ্যোতির দৃষ্টি এবং শ্রুতির উপরই বেশী জোর দেওরা হয়েছে।[১৭৩]

শান্তিপাঠের 'বল'কে যদি প্রাণেরই একটি বিশিষ্ট বৃত্তি[১৭৪] এবং 'ইন্দ্রিয়াণি সর্বাণি'কে মনের ও প্রাণের বৃত্তি বলে ধরা হয়, তাহলে সংহিতাদিতে প্রসিদ্ধ পাঁচটি ব্রহ্মপুরুষকে আমরা এখানে পেয়ে যাই। অধিকন্তু পাই 'অঙ্গ'কে—যা এদের প্রতিষ্ঠা। এদের নিরোধ নয়—আপ্যায়নই ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বার। কি করে, এখন একে একে তা-ই দেখা যাক।

সবার আগে অঙ্গের আপ্যায়ন। সমস্ত দেহটি 'তনু', আর তার বিভিন্ন ভাগ অঙ্গ (বহুবচনে)। আমরা জানি বেদে 'তনু' এবং 'আত্মা' অন্যোন্য-বিনিময় (interchangeable) সংজ্ঞা।[১৭৫] 'পুরুষ' আত্মা এবং তনুর সমাহার। ঐতরেয়ারণ্যকে পুরুষ এবং প্রজাপতি উভয়কে বলা হয়েছে 'পঞ্চবিংশ'; সেখানে দেহকাণ্ডকে আত্মা বলে হাত পা আর অঙ্গুলিকে তার শাখা-প্রশাখা ধরে পঁচিশটি অঙ্গের পরিসংখ্যান আছে।[১৭৬] আত্মা এবং দেহ যদি পুরুষের অন্যোন্যসঙ্গত এবং অবিনাভূত দুটি বিভাব হয়, তাহলে কালিদাসের ভাষায় বলা চলে, 'শরীরম্‌ আদ্যং খলু ধর্মসাধনম্‌'।[১৭৭] দেহকে উপেক্ষা করে নয়, তাকে সংস্কৃত প্রসন্ন এবং আপ্যায়িত করেই যে অধ্যাত্মসাধনার সিদ্ধি—এ-ভাবটি বৈদিক বিদ্যাসম্প্রদায়ে দৃঢ়মূল। সংক্ষেপে তার কিছু পরিচয় দিচ্ছি।

আদিত্য বৈদিকদের প্রধান দেবতা। আদিত্যের সঙ্গে সাযুজ্য লাভ করাই হল বৈদিক অধ্যাত্মসাধনার চরম। আদিত্যের জ্যোতি এবং তাপ উপাসকের দেহে প্রকাশ পাচ্ছে অগ্নির জ্যোতি এবং তাপরূপে।[১৭৮] দেহস্থ অগ্নি হল চিদগ্নি। বৈশ্বানর জ্যোতির ভাবনার দ্বারা তার তাপ বৃদ্ধি করা হল 'তপঃ' বা 'তপস্যা'। অগ্নি 'তপস্বান্‌', অগ্নিসাধক ঋষিগণ এবং পিতৃগণও 'তপস্বান্‌'। তাঁরা তপের সাধনাতেই গিয়েছেন স্বর্লোকে বা সোম্য অমৃতলোকে।[১৭৯] তার ফলে এই পৃথিবীতেই তাঁরা হয়েছেন 'সূর্যত্বচ্‌'—যেমন ইন্দ্রের প্রসাদে হয়েছিলেন অপালা।[১৮০] ব্রাহ্মণে দেখি, যজ্ঞে দেবযোনি অগ্নিতে আত্মাহুতির ফলে হিরণ্যশরীর হওরাই যজমানের পরমপুরুষার্থ।[১৮১] সূর্যত্বচ্‌ আর হিরণ্যশরীর একই কথা। উপনিষদে তা-ই হয়েছে 'ব্রহ্ম-বর্চস্‌' বা দেহে

ফুটে-ওঠা অন্তশ্চৈতন্যের আভা—যা ব্রহ্মোপাসনার ফল।[১৮২] ব্যাপারটির সুন্দর বিবৃতি আছে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে। সেখানে শরীরস্থ পঞ্চভূতের সমুত্থান এবং তাদের মধ্যে যোগগুণের প্রবৃত্তিতে শরীরের জরাব্যাধিমৃত্যুহীন যোগাগ্নিময়তার কথা পাই।[১৮৩] তন্ত্রে একেই বলা হয়েছে 'ভূতশুদ্ধি'—যার ফলে পৃথিবী হতে ক্রমান্বয়ে পঞ্চভূতের জড়তা ও ঘনত্ব উপক্ষীণ হয়ে এই শরীরই আকাশবৎ হয়ে যায়।[১৮৪] কঠোপনিষদে ভূতশুদ্ধিকে বলা হয়েছে 'ধাতুপ্রসাদ' বা দেহধাতুর প্রসন্নতা কিনা স্বচ্ছতা যাতে অন্তর্জ্যোতির দীপ্তি বাইরে ছড়িয়ে পড়ে এবং তাইতে 'আত্মা'র মহিমার অনুভব হয়।[১৮৫] ইন্ধনে যখন আগাগোড়া আগুন ধরে যায়, তখন তা হয় 'অঙ্গার' কিনা জ্বলন্ত কয়লা। এইটি যোগাগ্নিময় শরীরের উপমান। তখনই আত্মা এবং তনুর ভেদ ঘুচে যায়।

এই হল অঙ্গের আপ্যায়ন। এর শুরু হয় স্থৈর্যের সাধনা হতে। পতঞ্জলির তৃতীয় যোগাঙ্গ আসনের বিবৃতিতে তার সঙ্কেত দেওয়া আছে। আসন হল অঙ্গমেজয়ত্বের[১৮৬] বিপরীত—অঙ্গের স্থৈর্যজনিত সুষুপ্তিকল্প শারীর সুখ, যার কথা উপনিষদেও আছে।[১৮৭] প্রযত্নশৈথিল্য (relaxation) এবং অনন্তসমাপত্তিতে (expansion into the infinite) এটি সিদ্ধ হয়।[১৮৮] ঋক্‌সংহিতায় তার ফলশ্রুতির সুন্দর বর্ণনা আছে এই মন্ত্রেঃ 'আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হ'ক স্থির, তনু হ'ক স্তব বা সামের ঝঙ্কার। তা-ই দিয়ে আমরা যেন সম্ভোগ করতে পারি দেবহিত আয়ুর পূর্ণতা।'[১৮৯]

তনু দিয়ে স্তবের রহস্য বর্ণিত হয়েছে জৈমিনীয়োপনিষদেঃ সামগের শরীর সামময়। কিন্তু সাম অশরীর—শুধু সুরের একটা কম্পন। সামগের শরীরও তা-ই। তাঁর রূপ যেমন তেমনি থাকে। কিন্তু কেউ যদি তাঁকে জড়িয়ে ধরে, তা হয় যেন জল বা আগুনের শিখা বা ধূম বা বায়ু বা আকাশকে জড়িয়ে ধরার মত—তার মধ্যে পার্থিব দেহের ঘনত্ব থাকে না।[১৯০] এইটি হল অশরীরত্ব বা সামময় অমৃতশরীরত্ব।[১৯১] হিঙ্কার হতে নিধন পর্যন্ত সামের সাতটি অবয়ব দিয়ে উদ্‌গাতা যথাক্রমে যজমানের লোম ত্বক্‌ মাংস স্নাবা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অস্থি এবং মজ্জা হতে মৃত্যুপাশ উন্মোচিত করে তাঁকে 'সাঙ্গ সতনু স্বর্গলোকে সপ্তধা স্থাপিত করেন' এমন কথাও ওই উপনিষদে আছে।[১৯২]

এই হল অঙ্গের আপ্যায়ন। তার পর শরীরে মুখ্য কর্মেন্দ্রিয়রূপে স্ফুরিত যে-বাক্‌, তার আপ্যায়নের কথা।

শরীর ইন্দ্রিয় এবং চৈতন্য এই তিনের সমাহারে 'পুরুষ'। কৌষীতকিতে এই তিনটিকে বলা হয়েছে ভূতমাত্রা প্রাণমাত্রা এবং প্রজ্ঞামাত্রা, যারা ওতপ্রোত এবং অন্যোন্যনির্ভর।[১৯৩] দার্শনিক তত্ত্বহিসাবে এরা জড় প্রাণ এবং চৈতন্য।

শান্তিপাঠে ইন্দ্রিয় এবং প্রাণের আলাদা উল্লেখ থাকলেও তত্ত্বত এরা সমান্তর—ইন্দ্রিয়েরা প্রাণেরই বৃত্তি। উপনিষদে প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়ের বিবাদে এ-প্রকল্পের সমর্থন আছে। সাংখ্যের তত্ত্বোদ্দেশে প্রাণের উল্লেখ নাই, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের উল্লেখ আছে, এও লক্ষণীয়।

কর্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ভেদে ইন্দ্রিয় দশটি – ঋক্‌সংহিতায় তাদের বলা হয়েছে 'দশযন্ত্র'।[১৯৪] এখানে 'সর্বাণি ইন্দ্রিয়াণি'র প্রসঙ্গ থাকলেও প্রাণকে 'ঘ্রাণ' অর্থে ধরে বাক্‌ প্রাণ চক্ষু এবং শ্রোত্র—এই চারটি ইন্দ্রিয়ের উদ্দেশ পাই। দ্বারপা পুরুষদের মধ্যে 'মন' বাদ পড়েছে, যদিও তার কথা কেনোপনিষদের একেবারে প্রথম মন্ত্রেই আছে। সম্ভবত মন সর্বেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান বলে 'ইন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি' বলাতেই মনও তার মধ্যে এসে গেছে ধরে নেওয়া হয়েছে। দশটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ব্রহ্মোপলব্ধির যারা বিশিষ্ট সাধন, প্রথমত পাই তাদের উল্লেখ—শ্রোত্র পর্যন্ত। তার পরই 'অথো' বলে 'বল' এবং 'সর্বেন্দ্রিয়ে'র পৃথক উল্লেখ। এদের বিন্যাস এবং বিভাগের তাৎপর্য ক্রমে পরিস্ফুট হবে।

ব্রহ্মোপলব্ধির প্রথম সাধন হল শরীর, যার কথা এতক্ষণ বলছিলাম। শরীর প্রসাদগুণযুক্ত হয় আহারশুদ্ধিতে। ছান্দোগ্যোপনিষদে পাই, আহারশুদ্ধিতে সত্ত্বশুদ্ধি।[১৯৫] এই ভাবনা আজ পর্যন্ত আমাদের দেশে মজ্জাগত। শুদ্ধির একটি প্রধান সাধন প্রাণাগ্নিহোত্র। তারও কথা ওই ছান্দোগ্যেই রয়েছে—যে-অনুষ্ঠানের কঙ্কালটি এখনও আমাদের মধ্যে টিকে আছে।[১৯৬] ঋক্‌সংহিতাতে 'পিতু' বা অন্ন-পানের প্রতি দিব্যদৃষ্টিবিধানের প্রসঙ্গ পাই।[১৯৭] শরীরশুদ্ধির পরাকাষ্ঠা 'সূর্যত্বচ্‌' 'হিরণ্যশরীর' বা 'যোগাগ্নিময় শরীরে'—একথা আগেই বলেছি। এই হল ব্রহ্মবিবিদিষু পুরুষের ভূতশুদ্ধি।

ভূতশুদ্ধির পর ইন্দ্রিয়শুদ্ধি। ইন্দ্রিয়দের দুটি বর্গ—কর্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়। প্রথমটি প্রাণের আশ্রিত, দ্বিতীয়টি প্রজ্ঞার। প্রজ্ঞার ক্রমিক উন্মেষই যে জীবনায়নের লক্ষ্য, এটি আমরা ঐতরেয়োপনিষৎ-প্রসঙ্গে জেনেছি।[১৯৮] এই ব্যাপারে জীবনে প্রথমে দেখা দেয় কর্মের প্রাধান্য, তার পরে জ্ঞানের। তাইতে সাধনাতেও আগে কর্মেন্দ্রিয়ের শুদ্ধি, তারপর জ্ঞানেন্দ্রিয়ের। কর্মেন্দ্রিয়দের মধ্যে যেটি প্রজ্ঞানের কাছাকাছি, সেটি হল বাক্‌। বাক্য ও মন যে অন্যোন্যপ্রতিষ্ঠ, এও আমরা ঐতরেয়োপনিষদের শান্তিপাঠে পেয়েছি। জীবের মধ্যে স্ফুট বাগিন্দ্রিয় মননধর্মী মানুষেরই বৈশিষ্ট্য। তাইতে ক্রমানুরোধে অঙ্গের আপ্যায়নের পরেই বাকের আপ্যায়নের কথা ওঠে।

বাক্‌ সম্পর্কে বেদে অনেক রহস্যোক্তি আছে। তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি পাওয়া যাবে ঐতরেয়োপনিষৎ-প্রসঙ্গে।[১৯৯] বাক্‌ শব্দব্রহ্ম—বেদে পরব্রহ্মোপ-

লব্ধির মুখ্য সাধন। বাক্ চতুষ্পদী। তার তিনটি পদ গুহাহিত এবং অব্যবহার্য। চতুর্থ পদে মনুষ্যব্যবহার্য বাকের তান্ত্রিক সংজ্ঞা হল 'বৈখরী'। লৌকিক এবং বৈদিক ভেদে তার দুরকম ব্যবহার। বৈদিক ব্যবহারে বাক্ মুখ্যত উক্‌থ এবং উদ্‌গীথ। এই বাক্ সাধনাঙ্গ। সাধনার রীতি হল বৈখরী বাক্‌কে পরা বা 'ব্রাহ্মী' বাকের দিকে উজিয়ে নিয়ে যাওয়া। তখন তা পর্যবসিত হয় প্রণবে বা 'একপদী' বাকে।[২০০] এই একপদী বাক্ ব্রহ্মের সঙ্গে অবিনাভূত এবং পরমব্যোমের ছন্দঃস্পন্দ। গুহাহিত বাকের অনুসন্ধানই বাকের আপ্যায়ন। মন্ত্রশাস্ত্রে একে বলা হয়েছে 'নাদানুসন্ধান'—যা মধ্যযুগের মরমীয়াদের মধ্যে একটি বহুপ্রচলিত সাধনা ছিল। আপ্যায়নের ফলে বাকে অন্তর্নিহিত শক্তির স্ফুরণ হয়—তন্ত্রের ভাষায় যাকে বলা হয় 'মন্ত্রবীর্য'। বাকের সামর্থ্য প্রকাশ পায় প্রচোদনায় বা বিসৃষ্টিতে—সংহিতায় যাকে বলা হয়েছে 'সলিলের তক্ষণ'।[২০১] বাক্ তখন ব্যাহৃতি। বাকের আপ্যায়ন হল 'যজ্ঞের দ্বারা তার পদবীর অনুসরণ এবং অবশেষে ঋষিদের হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট-রূপে তার অনুবেদন'—একথাও সংহিতাতে আছে।[২০২]

অঙ্গ এবং বাকের আপ্যায়ন আবার ওতপ্রোত। অঙ্গের আপ্যায়ন সত্ত্ব-শুদ্ধির ফলে পর্যবসিত হয় 'আকাশ-শরীরের' বোধে। এই আকাশে অনুভূত যে-মন্ত্রস্পন্দ, তাতেই বাকের পরম আপ্যায়ন। বাক্ তখন শুধু বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত হয় না—মরমীয়ার ভাষায় 'তনুবীণা-তনুতারে নিঃস্বরে' তা ঝঙ্কৃত হতে থাকে। পুরুষ তখন 'বাঙ্‌ময় তেজোময় অমৃতময়'।[২০৩] তাঁর সর্বাঙ্গ ওঙ্কারের একটি ঝঙ্কার। শরীরের সপ্তধাতু দিয়ে সপ্তভক্তি সামের অশরীর এবং অমৃতময় অনুভবের বর্ণনা জৈমিনীয়োপনিষদে আছে, তা একটু আগেই দেখেছি। তন্ত্রের ভাষায় উপাসকের শরীর তখন 'মন্ত্রশরীর', তাঁর জপ 'অজপা'। তখন আর জপ 'করা' নয়, জপ 'হওয়া'। মন্ত্রেরও পর্যবসান তখন একপদী বাকে বা ওঙ্কারে।

জৈমিনীয়োপনিষদের নানাজায়গায় নানাভাবে বাকের প্রসঙ্গ আছে। তার সারকথাটি সূত্রাকারে প্রথমেই বলা হয়েছে এইভাবে: সামবেদের রস হল দ্যুলোক, তার রস হল আদিত্য। তারও উজানে একটি অক্ষর আছে—ওম্। এই ওঙ্কারই বাক্। আর তার রস হল প্রাণ।[২০৪] উপাসকের শরীর যদি সামময় হয়, সামের পরিণাম যদি হয় ওম্, আর ওম্ যদি হয় মহাশূন্যের প্রাণস্পন্দ, তাহলে অঙ্গ বাক্ আর প্রাণের মধ্যে রসাভিব্যক্তির একটি সুস্পষ্ট পরম্পরা দেখা দেয়। তখন অঙ্গের আপ্যায়নে বাকের আপ্যায়ন আর বাকের আপ্যায়নে প্রাণের স্ফুরত্তা। ঋক্‌সংহিতার ভাষায় তখন অঙ্গের স্থিরতা আর তনুর গীতিময়তায় দেবহিত আয়ুর পরিপূর্ণ সম্ভোগ।[২০৫]

অতএব স্বাভাবিক রীতিতেই বাকের আপ্যায়নের পর **প্রাণের** আপ্যায়নের কথা ওঠে। মন যেমন সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান এবং সমাহার, প্রাণও তেমনি সমস্ত কর্মেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান এবং সমাহার। আবার প্রাণ এবং প্রজ্ঞা একটি দ্বিদল তত্ত্ব—বৈদিক দর্শনের এটি একটি মূল সূত্র। প্রাণে যেমন প্রজ্ঞার অনুস্যূতি আছে, প্রজ্ঞায় তেমনি আছে প্রাণের। কৌষীতকিতে ইন্দ্র তাই 'প্রাণঃ প্রজ্ঞাত্মাঃ'।[২০৬]

প্রাণের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ 'প্রশ্বাস'। দেখতে গেলে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যাপ্রিয়াতেই জীব বেঁচে আছে, তাইতে প্রাণ জীবনীশক্তিরও সংজ্ঞা। সংহিতায় তাকে বলা হয়েছে 'জীবো অসুঃ' অর্থাৎ সেই জীবনীশক্তি যা দিকে-দিকে বিকীর্ণ হচ্ছে; আর তার উৎস হল সূর্য।[২০৭] এই 'অসু' মানুষে হয়েছে 'আয়ু'। তার উৎস অগ্নি, দেহের তাপে যাঁর প্রকাশ। সংহিতায় তাই অগ্নির একটি সংজ্ঞা 'আয়ু' বা 'বিশ্বায়ু';[২০৮] পরম তুঙ্গতার নীড়ে তিনি 'আয়ুর' স্তম্ভ।[২০৯]

মোট কথা, প্রাণ অধিদৈবতদৃষ্টিতে সূর্য, আর অধ্যাত্মদৃষ্টিতে অগ্নি বা দেহের তাপ। সূর্যই দেহে নেমে আসছেন বৈশ্বানর অগ্নি হয়ে; আবার অভীপ্সার শিখা হয়ে অগ্নি উঠে যাচ্ছেন সূর্যে। এই নামা-ওঠা দুইই প্রাণের ক্রিয়া। ঋক্‌সংহিতায় সর্পরাজ্ঞীর আকর্ষণে সূর্যের নেমে আসার সংজ্ঞা হল 'অপান', আবার তাঁর স্বধামে ফিরে যাওয়ার সংজ্ঞা 'প্রাণ'।[২১০] প্রাণের এই নামা-ওঠাই জীবের জীবন। প্রসিদ্ধ সাবিত্রমন্ত্রে অপানের ক্রিয়া হল আধারে সবিতার ভর্গের 'নিধান'—নিশ্বাসের সঙ্গে; আর প্রাণের ক্রিয়া হল সবিতার দ্বারা ধী-র 'প্রচোদনা'—প্রশ্বাসের সঙ্গে। তন্ত্রে 'হংস' মন্ত্র জপেরও এই ছন্দ এবং জীবের স্বাভাবিক জপক্রিয়া বলে এও অজপা—কৌষীতকিতে যাকে বলা হয়েছে প্রতর্দনের 'আন্তর অগ্নিহোত্র'।[২১১] প্রশ্নোপনিষদে অধিদৈবতদৃষ্টিতে সূর্য সবার প্রাণ, আর অধ্যাত্মদৃষ্টিতে প্রাণ অগ্নি।[২১২] দুইই এক। আবার শুধু নিশ্বাস-প্রশ্বাসের দিক দিয়ে দেখতে গেলে প্রাণের অধিদৈবত রূপ হল বায়ু।[২১৩] সূর্যে প্রাণের প্রজ্ঞারূপ, আর বায়ুতে তার কর্মরূপ। কিন্তু মনে রাখতে হবে প্রজ্ঞা আর কর্ম সহচরিত। নিঘণ্টুতে দুয়েরই সাধারণ নাম 'ধী' 'ক্রতু' বা 'শচী'।[২১৪]

আবার নিশ্বাসের সঙ্গে ঘ্রাণেরও বোধ হয়। তাই ঘ্রাণেন্দ্রিয় বোঝাতেও প্রাণশব্দের ব্যবহার বেদে আছে। প্রাণ তখন 'নাসিক্য'।[২১৫]

প্রাণ অপান ব্যান সমান এবং উদান—প্রাণের এই পাঁচটি বৃত্তির কথাও উপনিষদের নানাজায়গায় আছে। ঋক্‌সংহিতার সার্পরাজ্ঞীসূক্তে শুধু দুটি বৃত্তির উল্লেখ পাই—প্রাণ আর অপান। অন্যান্য বৃত্তির উল্লেখ যজুঃসংহিতা-

গুলিতে আছে। মাধ্যন্দিনসংহিতার একজায়গায় যজ্ঞপ্রসঙ্গে প্রথমে আয়ুর, তারপর প্রাণাদি পঞ্চবৃত্তির এবং বাক্ প্রভৃতি ব্রহ্মপুরুষদের একসঙ্গে উল্লেখ লক্ষণীয়।[২১৬] ঊর্ধ্বস্রোতা উদানের সঙ্গে নাড়ীতন্ত্রের যোগের কথা ছান্দোগ্যোপনিষদে পাই।[২১৭] এই নাড়ীপথটি বৃহদারণ্যকে 'হিতা',[২১৮] হঠযোগে 'সুষুম্ণা'—মাধ্যন্দিনসংহিতায় যাকে বলা হয়েছে 'সূর্যরশ্মি'[২১৯] অর্থাৎ আদিত্যের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ এই পথে।

দর্শনে বায়ুর গুণ স্পর্শ। সাংখ্যে স্পর্শতন্মাত্রের কথা আছে। সংহিতায় এই স্পর্শের দেবতার নাম 'পৃশ্নি'—যিনি মরুদ্‌গণের মাতা। মরুদ্‌গণ বিশ্বপ্রাণরূপী অন্তরিক্ষস্থান দেবতা—নামের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হল আলোর ঝড়। নিঘণ্টুতে 'পৃশ্নি' দ্যুলোক এবং আদিত্যের সাধারণ সংজ্ঞা[২২০]—বোঝাচ্ছে জ্যোতির্ময় পরিমণ্ডলে আদিত্যবিম্বকে। এহতেই মরুদ্‌গণ বা জ্যোতির্ময় বিশ্বপ্রাণের উৎপত্তি। লক্ষণীয়, সার্পরাজ্ঞীসূক্তে প্রাণের উৎস আদিত্যকে পৃশ্নিই বলা হয়েছে।[২২১] নিরুক্তে সংজ্ঞাটির ব্যুৎপত্তি প্রধানত স্পৃশ্ ধাতু হতে।[২২২] এই পৃশ্নিকে অনায়াসে গীতার ব্রহ্মসংস্পর্শের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে—যা অনিত্য মাত্রাস্পর্শের বিপরীত।[২২৩]

বৈশ্বানর অগ্নি কি করে সাতটি শীর্ষণ্য প্রাণের শিখায় বিকীর্ণ হন, তার কথা আগেই বলেছি। প্রাণ সেখানে প্রজ্ঞানের সাধন। কিন্তু এই প্রজ্ঞান বস্তুত অন্নেরই পরিণাম।[২২৪] বৈশ্বানর অগ্নি তখন প্রাণরূপে অন্নাদ। বৃহদারণ্যকে পাই, 'এই যা-কিছু সবই অন্ন এবং অন্নাদ। সোমই অন্ন এবং অগ্নি অন্নাদ।'[২২৫] সোম অমৃতত্বের সাধন। পরোক্ষভাবে সমস্ত অন্নও তা-ই। বৈশ্বানর প্রাণাগ্নি অন্নগ্রহণ করেই মরজগতে মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখতে চাইছেন। অতএব অমৃতত্বের সাধনায় প্রাণই অগ্রণী—যদিও প্রাকৃত জগতের অন্ন মৃত্যুস্পৃষ্ট।[২২৬]

দেখা গেল, প্রাণ অগ্নি, প্রাণ বায়ু, প্রাণ আদিত্য। সংহিতার ভাষায় প্রাণ ত্রিষধস্থ বা ত্রিভুবনে সমূঢ় এবং ব্যূঢ়। যেমন আগে পেয়েছি, ব্রহ্ম আর বাক্ একটি মিথুন, তেমনি ব্রহ্ম আর প্রাণও একটি মিথুন। ব্রহ্মসূত্রে একে আকাশ আর প্রাণের মিথুন বলা হয়েছে।[২২৭] এই হল বৈদিক প্রাণবাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। একে বৈদিক সাধনা দর্শন ও জীবনের স্তম্ভ বলা যেতে পারে। এক সর্বতোভদ্র আনন্দে দেবহিত প্রাণের সম্ভোগই সেখানে পুরুষার্থ।

এইবার প্রাণের আপ্যায়নের কথায় আসা যাক।

প্রথমত প্রাণাগ্নির আপ্যায়ন। প্রাণ তখন অন্নাদ এবং প্রজাপতি।[২২৮] অন্নাদ প্রাণের আপ্যায়ন হয় আহারশুদ্ধিতে। তার একটি সাধন হল প্রাণাগ্নিহোত্র। ছান্দোগ্যোপনিষদে তার বিস্তৃত বিবরণ আছে।[২২৯] প্রাণাগ্নিহোত্রের

শেষ আহুতিতে উদানের তর্পণ। তার ফলে ত্বকের তৃপ্তিতে বায়ুর তৃপ্তিতে আকাশের তৃপ্তি। তখন প্রাণের উদানবৃত্তি সর্বশরীরব্যাপী স্পর্শবোধকে (ত্বক্‌কে) দিব্যস্পর্শে (বায়ুতে)[২৩০] রূপান্তরিত ক'রে অবশেষে তাকে আকাশে ছড়িয়ে দেয়। প্রাণকে যজ্ঞভাবনায় ভাবিত করবার এই হল চরম ফল। তার তৃপ্তি শুধু জৈবতৃপ্তি নয়—একটা দিব্যতৃপ্তি, শূন্যতার একটা আনন্দ। প্রাণাগ্নিহোত্রের ফলে যে-লোকচেতনার স্ফুরণ হবে, যথাক্রমে তারা হল দ্যৌঃ দিক্‌ পৃথিবী বিদ্যুৎ এবং আকাশ। অর্থাৎ চেতনা দ্যুলোকে-ভূলোকে দিকে-দিকে বিদ্যুতের মত ছড়িয়ে পড়ে আকাশে মিলিয়ে যাবে। যে-কোনও ইন্দ্রিয়-ভোগের পর্যবসান হতে পারে এইভাবে। ব্যাপক অর্থে তাও আহারশুদ্ধি এবং তার ফলে মানুষ 'অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে'—এইখানেই ব্রহ্মকে বা বৃহৎকে সম্ভোগ করতে পারে। এই হল অন্নাদ প্রাণের আপ্যায়নের রীতি।

অন্নাদ প্রাণই প্রজাবিসৃষ্টি করে বলে প্রজাপতি। ছান্দোগ্যের পঞ্চাগ্নি-বিদ্যায় পাই, 'পুরুষ অগ্নি।...দেবতারা তাতে অন্ন আহুতি দেন। সেই আহুতি হতে সম্ভূত হয় রেতঃ।...তা তাঁরা আহুতি দেন স্ত্রীরূপী অগ্নিতে। সেই আহুতি হতে সম্ভূত হয় ভ্রূণ।'[২৩১] এই প্রসঙ্গে প্রশ্নোপনিষদে বলা হয়েছে, অন্নই প্রজাপতি, তাহাতে জন্মায় রেতঃ, তাহাতে এইসব প্রজার প্রজাতি।'[২৩২] মাধ্যন্দিনসংহিতায় 'প্রজাপতি প্রাণই গর্ভে বিচরণ করেন এবং পিতা-মাতার প্রতিরূপ হয়ে জাত হন'।[২৩৩] এই প্রাণের আপ্যায়নের সংজ্ঞা 'প্রজাপতিব্রত' বা বৈদিক সুপ্রজননবিদ্যা। তার কথা অন্যত্র বলেছি।[২৩৪]

আহার ও প্রজনন দুইই দিব্যভাবনায় ভাবিত হয়ে অগ্নিহোত্রের মর্যাদা লাভ করতে পারে। মর্ত্য প্রাণের এই আপ্যায়নে তা অমৃতসন্ধ হয়, কিন্তু তবুও তাতে মৃত্যুর ছোঁয়াচ থেকেই যায়। এই ছোঁয়াচ কাটানো যেতে পারে বায়ু- এবং সূর্য-রূপী প্রাণের আপ্যায়নে।

বায়ুরূপী প্রাণের মুখ্য ক্রিয়া হল প্রাণন বা নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ। আগেরটি করে অপান, পরেরটি করে প্রাণ। দুয়ের সন্ধিস্থলে 'ব্যান' বলে আরেকটি বৃত্তির কথা ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে। সেখানে প্রাণ বা অপানের ক্রিয়া থাকে না।[২৩৫] যোগের কুম্ভকপ্রাণায়ামের বীজ এইখানে।

জলভরা কলসের মত কুম্ভকের অনুভব হল পূর্ণগর্ভ একটা একরস প্রত্যয়। ওটি আবার ব্যাপ্তিধর্মা। আধারের পূর্ণতার অনুভব তখন ছড়িয়ে পড়ে আকাশের মহাশূন্যতায়। ছান্দোগ্যে এই আকাশকে বলা হয়েছে অন্তর্হৃদয়ে অপ্রবর্তী পূর্ণতা[২৩৬]—সমুদ্রে ডোবানো ভরা ঘটের জল যেন থমথম করছে, কিন্তু চলকে পড়ছে না। প্রাণায়মের ক্রিয়াশূন্য মুখ্য প্রাণের এই পরিব্যাপ্ত পূর্ণতার বোধই বৈদিক প্রাণায়ামের ফল। প্রাণের 'আয়াম' তখন যৌগিক

প্রাণায়ামে অনুষ্ঠিত প্রাণের সঙ্কোচ বা নিরোধ নয়—পরন্তু বিস্তার। অধ্যাত্ম প্রাণ তখন অধিদৈবত বায়ুর সঙ্গে এক এবং সিদ্ধের অনুভবে সে-বায়ু অগ্নিষ্বাত্ত শরীরে অনিল অমৃত।[২৩৭] তখন প্রাণও ব্রহ্ম, বায়ুও ব্রহ্ম।[২৩৮] বায়ু এবং প্রাণ দুইই তখন 'সংবর্গ' অর্থাৎ সর্বকিছুর উদয়-বিলয়ের স্থান।[২৩৯]

এই প্রাণায়ামকে অবলম্বন করে প্রাণের আপ্যায়নের একটি সহজ উপায় হচ্ছে, কৌষীতক্যুপনিষদে বর্ণিত প্রতর্দনের 'সাংযমন আন্তর অগ্নিহোত্র'।[২৪০]

প্রাণের উদানবৃত্তি ঊর্ধ্বস্রোতা। তাকে অবলম্বন করে অমৃতত্ব লাভ হয়, একথা ছান্দোগ্যে আছে।[২৪১] এ হল হৃদয় হতে নাড়ীপথে উজান বেয়ে মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়া। এও প্রাণের আপ্যায়ন। প্রাণাগ্নিহোত্রের সময় উদানের ক্রিয়ার কথা আগেই বলেছি। উদান হৃদয়ের 'ঊর্ধ্ব দেবসুষি (সংজ্ঞাবহা নাড়ী), সে-ই বায়ু, সে-ই আকাশ'—একথাও ছান্দোগ্যে আছে।[২৪২]

প্রাণকে ঘ্রাণ অর্থে ধরলে তার আপ্যায়নের ফলে ব্রহ্মগন্ধের অনুভবের কথা পাই কৌষীতক্যুপনিষদের পর্যঙ্কবিদ্যায়।[২৪৩] লক্ষণীয়, ব্রহ্মগন্ধের পর দেবযানের পথিকের মধ্যে ক্রমান্বয়ে ব্রহ্মরস ও ব্রহ্মতেজের অনুপ্রবেশের বর্ণনায় ভূতেন্দ্রিয় শুদ্ধির ফলে প্রাতিভসংবিৎএর উন্মেষের ইশারা সেখানে আছে। এও প্রাণের আপ্যায়ন।

বায়ুর গুণ স্পর্শ। স্পর্শের ইন্দ্রিয় ত্বক্‌। প্রাণাগ্নিহোত্রের পঞ্চম বা অন্তিম আহুতিতে যথাক্রমে উদানের ত্বকের বায়ুর এবং আকাশের তৃপ্তিতে সব-কিছুর তৃপ্তি—এও স্পর্শগুণকে আশ্রয় করে বিশ্বপ্রাণের আপ্যায়ন।[২৪৪] এইটি ব্রহ্মসংস্পর্শ, যার দেবতা মরুদ্‌গণের মাতা 'পৃশ্নি'।

বায়ু অন্তরিক্ষস্থান, আদিত্য দ্যুস্থান। প্রাণ যখন ব্যান এবং উদানের সহায়ে আদিত্যে বা সূর্যে সমাপন্ন, তখনই প্রজ্ঞার সাযুজ্যে তার শ্রেষ্ঠ আপ্যায়ন। এই প্রাণ ব্রহ্ম। আকাশ এবং প্রাণ তখন একটি দিব্যমিথুন। আকাশ ব্রহ্মের শরীর, প্রাণ তাতে আরাম।[২৪৫] এই প্রাণের উপাসনার জন্য বৈদিকেরা প্রাণবাদী আখ্যা পেয়েছিলেন, একথা ঈশোপনিষৎ-প্রসঙ্গে বলেছি।

প্রাণ আর প্রজ্ঞা অবিনাভূত। দুইই 'ইন্দ্রিয়' বা ইন্দ্রবীর্য। প্রাণের উৎকর্ষ প্রজ্ঞায়। প্রাণের আপ্যায়নের পর তাইতে আসে প্রজ্ঞার আপ্যায়নের কথা।

প্রজ্ঞাপক বা প্রজ্ঞার সাধন পাঁচটি ইন্দ্রিয়—নাসিকা রসনা ত্বক্‌ চক্ষু এবং শ্রোত্র। এই পাঁচটির মধ্যে বিশেষ করে চক্ষু আর শ্রোত্রকেই ব্রহ্মপুরুষরূপে বেছে নেওয়া হয়েছে। দর্শন আর শ্রবণই হল ব্রহ্মোপলব্ধির মুখ্য সাধন। ছান্দোগ্যে আছে, 'তাঁকে দেখেছি, তাঁকে শুনেছি—এইভাবে উপাসনা

করবে।'[২৪৬] বৃহদারণ্যকেও আছে পরপর আত্মার দর্শন শ্রবন মনন এবং নিদিধ্যাসন বা বিজ্ঞানের কথা।[২৪৭]

সাধকের বেলায় দর্শন আর শ্রবণ মুখ্য সাধন হলেও সিদ্ধের কিন্তু ব্রহ্মোপলব্ধিতে সমস্ত ইন্দ্রিয়ই আপ্যায়িত হয়। শান্তিপাঠেও সেকথার ইঙ্গিত আছে। কৌষীতকিতে পরপর ব্রহ্মগন্ধ ব্রহ্মরস ও ব্রহ্মতেজের অনুপ্রবেশের কথা আগেই বলেছি। সেখানে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রচলিত পরিসংখ্যানানুযায়ী প্রথম তিনটির আপ্যায়নের উদ্দেশ পাচ্ছি। লক্ষণীয়, প্রশ্নোপনিষদে উদানকে 'তেজ' বলা হয়েছে।[২৪৮] উদান প্রাণের ঊর্ধ্বস্রোত—আমরা চলতি কথায় যাকে বলি 'বায়ু চড়া' বা 'মাথা গরম হওরা'। যোগে শরীর অগ্নিময় হয়—একথা শ্বেতাশ্বতরে আছে।[২৪৯] ছান্দোগ্যে বলা হয়েছে, দ্যুলোকের ওপারে সমস্ত লোককে উদ্‌ভাসিত করে জ্বলছে যে-জ্যোতি, তা-ই জ্বলছে মানুষের মধ্যে। সেই দীপ্তির তাপই মানুষের শরীরের উষ্মা। স্পর্শ দিয়ে তার অনুভব হয়। আবার তা-ই হল 'দৃষ্টি'।[২৫০] এখানে দেখছি, আদিত্যের দীপ্তিই শরীরের তাপ। উদানের ক্রিয়ার সেই তাপ হয় 'তেজ'। তা-ই ব্রহ্মতেজ বা 'ব্রহ্মবর্চঃ'—যার পরিণাম হল 'সূর্যত্বক্' হওরা। ছান্দোগ্যে উদানের তর্পণে ত্বকের তর্পণের কথা আগেই বলেছি। কৌষীতকির 'তেজ' তাহলে তাপ ও জ্যোতির মাঝামাঝি।

বেদে অধ্যাত্মদৃষ্টিতে যা চক্ষু, অধিদৈবতদৃষ্টিতে তা 'সূর্য'।[২৫১] সূর্য দ্যুলোকে আতত একটি চক্ষু, সেই চোখে চোখ রাখাই প্রত্যক্ষ ব্রহ্মের দর্শন।[২৫২] আর্যেরা 'জ্যোতিরগ্র'—জ্যোতি তাঁদের দিশারী।[২৫৩] অন্তরে অগ্নিজ্যোতি এবং বাইরে সূর্যজ্যোতি—এই তাঁদের দেবতা বা আত্মা।[২৫৪] সোমযাগের ফলে জীবন থাকতেই অভয় জ্যোতির সম্ভোগ তাঁদের পুরুষার্থ।[২৫৫] তাই দেবতার কাছে তাঁদের প্রার্থনা: 'অপাবৃত কর অন্ধকার, চোখ ভ'রে দাও আলোয়।'[২৫৬]

আর তাইতে চক্ষুর আপ্যায়ন। অধিদৈবত এবং অধ্যাত্ম ভেদে তার দুটি রীতি। প্রথমতঃ, এই চোখেই আদিত্যকে দেবতারূপে প্রত্যক্ষ করে বৃহৎ হওরা, আত্মচৈতন্যের বিস্ফারণ অনুভব করা। তারপর, তারই পরিপাকে একসময় অন্তরে সূর্যোদয় হবে—যাঁকে বাইরে দেখেছিলাম, তাঁকে দেখব অন্তরে। জানব 'য়ো ঽসাব্‌সৌ পুরুষঃ, সোঽহম্ অস্মি'। তখন সর্বত্র তাঁকে দেখব 'ভদ্র' বা কল্যাণজ্যোতিরূপে।[২৫৭] এই চিন্ময় প্রত্যক্ষেই ইন্দ্রিয়ের পরম আপ্যায়ন।

চক্ষুর আপ্যায়নের পরেই পাচ্ছি কিন্তু শ্রোত্রের আপ্যায়ন। বৈদিক সাধনায় দুটি ইন্দ্রিয় সহচরিত এবং দুয়ের মধ্যে একটা পারম্পর্য আছে। আগে চোখে দেখা, তারপর কানে শোনা। ছান্দোগ্যে এবং বৃহদারণ্যকে এইধরনের

একটা ইঙ্গিত আছে, তা আগেই বলেছি। ছান্দোগ্যে আছে, 'তদ্ এতদ্ দৃষ্টং চ শ্রুতং চে ত্যুপাসীত।' দেখতে হবে এবং শুনতে হবে দ্যুলোকের দেবতাকেই নিজের অন্তরে। কি করে দেখতে হবে, তাও বলেছি—তাপের অনুভব রূপান্তরিত হবে জ্যোতির অনুভবে। আর, শোনার উপায় হল। দুটি কান বন্ধ করলে ভিতরে যেন আগুন জ্বলছে, এমনি একটি 'নাদ' শোনা যাবে;[২৫৮] তাতে চিত্তসমাধান করতে হবে। এইথেকে পরে হঠযোগীর নাদানুসন্ধানের দ্বারা মনোলয়ের সাধনা প্রবর্তিত হয়েছে।

বৃহদারণ্যক আছে, 'আত্মা ৱা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি। আত্মনো ৱা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা ৱিজ্ঞানেনেদং সর্বং ৱিদিতম্।'[২৫৯] এখানে আত্মার কথা আছে বলে সাধারণত আত্মার শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনকে 'দর্শনে'র উপায় বলে গণ্য করা হয়। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এ-ব্যাখ্যা অবশ্যই সমীচীন। কিন্তু বেদে অধ্যাত্মদৃষ্টির পাশেই রয়েছে অধিদৈবতদৃষ্টি। তাতে দেবতা শুধু আন্তর অনুভবের বিষয় নন, বাইরেও তাঁর চিন্ময় প্রত্যক্ষ হয়। বরং অধিদৈবতদৃষ্টি এবং চিন্ময়-প্রত্যক্ষবাদই বৈদিক সাধনার পুরোধা এবং প্রাণ। কাত্যায়ন বলছেন, 'এক মহান্ আত্মাই বেদের দেবতা। তাঁকে বলা হয় সূর্য। তিনিই সর্বভূতের আত্মা।' ঋষি তাই বলছেন, 'যা স্থাবর এবং যা জঙ্গম, সূর্য তাদের আত্মা।'[২৬০] এই প্রত্যক্ষদৃষ্ট সূর্যের উপাসনা করে যাজ্ঞবল্ক্য শুক্লযজুঃসমূহ লাভ করেছিলেন, একথা বৃহদারণ্যকেই আছে।[২৬১] তাঁর অধিদৈবতদৃষ্টির পরিচয় ওই উপনিষদের নানাজায়গায় ছড়ানো। সুতরাং যাজ্ঞবল্ক্যের আত্মদর্শন প্রবর্তিত হয়েছিল সর্বভূতাত্মা সূর্যের চিন্ময় প্রত্যক্ষ হতে—যার অভিব্যক্তি দেখি ঈশোপনিষদের 'পূষন্নেকর্ষে'' মন্ত্রে। এক্ষেত্রে উপলব্ধির ক্রম হল প্রথমে সূর্যের দর্শন, তারপর তাঁর শ্রবণ, তারপর তাঁর মনন এবং নিদিধ্যাসনলভ্য বিজ্ঞান।

সূর্যের দর্শন হল তাঁর 'কল্যাণতম রূপে'র দর্শন। ছান্দোগ্যে তার সামান্যত সংজ্ঞা 'শুক্লং ভাঃ'।[২৬২] কিন্তু রূপকে ছাপিয়ে আছে অরূপ। আদিত্যের শুক্লভাতির পিছনে আছে 'নীলং পরঃ কৃষ্ণম্' অর্থাৎ রংছুট আকাশের নীলিমা। আকাশ আর আদিত্য দুটি মিলিয়ে একটি অখণ্ড সত্তা। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে রূপের পিছনে আছে ভাব। অথবা বৌদ্ধ পঞ্চস্কন্ধবাদ অনুসরণ করে বলতে পারি, রূপের পিছনে আছে নাম। নাম বেদে একটি রাহস্যিক সংজ্ঞা—বোঝায় ব্যাকৃতের (manifest) আধারশক্তি অব্যাকৃতকে (unmanifest)। 'অপীচ্য' বা রহস্যময় 'গুহ্য নামে'র কথা সংহিতার নানাজায়গায় আছে—সন্ধাভাষায়।[২৬৩] যা নাম, অধিদৈবত এবং অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তা-ই বাক্, আর তা ওম্।[২৬৪] যেমন আদিত্যের পিছনে আকাশ, তাঁর শুক্লভাতির পিছনে পরঃকৃষ্ণের নীলিমা,

তেমনি রূপের পিছনে নাম। অতএব আকাশ নামের আশ্রয় এবং রূপের নির্বাহক।[২৬৫] আকাশ বা পরমব্যোমের মহাশূন্যতা হতেই সৃষ্টি বা 'অক্ষরের ক্ষরণ'।[২৬৬] সৃষ্টি নাম আর রূপ, আকাশ তার উৎস। দর্শনে তাই আকাশের গুণ শব্দ। আকাশকে দেখি আদিত্যরূপে, শুনি রূপোত্তর নামে—ওঙ্কারের ঝঙ্কারে, গৌরীর হাম্বারবে।[২৬৭]

এই গৌরী বাক্। বাক্ ব্রহ্মের অবিনাভূত স্বরূপশক্তি। যতখানি ব্রহ্মের ব্যাপ্তি ততখানি বাকেরও।[২৬৮] আমাদের বাক্ অবরোহক্রমে এই বাকেরই চতুর্থ পদ। আর তিনটি পদ গুহাহিত। তার কথা আগে বলেছি। বাকের আপ্যায়নে আমাদের 'উচ্চারিত' মন্ত্রের অন্তর্নিহিত শক্তির স্ফুরণ হয় আরোহ-ক্রমে। সেই বাকের যে-শ্রবণ, তাইতে শ্রোত্রের আপ্যায়ন।

একই বাকের উচ্চারণ এবং শ্রবণ একসঙ্গে চলে। যে-বাক্ আমি 'উচ্চারণ' বা উচ্চালন করছি অর্থাৎ উজিয়ে দিচ্ছি আকাশের দিকে, সেই বাকই আবার ওখান থেকে ফিরে আসছে আমার কানে। এ যেন ধ্বনি উজিয়ে যাচ্ছে এখান থেকে, আর প্রতিধ্বনি হয়ে ভাটিয়ে আসছে ওখান থেকে। ওখান থেকে আমার উচ্চারিত বাক্ যিনি শুনছেন, তিনি 'আশ্রুৎকর্ণ'—তাঁর কান সর্বদিকে।[২৬৯] উপনিষদে তিনি 'শ্রৌত্র' পুরুষ। ওখান থেকে যে-বাকে তিনি সাড়া দিচ্ছেন, তা নেমে আসছে আমার কানে 'প্রাতিশ্রুৎক' পুরুষ। আর তিনি 'ইমা বিশ্বা জাতান্যা-শ্রাবয়তি শ্লোকেন, প্র চ সুবাতি।'[২৭০] রামকৃষ্ণদেবের অনুপম ভাষায় এ যেন 'আমার ভিতর থেকে কেউ ডেকে উঠল—চখা! আর অমনি ওপার থেকে সাড়া এল—চখী!' এমনিতর অন্যোন্যসম্ভাবনকে বৃহদারণ্যকে একটি মধুময় অধ্যাত্মব্যাপার বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[২৭১] আকাশজোড়া এই ধ্বনি-প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়ছে দিকে-দিকে। তাই দিক্‌সমূহ তার দেবতা।[২৭২]

সবিতার এই 'আশ্রাবণে'ই শ্রোত্রের পরম আপ্যায়ন। সূক্ষ্ম শ্রুতি দিয়ে শুনি তাঁর 'শ্লোক'—যার আরেক নাম 'ব্যাহৃতি' বা সৃষ্টির মন্ত্র। তার মূলে রয়েছে আদি 'কাম' বা তাঁর 'মনসো রেতঃ'—যা তাঁর সিসৃক্ষা বা বহু হওয়ার ইচ্ছা।[২৭৩] এই কামের প্রেষণাই ব্রহ্মশক্তি বাকের পরম পদ—দর্শনে যার সংজ্ঞা 'স্ফোট' কিনা ফুটি-ফুটি ভাব। একটা কিছু ফুটছে, অথচ তার রূপ নাই। যেন অমানিশার তৃতীয় প্রহরের আকাশ। তাতে আলো ফোটবার সম্ভাবনা রয়েছে, কিন্তু আলো ফোটেনি। অথচ ফোটবার আবেগে আকাশের নৈস্তব্ধ্য যেন থরথর করে কাঁপছে। অসম্ভূতিতে সম্ভূতির এই শক্তিস্পন্দই তন্ত্রের পরা বাক্। পরার পর পশ্যন্তী—যেন ঊষার আলো। সংহিতার ভাষায় 'স্বর্ বৃহৎ' বা 'বৃহজ্জ্যোতিঃ'[২৭৪]—যে-আলো বেড়ে চলছে, ছড়িয়ে পড়ছে। তার পর

বাক্ মধ্যমা—যেন কীর্ণরশ্মি সবিতার আলোর দ্যুলোকে, পৃথিবীতে তখনও আঁধারের রেশ রয়েছে।[২৭৫] বাকের এই তিনটি পদ গুহাহিত—যার খবর মন পায় না, পায় মনীষা।[২৭৬] বাকের চতুর্থ পদ হল ইন্দ্রিয়-মনের গোচর—যা আমাদের মুখের ভাষা। তখন যেন ভগের 'উৎসর্পণে সব আলো হয়ে উঠল, শুরু হল মর্ত্য জীবলীলা। মধ্যাদিন পর্যন্ত ভগের অধিকার।[২৭৭]

সৃষ্টি অব্যক্তের অভিব্যক্তি—এই কথা মনে রেখে বাকের এ-পরিচিতি অবরোহক্রমে জ্যোতিঃস্ফোটের দিক থেকে। শব্দস্ফোটের দিক থেকে বাকের পরিচিতি হতে পারে আরোহক্রমে। বাক্ তখন উজিয়ে যায় মনে বা ভাবনায়, সেখান থেকে বোধিজ প্রত্যক্ষে, আবার তাথেকে অব্যক্তের শক্তিস্পন্দে। ঐতরেয়োপনিষদের শান্তিপাঠপ্রসঙ্গে তার কিছু আলোচনা আছে। এটি যে মন্ত্র-সাধনার অনুকূল, সেকথা আগেই বলেছি। যোগে যখন অর্থভাবনাসহ প্রণব জপ করতে বলা হয়, তখনকার এই রীতি। বাক্ তখন গুটিয়ে আসে মনে বা ভাবে, ভাব থেকে প্রতিভানে এবং প্রতিভান থেকে শক্তিতে। এটি লয়ের ধারা। হঠযোগের নাদানুসন্ধানও তা-ই। উজান-ভাটা দুটি ধারাতে বাকের আপ্যায়ন সম্পূর্ণ হয়। আর তাইতে শ্রোত্রেরও সম্পূর্ণ আপ্যায়ন—অন্যোন্যসম্ভাবনের ফলে। দেবতার বাক্ নেমে আসছে, আর আমি দু'কান ভরে তা শুনছি—'কর্ণাভ্যাং ভূরি বিশ্রুবম্'; আর তাইতে 'জিহ্বা মে মধুমত্তমা'—আমিও তাঁর উদ্দেশে উচ্চারণ করছি 'মধুমত্তমং বচঃ', যা তাঁর 'শন্তমং হৃদে'—শুনে হৃদয় নিথর হয়ে যাচ্ছে অনুত্তম শান্তিতে।[২৭৮] এ সেই চখা-চখীর মধুরা রতি।

লৌকিকভাবেও শ্রোত্রের আপ্যায়ন হতে পারে 'পারায়ণে'—আচার্যের প্রবচন শুনে অন্তেবাসী অনুবচনে। আচার্য তখন 'শাক্ত'—অন্তেবাসীতে মন্ত্রশক্তির সঞ্চারণে সমর্থ; আর 'শিক্ষমাণ' অন্তেবাসীও শ্রদ্ধায় তাকে গ্রহণ করেন।[২৭৯] এটি 'শিক্ষা'—বেদাঙ্গের সাধনা। তার পরম সার্থকতা, যখন অর্থভাবনা ছাড়াই মন্ত্রের শ্রুতি তার সিদ্ধবীর্যের দ্বারা অচিত্তির আবরণভঙ্গ করতে পারে।[২৮০]

শ্রোত্রের আপ্যায়নে চারটি ব্রহ্মপুরুষের আপ্যায়নের প্রসঙ্গ শেষ হল—বাকী রইল শুধু মনের আপ্যায়ন। কিন্তু মন এই চারটিতেই অনুস্যূত বলা চলে—কেননা আপ্যায়নের সে-ই মুখ্য সাধন। সাধনায় মনই 'যজমান,'[২৮১] মন 'দৈব চক্ষু',[২৮২] মন 'অনন্ত',[২৮৩] মন 'পরম দেবতা'—কেননা মন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের আয়তন।[২৮৪] এর পরে যে সর্বেন্দ্রিয়ের আপ্যায়নের কথা বলা হয়েছে, তাই হল মনের আপ্যায়ন।

আগেই বলেছি আপ্যায়নের সাধনায় এখানে একটি ক্রম আছে—অঙ্গ দিয়ে শুরু, আর মন দিয়ে সারা। সব মিলে দেহ প্রাণ মনের আপ্যায়ন—যাদের

মধ্যে প্রজ্ঞানের উত্তরোত্তর উন্মেষ। প্রাণ কর্মেন্দ্রিয় (বাক্) এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে সেতু। লক্ষণীয়, বৃহদারণ্যকের ষড়াচার্যব্রাহ্মণেও যাজ্ঞবল্ক্য ঠিক এই ক্রম অনুসরণ করেছেন।[২৮৫] তবে সেখানে অঙ্গের কথা নাই, তার বদলে সবার শেষে আছে হৃদয়ের কথা। আর প্রত্যেকটি ব্রহ্মপুরুষই 'পরমং ব্রহ্ম' অর্থাৎ এদের যে কোনও একটিকে ধরে চরম লক্ষ্যে পেঁছান যায়। তা হল যথাক্রমে প্রজ্ঞা প্রিয়তা সত্য অনন্ত আনন্দ এবং স্থিতি। হৃদয়ের বিশিষ্ট ধর্ম ব্রাহ্মী স্থিতি, যার উপর যাজ্ঞবল্ক্য নানাজায়গায় জোর দিয়েছেন।

এই হল আপ্যায়নের প্রথম পর্ব। তার পর **অথো** দিয়ে দ্বিতীয় পর্বের শুরু। ওটিকে বলা চলে প্রথম পর্বেরই পরিণাম।

অঙ্গ এবং ব্রহ্মপুরুষদের আপ্যায়নের ফলে ('অথো') তনুতে এবং আত্মায় ঘটে **বলের** আবির্ভাব।[২৮৬] ঋক্‌সংহিতায় 'বল' সংজ্ঞার অনেক প্রয়োগ আছে। প্রকরণ থেকে বোঝা যায়, তার তাৎপর্য বিশেষ করে 'ওজঃ' এবং 'বীর্য'।[২৮৭] ইন্দ্রের সঙ্গে তার বিশেষ সম্পর্ক—তিনি স্বয়ং বল হতে জাত এবং আমাদের 'বলদাঃ'।[২৮৮] একজায়গায় তাঁকে বলা হয়েছে 'বলবিজ্ঞায়'।[২৮৯] মুণ্ডকোপনিষদে বলা হয়েছে, 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।'[২৯০] অতএব বল একটি মুখ্য অধ্যাত্মসম্পদ্—যা যোগদর্শনের 'বীর্য'-নামক উপায়প্রত্যয়, ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠার ফলে যা লাভ করা যায়।[২৯১] সাধকের বল অভীপ্সার একটা তীব্র-সংবেগ—সংহিতায় যাকে বলা হয়েছে 'সহঃ' বা 'তরঃ' অর্থাৎ সব বাধা ঠেলে এগিয়ে যাবার শক্তি।[২৯২] আর সিদ্ধের বল হল শক্তিসঞ্চারের সামর্থ্য, যার জন্য তাঁর সংজ্ঞা 'শাক্ত'। উভয়ের সম্মিলিত বলই ইষ্টলাভের প্রয়োজক, তাই উপনিষদের শান্তিপাঠে দেখি আচার্য এবং অন্তেবাসীর প্রার্থনা: 'সহ বীর্যং করবাবহৈ।' ছান্দোগ্যে বলকে বিজ্ঞানের চাইতেও বড় বলা হয়েছে এইজন্য যে শুধু বিজ্ঞানেই সিদ্ধির পূর্ণতা নয়, তার পূর্ণতা সেই বিজ্ঞানকে অপরের মধ্যে সঞ্চারিত করবার সামর্থ্যে।[২৯৩]

যোগে যেখানে আছে শ্রদ্ধা এবং বীর্যের কথা, উপনিষদে সেখানে পাই শ্রদ্ধা এবং তপের কথা।[২৯৪] বলের আপ্যায়ন হয় তপস্যায়। আর তপস্যার আদর্শ অগ্নি এবং আদিত্য—বিশেষ করে আদিত্য, যাঁর তাপ এবং জ্যোতির বিকিরণ অফুরন্ত। অতএব আদিত্যভাবনাতেই ব্রহ্মপুরুষদের আপ্যায়ন এবং তার ফলে বলেরও আপ্যায়ন।

তনুতে এবং আত্মায় বলাধান হলে পর আপ্যায়িত হবে **সর্বাণি ইন্দ্রিয়াণি**। দশটি ইন্দ্রিয় প্রসিদ্ধ—পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। 'দশযন্ত্র' বলে ঋক্‌সংহিতায় এদের সামান্যত উল্লেখ আছে—কিন্তু দশটি কি কি, তা বলা

হয়নি।[২৯৫] বৃহদারণ্যকেও বলা হয়েছে পুরুষের শরীরে প্রত্যক্ষ দশটি প্রাণ আর আত্মা মিলে হল একাদশ রুদ্র।[২৯৬] সেখানেও দশটি প্রাণ কি কি, তা বলা হয়নি। কিন্তু ইন্দ্রিয়েরা প্রাণের বৃত্তি, তাই দশটি প্রাণ স্পষ্টতই দশটি ইন্দ্রিয়কে বোঝাচ্ছে। বৃহদারণ্যকের অন্যত্র ত্বক্ নাসিকা জিহ্বা চক্ষু শ্রোত্র এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের এবং হস্ত উপস্থ পায়ু পাদ আর বাক্ এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়ের উল্লেখ পাই। তাছাড়াও আছে মন এবং হৃদয়ের কথা।[২৯৭] দশটি ইন্দ্রিয়ের আলাদা-আলাদা উল্লেখ প্রশ্নোপনিষদেও আছে।[২৯৮] কৌষীতকিতে অন্যোন্যনির্ভর দশটি ভূতমাত্রা এবং দশটি প্রজ্ঞামাত্রার প্রসঙ্গ আছে। সেখানে পাই বাক্ গন্ধ রূপ শব্দ অন্নরস কর্ম সুখ-দুঃখ আনন্দ-রতি-প্রজাতি ইত্যা (গতি) আর মন, আর তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত দশধা প্রজ্ঞাবৃত্তি। সবাই প্রাণের আশ্রিত।[২৯৯] এখানে দেখছি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে রসনার ইশারা পাওয়া যায় অন্নরসে, আর স্পর্শের ইশারা আনন্দ-রতিতে।[৩০০] কর্ম হয় সামান্যত হস্তের দ্বারা,[৩০১] প্রজাতি উপস্থের দ্বারা। পায়ুর উল্লেখ নাই, স্পর্শ ও প্রজনন উপস্থে সমবেত। দুটি ফাঁক পূর্ণ করা হয়েছে সুখ-দুঃখ এবং মনের দ্বারা। তৈত্তিরীয়োপনিষদেও ইন্দ্রিয়প্রসঙ্গ আছে—তার কথা পরে হবে। মোটের উপর দশটি ইন্দ্রিয়ের কাঠামকে খুবই প্রাচীন বলা যেতে পারে। মন হৃদয় এবং আত্মার সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংহতি লক্ষণীয়।

যা ইন্দ্রের, তা 'ইন্দ্রিয়'। এই অর্থে সংহিতায় সংজ্ঞাটির অনেক ব্যবহার আছে—যেমন 'ইন্দ্রিয়ো রসঃ' (সোম), 'ইন্দ্রিয়া হয়াঃ', 'মহিমানম্ ইন্দ্রিয়ম্' ইত্যাদি।[৩০২] যখন বিশেষ্য, তখন বোঝায় 'ইন্দ্রবীর্য'—যেমন 'ইন্দ্রিয়ং বৃহৎ,' 'মহতে ইন্দ্রিয়ায়', 'জ্যেষ্ঠম্ ইন্দ্রিয়ম্' ইত্যাদি।[৩০৩] এই অর্থে অন্যান্য সংহিতাতেও অনেক প্রয়োগ আছে। কেবল শৌনকসংহিতার শেষের দিকে আমাদের পরিচিত 'করণ' (sense) অর্থে পাই, 'ইমানি য়ানি পঞ্চেন্দ্রিয়াণি মনঃষষ্ঠানি যে হৃদি ব্রহ্মণা সংশিতানি।'[৩০৪] এই অর্থে পাণিনির ব্যুৎপত্তি: 'ইন্দ্রিয়ম্ ইন্দ্রলিঙ্গম্ ইন্দ্রদৃষ্টম্ ইন্দ্রসৃষ্টম্ ইন্দ্রপুষ্টম্ ইন্দ্রদত্তম্ ইতি বা।'[৩০৫] ইন্দ্র সেখানে পরমদেবতা বা আত্মা। ইন্দ্রিয়শক্তির প্রকাশ শীর্ষণ্য প্রাণে, তা অন্তর্যামী ইন্দ্রেরই প্রজ্ঞার স্ফুরত্তা (dynamis)—এই ভাবনা থেকে 'ইন্দ্রিয়' চক্ষুরাদি করণের রূঢ় সংজ্ঞা হয়েছে। বৌদ্ধদর্শনে যে-কোনও করণের পরম উৎকর্ষ ঘটলেই তাকে 'ইন্দ্রিয়' বলা হয় অর্থাৎ চক্ষুঃ তখনই 'ইন্দ্রিয়' বা ইন্দ্রবীর্যযুক্ত, যখন সে পরমকে দেখে—এই প্রসিদ্ধি লক্ষণীয়। এর মধ্যে বৈদিক আপ্যায়নের ভাবনা সুস্পষ্ট।

শান্তিপাঠে যে সর্বেন্দ্রিয়ের আপ্যায়নের কথা বলা হয়েছে, তা বৈদিক চিন্ময়প্রত্যক্ষবাদের অনুকূল। দেবতার শুধু অধ্যাত্ম অনুভব নয়, তাঁর

অধিদৈবত অনুভব দিয়েই সেখানে সাধনার শুরু। আমাকে ঘিরে এক মহাবৈপুল্য—পৃথিবীতে পর্বতে সমুদ্রে আলোয় বাতাসে আকাশে সর্বত্র এক 'উরুর্ অনিবাধঃ'। তার অনুভবে চেতনার যে উদ্দীপন এবং বিস্ফারণ—তা-ই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, তা-ই ভূমা। ছান্দোগ্যের ভাষায়, 'স এবা.ধরস্তাৎ, স উপরিষ্টাৎ, স পশ্চাৎ, স পুরস্তাৎ, স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ। স এব ইদং সর্বম্ ইতি।' এই ইন্দ্রিয়বোধ সঞ্চারিত হয় অন্তর্হৃদয়ে, তখন 'অথা.তো হহঙ্কারাদেশ···অহম্ এব অধস্তাদ্, অহম্ উপরিষ্টাদ্, অহং পশ্চাদ্, অহং পুরস্তাদ্, অহং দক্ষিণতো, হহম্ উত্তরতো, হহম্ এবে.দং সর্বম্ ইতি'। এই অহং, আবার বিস্ফারিত হয় আত্মাতে ঃ 'অথা.ত আত্মাদেশ এব। আত্মৈ.বা.ধস্তাদ্, আত্মো.পরিষ্টাদ্, আত্মা পশ্চাদ্, আত্মা পুরস্তাদ্, আত্মা দক্ষিণত, আত্মো.ত্তরত, আত্মৈ.বে.দং সর্বম্ ইতি'[৩০৬]

এই এক অপরূপ সাধনা এবং সিদ্ধি—যা বেদের সার। মধ্যযুগের মরমীয়া একে বলছেন 'সহজ সমাধি' ঃ 'আঁখ ন মূদঁ কান ন রূধঁ সহজ সমাধি ভলী।'

এই অনুভব দিয়ে তৈত্তিরীয়োপনিষদের উপসংহার ঃ 'ব্রহ্ম তখন ক্ষেমরূপে বাকে, প্রাণাপানে তিনি যোগক্ষেম, দুটি হস্তে কর্ম, দুটি পদে গতি, পায়ুতে বিমুক্তি। এই হল মানুষী সমাজ্ঞা। তারপর দৈবী সমাজ্ঞা ঃ ব্রহ্ম বৃষ্টিতে তৃপ্তি, বিদ্যুতে বল, পশুতে যশ, নক্ষত্রসমূহে জ্যোতি, উপস্থে প্রজাতি অমৃত আনন্দ, আকাশে সব।···এই যিনি পুরুষে, আর ওই যিনি আদিত্যে—তিনি এক।' এমনি করে যিনি জানেন, তিনি কামান্নী কামরূপী হয়ে সর্বলোকে স্বচ্ছন্দসঞ্চারী হন। তাঁর সমস্ত জীবন তখন একটি সামগান—যাতে অনুরণিত হয় আত্মার মহিমা।[৩০৭]

সর্বেন্দ্রিয়ের পরম আপ্যায়নের এই ছবি। তারই রূপরেখা দেখি গোতম রাহূগণের এই ব্রহ্মঘোষে ঃ[৩০৮]

ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা
ভদ্রং পশ্যেমা.ক্ষভির্ যজত্রাঃ।
স্থিরৈর্ অঙ্গৈস্ তুষ্টুবাংসস্ তনূভির্
ব্য.শেম দেবহিতং যদ্ আয়ুঃ ॥

—ভদ্রকেই আমরা কান দিয়ে শুনি যেন হে দেবগণ, ভদ্রকেই দেখি যেন চোখ দিয়ে হে যজনীয়গণ। স্থির অঙ্গ দিয়ে স্তব করেছি আমরা—(করেছি) তনু দিয়ে। (এবার) যেন সম্ভোগ করি দেবহিত যা আয়ু।

যা প্রজ্বল, যা প্রশস্ত, তা ই 'ভদ্র'।[৩০৯] পরমদেবতা সর্বতোভদ্র। তাঁর 'ক্রতু' বা সৃষ্টিবীর্য ভদ্র—অগ্নি আর সোমরূপে, তাঁর 'রাতি' বা প্রসাদ ভদ্র—ইন্দ্রের অকৃপণ দানরূপে।[৩১০] এই ভদ্রকে শোনা, এই ভদ্রকে দেখা, তার বীর্যে দৃঢ় অঙ্গ আর তনুকে রূপান্তরিত করা সুভদ্র স্তবের শিখায়—এই আমাদের পরমপুরুষার্থ। আর তাইতে শতবর্ষমিত দেবহিত আয়ুর পরিপূর্ণ সম্ভোগ—জিজীবিষার এই পরম আপ্যায়নই আমরা চাই।

এমনি করে আত্মা এবং তনুর সর্বতোভদ্র আপ্যায়নের পর অনুভূত হয়ঃ **সর্বম্ ঔপনিষদং ব্রহ্ম**—আমার সব-কিছুই ঔপনিষদ ব্রহ্ম। ছান্দোগ্যের শাণ্ডিল্যবিদ্যায় আছে, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'।[৩১১] এটি তারই অনুরূপ একটি মহাবাক্য। ব্রহ্ম দ্বিবিধ—শব্দ-ব্রহ্ম এবং ঔপনিষদ-ব্রহ্ম বা পর-ব্রহ্ম। ঋক্-সংহিতায় পাই, বাক্ আর ব্রহ্ম অবিনাভূত[৩১২]—ব্রহ্ম চৈতন্য, বাক্ তাঁর শক্তি। তনু ও আত্মার আপ্যায়নে চৈতন্যের যে-বৃহত্তা বা বিস্ফারণ, তা-ই ব্রহ্ম। এই ব্রহ্ম স্ফুরিত হয় বাক্এ বা মন্ত্রে। মন্ত্র মনোজ্যোতির স্পন্দ—আদিত্যের ক্ষোভের মত।[৩১৩] তার পর্যবসান ওঙ্কারে। এই ওঙ্কার শব্দ-ব্রহ্ম। বেদমন্ত্র তারই প্রপঞ্চন। শব্দ-ব্রহ্ম সাধনদশায় পর-ব্রহ্মের বাচক। পর-ব্রহ্মের 'উপ-নিষত্তি' বা গহন-গভীর আবেশের ফলেই তাঁর প্রতিবোধ হয়। তা-ই তিনি ঔপনিষদ ব্রহ্ম। বৃহদারণ্যকে তাঁকে বলা হয়েছে 'ঔপনিষদ পুরুষ'—যিনি শারীর কামময় আদিত্যস্থ শ্রোত্র-প্রাতিশ্রুৎক ছায়াময় আদর্শস্থ অপ্স্থ এবং পুত্রময় এই আটটি পুরুষের নির্বাহ করে তাদের ছাপিয়ে আছেন।[৩১৪]

পুরুষের আত্মায় এবং তনুতে ঔপনিষদ-ব্রহ্মের 'উপনিষত্তি' তাঁর দিক থেকে যেমন 'আবেশ', পুরুষের দিক থেকে তেমনি 'উপলব্ধি'। জৈমিনীয়োপনিষদে এই উভয় অর্থে উপ-নি ষদ্ ধাতুর ব্যবহার আছে।[৩১৫] দুটি অর্থ মিলিয়ে 'উপনিষৎ' শব্দের অর্থ হয় 'বৃহতের আবেশজনিত লোকোত্তর অনুভব'। এই ভাবটি কেনোপনিষদের নানাজায়গায় ফুটে উঠেছে।[৩১৬]

অলৌকিকের অনুভব প্রথমটায় হয় বিদ্যুৎ-ঝলকের মত—দেখা দিয়েই তা মিলিয়ে যায়। মনের মধ্যে জাগিয়ে তোলে আরও নিবিড় করে পাওয়ার আকুলতা এবং সঙ্কল্প।[৩১৭] এই আকুলতা ফুটে উঠেছে শান্তিপাঠের পরের মন্ত্রেঃ **মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং, মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ—অনিরাকরণম্ অস্তু**। তিনি এলেন, তিনি চলে গেলেন। আমিই কি তাঁকে ফিরিয়ে দিলাম? না, না—আমি তো তা চাইনি। তবুও প্রমাদ ঘটা কিছুই বিচিত্র নয়—কেননা আমি যে এখনও অচিত্তির কবলিত, আমার শক্তির চাইতে অনৃতের শক্তি যে এখনও প্রবল।[৩১৮] কিন্তু দেবতা তো জানেন, সামর্থ্যের দীনতাতেই আমার এই প্রতীপ আচরণ, নইলে জলের মধ্যে থেকেও যে আমি তৃষ্ণায় শুকিয়ে

মরছি। তাইতো বলি, হে সন্ক্ষত্র, আমায় ক্ষমা কর, প্রসন্ন হও আমার প্রতি।[৩১৯] আমি যেন কখনও তোমায় ফিরিয়ে না দিই, তুমিও যেন আমায় ফিরিয়ে দিও না। আর ফিরিয়ে দেওয়া নয়, দেবতা—আর কাউকে কারও ফিরিয়ে দেওয়া নয়। আমার 'ক্রতু'র[৩২০] দীনতা দূর কর, দেবতা—আমায় সঙ্কল্পে অটল কর ঃ আমি যেন কখনও কিছুতেই তোমায় ফিরিয়ে না দিই। **অনিরাকরণং মে হস্তু।**

এই আকূতি আর সত্যসঙ্কল্পেই চলবিদ্যুৎ স্থির হয়। তখন আমি **তদাত্মা**—সেই অনির্বচনীয় তৎস্বরূপই আমার আত্মা। 'শুদ্ধ উদকে শুদ্ধ উদক' মেশার মত[৩২১] তখন তাঁর সঙ্গে আমি একাকার। তাঁতে স্মৃতির পর এই আমার **নিরতি**[৩২২]—সত্তার পরিপূর্ণ বিশ্রান্তি।

কিন্তু এই নিরতি কেবল উপশম নয়—এ এক মহোল্লাসের সূচনা। নিরতি তো একদিনে আসেনি। বারবার আমার মধ্যে তিনি নেমে এসে উপনিষন্ন হয়েছেন, আমার আত্মা এবং তনুর সবখানি জুড়ে তাঁর আসন পেতেছেন। আর তাঁর এই **উপনিষদে** বা আবেশে আমার মধ্যে স্ফুরিত হতে চেয়েছে সেইসব ধর্ম যা দিকচক্রবাল হতে মাধ্যন্দিন মহিমায় বিষ্ণুর উৎক্রমণের প্রতি পর্বে ফুটে ওঠে।[৩২৩] এরাই বিশ্বের প্রথম ধর্ম, সৃষ্টির আদিতে অনুষ্ঠিত দেবযজ্ঞের সার্থক পরিণাম—মানুষের উৎসর্গসাধনায় এরা ফোটে আত্মার লোকোত্তর মহিমারূপে।[৩২৪]

হে দেবতা, তোমার আবেশে জারিত এবং আপ্যায়িত আমার তনুতে ফুটে উঠুক—ফুটে উঠুক সেইসব ধর্ম। আমাদের দৃষ্টি খুলে যাক—আমাদের মধ্যে নামুক দ্যুলোকের **শান্তি**, নামুক অন্তরিক্ষের **শান্তি**, ছেয়ে থাক পৃথিবীর **শান্তি**।[৩২৫]

শান্তিপাঠের পর এইবার গ্রন্থারম্ভ।

প্রথম খণ্ড

আগেই বলেছি, কেনোপনিষৎটি অন্তেবাসী আর আচার্যের একটি সংবাদের আকারে। অন্তেবাসীর একটি প্রশ্ন দিয়ে উপনিষদের আরম্ভ। তারপর আর দু'বার মাত্র তার দেখা পাই।[৩২৬] কিন্তু তার স্বল্পভাষণের মধ্যেই একটি বিদগ্ধ জিজ্ঞাসু হৃদয়ের পরিচয় সুন্দর ফুটে উঠেছে।

পরিপ্রশ্নের রীতি শুধু যে উপনিষদ্‌গুলির বৈশিষ্ট্য, তা নয়। ব্রহ্ম, জিজ্ঞাসার প্রাচীন সংজ্ঞা হল 'ব্রহ্মোদ্য' বা 'বাকোবাক্য'। এটি তত্ত্বজ্ঞের সঙ্গে তত্ত্বজ্ঞ অথবা তত্ত্বজিজ্ঞাসু উভয়েরই প্রশ্নোত্তর হতে পারে। সংহিতায় দুয়েরই অনেক উল্লেখ আছে।[৩২৭] বিশ্বরহস্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা মনীষার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ।[৩২৮] এটি অনেকক্ষেত্রে অন্তরদেবতার প্রতি জিজ্ঞাসার রূপ ধরেছে—যেমন এই যুগে দেখি রামকৃষ্ণদেবের মায়ের কাছে জিজ্ঞাসায়।[৩২৯]

যে জানে না বোঝে না, তার বিশিষ্ট সংজ্ঞা হল 'পাক'।[৩৩০] তার মধ্যে যে জিজ্ঞাসা জাগে, তা পরমদেবতারই আবেশে—যিনি 'ধী-র' অর্থাৎ বিজ্ঞানময়।[৩৩১] দেবতার আবেশ যেমন আপ্যায়নের হেতু, তেমনি জিজ্ঞাসারও উদ্‌বোধক। জিজ্ঞাসা এক্ষেত্রে সংশয় বা তর্কবুদ্ধি থেকে জাগেনি, জেগেছে 'মীমাংসা' হতে। বৈদিক তত্ত্বজিজ্ঞাসা জল্প বা বিতণ্ডা নয়—বাদ, এই কথাটি মনে রাখতে হবে। এ-প্রসঙ্গে ইওরোপীয় প্রকল্প নিতান্তই দিগ্‌ভ্রষ্ট।

অন্তেবাসী গুরুগৃহে এসেছে ব্রহ্মোপলব্ধির জন্য ব্রহ্মচারী হয়ে। সে তো 'দেবনিদ্‌' নয়—'দেবয়ু', দেবতাকেই সে চায়, সে দেবতাদেরই একটি অঙ্গ।[৩৩২] দেবতা যে চিন্ময়প্রত্যক্ষের গোচর, একথা সে শুনেছে, ব্রহ্মপুরুষদের কথাও সে জানে। এখন এই ব্রহ্মপুরুষদের কি করে ব্রহ্মে ব্যাপারিত করতে হবে, এই নিয়ে তার জিজ্ঞাসা। আর এই হতে উপনিষদের শুরু।

অন্তেবাসীর প্রশ্ন ঃ

> কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
> কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
> কেনেষিতাং বাচম্ ইমাং বদন্তি
> চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি ॥ ১

—কার এষণায় উড়ে চলে প্রেষিত (এই) মন? প্রথম প্রাণ এগিয়ে চলেছে কার দ্বারা যুক্ত হয়ে? কার ইষিত এই বাক্‌কে (সবাই) বলে মুখ ফুটে? চক্ষু (আর) শ্রোত্রকে কোন্ দেবতা যুক্ত করেন?

প্রশ্নটি বিদগ্ধ পুরুষের—সম্প্রদায়াগত পারিভাষিক শব্দে গাঁথা। যাজ্ঞবল্ক্যের ভাষায় অন্তেবাসী এক্ষেত্রে জনকের মতই 'অধীতবেদ উক্তোপনিষৎকঃ'।[৩৩৩] এপর্যন্ত যা সে শুনেছে বা জেনেছে, তাকে সে যাচাই করে নিতে চায় 'মনের জবন আর হৃদয়ের তক্ষণ' দিয়ে।[৩৩৪] চিত্তের এই আলোড়নের একটি সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায় বার্হস্পত্য ভারদ্বাজের এই মন্ত্রটিতে ঃ[৩৩৫]

বি মে কর্ণা পতয়তো বি চক্ষুর্
বী দং জ্যোতির্ হৃদয় আহিতং যৎ।
বি মে মনশ্ চরতি দূরআধীঃ
কিং স্বিদ্ বক্ষ্যামি কিমু উ নু মনিষ্যে॥

—উড়ে চলুক আমার দুটি কান, উড়ে চলুক এই জ্যোতি—হৃদয়ে যা আহিত। আমার মন যে বিচরণ করছে সুদূরের ভাবনায়; কীই-বা বলব আমি, কীই-বা ভাবব।

লক্ষণীয়, এখানে পাঁচটি ব্রহ্মপুরুষকেই পাচ্ছি—কেবল প্রাণের জায়গায় আছে 'হার্দজ্যোতি' যাকে ঠিক আগের ঋকেই বলা হয়েছে বৈশ্বানর অগ্নি—যিনি প্রজ্ঞাত্মক প্রাণ।[৩৩৬] উপনিষদের মন্ত্রটিতেও পাঁচটি ব্রহ্মপুরুষের কথা আছে—যদিও শান্তিপাঠে মন ছিল উহ্য।

বৃহতের আবেশে আপ্যায়িত ইন্দ্রিয়েরা উদ্যত হয়ে আছে। কিন্তু এখনও অনুভব প্রকীর্ণ—সংহত নয়। আকাশে বিদ্যুতের উন্মেষ-নিমেষ বারবার শুধু তাদের চমকে দিয়ে যাচ্ছে। কোথায় তাদের প্রতিষ্ঠা, কোথায় সংহতি? জিজ্ঞাসা জেগেছে একটা আলো-আঁধারির মধ্য থেকে—নাস্তিকের সংশয় নিয়ে নয়, নিবিড় প্রত্যয়ের জন্য আস্তিকের একটা ব্যাকুলতা নিয়ে। যা পাচ্ছি, তা আভাস মাত্র। কি করে তা প্রভাস হয়ে উঠবে—কার এষণায়, কার প্রযোজনায়?

প্রথমেই কথা ওঠে মনকে নিয়ে। কেননা অধ্যাত্মসাধনায় সে-ই যজমান,[৩৩৭] তার জবন বা সংবেগ হতেই সাধনার শুরু। বেশ বোঝা যায়, **মন** স্ব-তন্ত্র নয়—সে **ইষিত** বা প্রচোদিত। সে **পততি**—উড়ে চলেছে সুদূরের পিপাসায়, দিনের শেষে পাখি যেমন উড়ে চলে কুলায়ে তেমনি করে।[৩৩৮] যেমন পিছন থেকে কেউ তাকে ঠেলছে নেপথ্যচর সবিতার মত, তেমনি আবার সামনে থেকে টানছেও মাধ্যন্দিন ভর্গের মত—তাই সে প্রেষিতও।[৩৩৯] রাত্রির অন্ধকার উত্তীর্ণ হবে দিনের প্রোজ্জ্বল মহিমায়—জ্যোতিরগ্র মন সেই দেবযানের পথিক। কিন্তু কে তার 'বিদ্বান্ পথঃ পুরএতা'—পথের খবর-জানার অলখ দিশারী?[৩৪০]

তারপর মনের জানাই সব নয়। সে জানে শুধু জাগ্রৎকে—জ্ঞান যেখানে এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে আছে। তাকে গুছিয়ে নিতে হলেই মনকে তলিয়ে যেতে হয়। জাগ্রতের গভীরে আছে সুপ্তি—মন সেখানে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু তখনও জেগে থাকে প্রাণ।[৩৪১] এই প্রাণও ব্রহ্মপুরুষ। প্রাণ দিয়ে জানা মন দিয়ে জানার চাইতেও গভীর, নির্দ্বন্দ্ব এবং অপাপবিদ্ধ।[৩৪২] কিন্তু অধ্যাত্ম প্রাণের মূলে আছে অধিদৈবত প্রাণ বা 'মহান্ত পুরুষের' প্রাণ—আমরা যাকে বলি 'বায়ু'।[৩৪৩] ইনিই **প্রথমঃ প্রাণঃ**—সংহিতায় তাঁকে বলা হয়েছে 'মাতরিশ্বা'।[৩৪৪] মাতরিশ্বা আর বৈশ্বানর লোকভেদে একই দেবত্বের দুটি বিভাব—একজন অন্তরিক্ষস্থান, আরেকজন প্রধানত পৃথিবীস্থান। দুজনেই প্রাণ। প্রাণের ধর্ম হল 'প্রেতি' বা প্রজ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে-সঙ্গে 'এগিয়ে চলা'—যার বিবৃতি আমরা ঐতরেয়ারণ্যকে পেয়েছি।[৩৪৫] প্রাণধর্মা অগ্নিকে তাই সংহিতায় বলা হয়েছে 'প্রেতীষণিম্ ইষয়ন্তম্'—প্রেতির সংবেগকে উদ্দীপ্ত করে আমাদের যিনি এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।[৩৪৬] এমনি করে প্রথম প্রাণ আমাদের মধ্যে সুদূরের অন্বেষণায় নিরন্তর **প্রৈতি**—সামনের দিকে ছুটে চলেছেন নচিকেতা-চিত্তে অভীপ্সার আগুন জ্বালিয়ে। কিন্তু **কেন যুক্তঃ**—রথে অশ্বের মত কে তাঁকে যুক্ত করল আমাদের জীবনায়নের সঙ্গে?

মন আর প্রাণের তাগিদে পথ চলা 'বিদ্মনে কম্'—কবিদের কাছে জানবার জন্য।[৩৪৭] পথ চলতে চলতে কত কথাই শুনি—কত অনুশাসন, কত ব্রহ্মঘোষ। কিন্তু এই-যে বাক্ তাঁরা বলেন—**ইমাং ব্রাচং ব্রদন্তি**, এ তো সহজ বাক্ নয়। এ যে **ইষিতা** বাক্—যা যজ্ঞের পথ বেয়ে প্রবিষ্ট হয়েছে ঋষির হৃদয়ে[৩৪৮] এবং সেইখান থেকে স্ফুরিত হয়েছে ব্রহ্মঘোষে। এ-বাক্ উচ্চারিত হয় মানুষের ইচ্ছায় নয়—দেবতার প্রেষণায়। কিন্তু সে-দেবতা কে, কি তাঁর স্বরূপ?

আবা ব্রহ্মঘোষে ব্রহ্মের সঙ্গে অবিনাভূতা যে-বাক্, তাঁকে দেখতে বা শুনতে তো সবাই পায় না। সে-গুহাহিতাকে কেউ দেখেও দেখে না, কেউ আবার শুনেও শোনে না।[৩৪৯] **চক্ষুঃশ্রোত্রকে** অলখের **দেবতা** যদি তাঁর সঙ্গে **যুক্ত** করে দেন, তবেই তার সন্ধান মেলে। কিন্তু সে-দেবতাকে কোথায় পাব?

বাক্‌কে দেখলে আর শুনলেই ব্রহ্মকে জানা যায়। এই বাক্‌কে জৈমিনীয়োপনিষদের গায়ত্রী বা সাবিত্রী। আর কেনোপনিষদে তিনিই হৈমবতী উমা যাঁকে পেয়ে ইন্দ্র ব্রহ্মের রহস্য জানতে পারলেন। একথা আগেই বলা হয়েছে।

আশ্চর্য অন্তেবাসীর প্রশ্নের উত্তরে কুশল আচার্য বললেন:[৩৫০]

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো য়দ্
বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।
চক্ষুষশ্ চক্ষুর্—অতিমুচ্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্ লোকাদ্ অমৃতা ভবন্তি ॥ ২

—শ্রোত্রের, শ্রোত্র, মনের মন যিনি, (তাঁকে) বাকের বাক্ (বলেন ধীরেরা)। তিনিই প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু। ধীরেরা অভিমুক্ত হয়ে এই লোক ছাপিয়ে গিয়ে অমৃত হন।

এককথায় আচার্য অন্তেবাসীর পরাক্ দৃষ্টির মোড় ঘুরিয়ে তাকে রূপান্তরিত করলেন প্রত্যক্ দৃষ্টিতে। তার জিজ্ঞাসিত দেবতার স্বরূপ আভাসিত করলেন ব্রহ্মপুরুষদের ধরেই তটস্থ লক্ষণের দ্বারা। তটস্থ লক্ষণ বস্তুকে সোজাসুজি চিনিয়ে দেয় না, তার কাছাকাছি একটা-কিছুকে ধ'রে স্বরূপের দিকে ইশারা করে। যদি বলা হয়, ব্রহ্ম 'সৎ চিৎ আনন্দ', তাহলে ব্রহ্মের তা স্বরূপলক্ষণ—অনুভব সেখানে অপরোক্ষ। আর যদি বলা হয়, ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ, তাহলে তা তটস্থ লক্ষণ। জগৎকে ধরে ব্রহ্মের দিকে সেখানে মাত্র ইশারা করা হল। ব্রহ্মের অনুভব সেক্ষেত্রে পরোক্ষ।

বেদের অধিদৈবতদৃষ্টি একটা চিন্ময় প্রত্যক্ষ—যা সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে সর্বত্র দেবতাকে প্রত্যক্ষ করে। সে হল সিদ্ধের সহজ দৃষ্টি। কিন্তু সাধকের পক্ষে তা সহজ নয়। এই দৃষ্টি পাওয়ার জন্যই ইন্দ্রিয়দের মধ্য থেকে ব্রহ্মপুরুষদের বেছে নেওয়া হয়েছে—ছান্দোগ্যে যাদের বলা হয়েছে 'স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপাঃ'।[৩৫১] উপাসকের চিত্তে এরা ব্রহ্মের একটা আভাস এনে দেয় চকিত বিদ্যুদ্দীপনে। তাই ব্রহ্মকে এরা লক্ষিত করে তটস্থভাবে—সাক্ষাৎভাবে নয়। সাক্ষাৎকারের জন্য যা অপেক্ষিত, তা হল অন্তরাবৃত্তি—বহির্মুখ চেতনার মোড় ফিরিয়ে দেওয়া অন্তরের দিকে।

কি করে তা করতে হয়, কৌষীতকিতে তার বিবৃতি পাই। বলা হচ্ছে, 'বাকের বিজ্ঞান খুঁজো না, জেনো বক্তাকে।...মনের বিজ্ঞান খুঁজোনা, জেনো মন্তাকে।'[৩৫২] অর্থাৎ বাইরের চেতনার সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে আত্মচৈতন্যকে। শুধু দেখা নয়, 'আমি দেখছি'—এই হুঁশে থেকে দেখা। এই হল ব্রাহ্মণ আরণ্যক আর উপনিষদে বহুপ্রপঞ্চিত অধ্যাত্মদৃষ্টির সূচনা। এমনি করে দৃষ্টি যার গভীরে তলিয়ে যায়, সংহিতায় তাকে বলা হয় 'নি-চির'।[৩৫৩] এই অন্তর্দৃষ্টিতে যেমন জানা যায় নিজের স্বরূপকে, তেমনি দেবতারও স্বরূপকে, যিনি 'ইমা

জজানা ন্যদ্ য়ুষ্মাকম্ অন্তর্ বভূব'—এই সব-কিছুকে জন্ম দিয়েছেন, আর-কিছু হয়ে রয়েছেন তোমাদের অন্তরে।[৩৫৪]

গুহাহিত তত্ত্বের আন্তরপ্রত্যক্ষের সাধন হল মন মনীষা এবং হৃদয় দিয়ে 'ধী' বা ধ্যানচেতনার পরিমার্জন।[৩৫৫] যিনি তা করেন, তিনি 'ধী-র', তাঁর উল্লেখ এই মন্ত্রেই আছে। তিনটি সাধন ক্রমসূক্ষ্ম। মন বাহির এবং অন্তরের মধ্যে সেতু—বাইরের ইন্দ্রিয়সংবিৎকে সে টেনে আনে 'মনীষা' বা 'ধী'র কূলে আর ধ্যান প্রবর্তিত হয় তারই সহায়ে; সংহিতায় ঋষিরা তাই 'সত্যেন মনসা দীধ্যানাঃ'।[৩৫৬] ধ্যান গভীর হলে ফোটে প্রজ্ঞাচক্ষু—এই উপনিষদে যাকে বলা হয়েছে 'প্রতিবোধ'। তখন উপাসকেরা 'চক্ষসা দীধ্যানাঃ'—ধ্যান করেন চোখ দিয়ে।[৩৫৭] এই ধ্যান অবশেষে চিত্তিকে তলিয়ে দেয় হৃদয়ে। সেইখানে আয়ুর মর্মমূলে আছে এক গভীর সমুদ্র—যার মধ্যে প্রাণের ধারারা এসে সঙ্গত হয় আর সোম্য মধু ঢেউ খেলে যায়।[৩৫৮] এই হৃদয়ে পাওরাই মনীষী কবির পরম পাওরা—যেখানে সৎএর বাঁধন উধাও হয়ে গেছে অসৎএর অনির্বচনীয়তায়।[৩৫৯]

ব্রহ্মপুরুষদের অন্তরাবৃত্তিতে এমনি করে ব্রহ্মকে এক অনির্বচনীয় 'যক্ষ'-রূপে পাওরাই হল কেনোপনিষদের 'আদেশ'। এই অন্তরাবৃত্তিকে সংহিতায় বলা হয়েছে 'নিবর্তন'—স্মৃতিতে যা 'নিবৃত্তি', যোগে ইন্দ্রিয়ের 'প্রত্যাহার'। ঋষি মথিত যামায়নের একটি সূক্তে সন্ধাভাষায় এই নিবর্তনের একটি বর্ণনা আছে—হারানো গোদের ঘরে ফিরিয়ে আনবার উপমাচ্ছলে।[৩৬০] হারানো পশুকে ফিরিয়ে আনেন পূষা—অধ্যাত্মদৃষ্টিতে যাঁর স্থান ভ্রূমধ্যে। যোগে এটি মনের স্থান এবং সংহিতায় ইন্দ্র 'প্রথমো মনস্বান্' বা বিশেষ করে মনের দেবতা।[৩৬১] ইন্দ্র-পূষা যুগ্মদেবতা[৩৬২]—দুয়েরই একটা কাজ 'নিবর্তন' বা চেতনার পরিকীর্ণ রশ্মিদের (='গাবঃ') গোষ্ঠে গুটিয়ে আনা। তার ফলে অগ্নি-সোমের প্রসাদে প্রাণের বহির্মুখ সংবেগ ('রয়ি') 'নিধৃত' হয় একটি বিন্দুতে[৩৬৩] আর সেখান থেকে শুরু হয় দেবযানের পথে লোকোত্তরের অভিযান।

ব্রহ্মপুরুষদের বেলায় নিবর্তনের কী রীতি হবে, আচার্য প্রথমেই সূত্রাকারে তার ইঙ্গিত দিচ্ছেন মন্ত্রটিতে। সঙ্গে-সঙ্গে ফলশ্রুতিরও উল্লেখ আছে। এই খণ্ডের পরের মন্ত্রগুলি সূত্রের ভাষ্যস্থানীয়।

শান্তিপাঠে আমরা ব্রহ্মপুরুষদের আপ্যায়নের কথা পেয়েছি। আপ্যায়ন নিঃসন্দেহে ব্রহ্মোপলব্ধির সাধন। কিন্তু নিবর্তন ছাড়া আপ্যায়ন সার্থক এবং সুস্থিত হয় না। দেবতার চকিত আবেশে উদ্দীপ্ত ইন্দ্রিয়ে তাঁর আনন্দরূপ বিদ্যুতের মত বিভাত হতে পারে। কিন্তু এই পরাক্-বৃত্ত (objective) উদ্ভাসের ঘনতা এবং স্থায়িত্ব নির্ভর করে চেতনার প্রত্যক্-বৃত্তির (subjecti-

vity) নিবিড়তার উপর। আত্মচেতনা যত গভীর হবে, বিষয়ের বোধও ততই সুব্যক্ত উদার এবং সত্য হবে। আর আত্মচেতনা গভীর হতে পারে আবেশে—যেন বাইরে থেকে কেউ ভিতরে এসে ধাক্কা দিয়ে তোমায় জাগিয়ে দিল।

আগেই বলেছি, অধিদৈবত দৃষ্টি এমনিতর আবেশের ফল। তা অধ্যাত্মদৃষ্টিকেও উদ্দীপ্ত করে। তখন যে দেখে এবং যা দেখে, দুয়েরই প্রত্যয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—যিনি দেখান তাঁর সন্ধানী আলোয়। মনে হয়, তুমি 'পাক'—এখনও সব তুমি জান না ; আর তিনি 'ধীর'—তিনি সব জানেন। সেই ধীর তোমাতে আবিষ্ট হয়ে তোমাকেও করে তুলছেন **ধীর**। তোমার দেখা তোমার শোনা তখন তোমার ভিতর দিয়ে তাঁরই দেখা, তাঁরই শোনা।

আচার্য বলে চললেন : তোমার আত্মচৈতন্যে ব্রহ্মচৈতন্যেরই স্ফুরণ, তোমার ধী-র মূলে তাঁরই ধী-র প্রচোদনা—সবিতারূপে, পূষারূপে।[৩৬৪] তোমার মধ্যকার ব্রহ্মপুরুষেরা ধী-র বিভূতি। তোমার শ্রোত্র তাঁরই শ্রোত্র—তিনি তোমার **শ্রোত্রের শ্রোত্র**, যিনি 'আশ্রুৎকর্ণ', সর্বদিকে যাঁর কান,[৩৬৫] যিনি গুহাহিত বাকের শ্রবণে নিযুক্ত করেন তোমার শ্রোত্রকে। তেমনি তোমার 'দূরআধী' মনের মূলে তাঁরই প্রেষণা—তিনি তোমার **মনের মন**, তিনি 'বিশ্বমনাঃ'।[৩৬৬] এই যে আবহমান কাল পূর্বাচার্যেরা সম্প্রদায়ক্রমে তত্ত্বব্যাখ্যান করে চলেছেন, তাঁরা তাঁর বাক্‌কেই স্ফুরিত করছেন তাঁদের বাকে—তিনিই সবার **বাকের বাক্**।[৩৬৭] তোমার প্রাণের প্রেতিতে অগ্নির যে-প্রেষণা দ্যুলোক-ছোঁয়া আয়ুর স্কম্ভ হয়ে আছে, সে তিনিই। তিনিই সূর্যরূপে তোমার 'জীর' অসুঃ, তোমার আয়ুর প্রতরণ।[৩৬৮] তাই তিনিই তোমার **প্রাণের প্রাণ**। আবার তোমার চক্ষু তাঁরই চক্ষু, তিনি তোমার **চক্ষুর চক্ষু**—দিনের বেলায় আদিত্যরূপে দ্যুলোকে আতত একটি চক্ষুর প্রজ্ঞাদীপ্তিতে, রাতের বেলায় সোমরূপে একটি অক্ষির উপচীয়মান আনন্দজ্যোৎস্নায়।[৩৬৯]

শুধু তোমার নয়—তিনি সবার বাকের বাক্, প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন। তাইতে তিনি 'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ'—বিশ্বরূপ সেই পরমপুরুষ, সবার শীর্ষে যাঁর শীর্ষ, সবার অক্ষি যাঁর অক্ষি, সবার পদ যাঁর পদ। তিনিই এই সব-কিছু—যা হয়েছে এবং যা হবে।[৩৭০]

তোমার এই চক্ষু সেই বিশ্বতশ্চক্ষুর একটি চক্ষু মাত্র। তার যে-দৃষ্টি, তা তাঁর সহস্রধা দৃষ্টির একটি দৃষ্টি—অতএব তা সীমিত। এই সীমার সঙ্কোচ হতে মুক্তি চাই। তা আসবে আবৃত্তচক্ষুর প্রত্যক্ দৃষ্টিকে অন্তরের গভীরে তলিয়ে দিয়ে। বাইরের সূর্য সে-অতলে অস্ত যাবে, 'বারুণী রাত্রির' অন্ধকারে আকাশ থাকবে ছেয়ে। সেই আকাশে অস্তমিত আদিত্যজ্যোতি জ্বলবে চিদগ্নির

ঊর্ধ্বশিখা হয়ে—'বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদি অন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ' হয়ে।[৩৭১] বিশ্বভুবন তখন সুষুপ্ত, আর এই অগ্নি তার মূর্ধায়। তারপর নক্তার অবসানে জাগবে ঊষা, তার বুকে প্রাতঃসূর্য জন্ম নেবেন দেবতাদের বিচিত্র 'অনীক' হয়ে—যিনি 'চক্ষুর্ মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ', 'আত্মা জগতস্ তস্থুষশ্ চ'।[৩৭২] এই সূর্য 'নৈব উদেতা ন অস্তম্ এতা—একল এব মধ্যে স্থাতা'।[৩৭৩] তাঁর চোখের আলোয় তখন ঝলমল তোমার চোখ—তুমি ঋভুদের মতই 'সূরচক্ষাঃ'[৩৭৪], পায়ের তলায় দেখছ অহোরাত্রের আবর্তনে আলো আর কালোর মিছিল।[৩৭৫] এই 'সংদৃষ্টি' বা পরিপূর্ণ দৃষ্টি হল **ধীরের অতিমুক্তি,** যা মুক্তির সহজ পরিণাম।[৩৭৬] **প্রেত্য অস্মাৎ লোকাৎ** অর্থাৎ চেতনার প্রাকৃত ভূমিকে ছাপিয়ে গিয়ে মৃত্যুতরণ মুক্তি, আর তারও পরে জীবন-মরণ দুয়ের মহেশ্বর হওয়ায় অতিমুক্তি বা **অমৃতের** সম্ভোগ।[৩৭৭]

এমনি করে অধিদৈবত দৃষ্টিতে যে-দেবতা বিশ্বের এবং অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তোমার **অন্তর্যামী,** তিনিই তোমার ব্রহ্মপুরুষদের প্রেষক এবং প্রয়োজক।

কিন্তু প্রাকৃত পরাক্ দৃষ্টিতে তাঁকে জানা বা পাওয়া যায় না। কেননা

ন তত্র চক্ষুর্ গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ।
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈ-তদ্ অনুশিষ্যাৎ ॥ ৩

—না সেখানে চক্ষু যায়, না বাক্ যায়, না মন। (তাই তাঁর) সংবিৎ আমাদের নাই। সে-বিজ্ঞানও আমাদের নাই, যেভাবে এর অনুশাসন (কেউ) করতে পারে।

ব্রহ্মপুরুষেরা **'স্বর্গের দ্বারপাল'** মাত্র। তারা ব্রহ্মপুরের[৩৭৮] দুয়ার পর্যন্তই উপাসককে পৌঁছে দিতে পারে, তার ভিতরে ঢোকবার সামর্থ্য তাদের নাই। আলোর পিপাসা আমাদের অন্তরে। দেবতাকে ডেকে বলি, অপাবৃত কর অন্ধকার, চোখ ভরে দাও তোমার আলোয়, মুক্ত কর বন্ধন হতে।[৩৭৯] কিন্তু তাঁর 'অজস্র জ্যোতির ঢল যখন নেমে আসে, **চক্ষু** তা সহ্য করতে পারে না। তার পরাভূত দৃষ্টিকে ছাপিয়ে উদ্ভাসিত হয় এক 'গহন গভীর কুয়াসা'—যার মধ্যে রাত্রি বা দিনের কোনও নিশানা নাই।[৩৮০] চোখ কি দেখবে সেখানে? পরব্যোমের দিক্‌চিহ্নহীন যে-মহাশূন্যতায় গৌরীর হিঙ্কারও স্তব্ধ, এ-শ্রোত্র সেখানে পৌঁছবে কি করে?[৩৮১] চক্ষুঃ-শ্রোত্রের ব্যাপার যেখানে নাই, **মনও** সেখানে নিস্পন্দ নিশ্চিহ্ন। তখন হ'ক না আমার মন সুদূরের ভাবনায় চঞ্চল, আমি 'কিম্ উ নু মনিষ্যে'—আমি কিই-বা ভাবব? চক্ষু শ্রোত্র আর মনের যা অগোচর, **বাক্** তার কথা বলবেই-বা কি করে—তাই 'কিং স্বিদ্ বক্ষ্যামি'—আমি কিই-বা বলব?[৩৮২]

ব. বি./উপনিষৎ পু.৬২-৪

পরাহত চারটি ব্রহ্মপুরুষের উপর নেমে এল অপ্রকেত নিষুপ্তির নিথরতা। কিন্তু তারই মধ্যে জেগে রইল 'প্রাণ'।[৩৮৩] প্রাণের আছে **সংবিৎ,** যেমন মনের আছে **বিজ্ঞান।** সংবিৎ প্রাতিভ বোধ বা বোধি[৩৮৪]—উষার আলোর মত একটা সামগ্রিক সহজ প্রত্যয়। তার বৃত্তি সংশ্লেষক (synthetic)। আর বিজ্ঞান মনের উজানে হলেও তার বৃত্তি বিশ্লেষক (analytic)। তার আরেক নাম 'বিচিতি' বা বিবেকজ জ্ঞান।[৩৮৫]

লোকোত্তরের সংবিৎ অনির্বচনীয়। তা হল হৃদয়ের 'প্রত্যেষণা' বা আঁতিপাঁতি করে খোঁজার ফলে বস্তুকে জানা এবং পাওয়া।[৩৮৬] জানা সেখানে রহস্যময়, অথচ পাওয়া সুনিবিড়। এই বোধকে বচনীয় করতে পারে বিজ্ঞান —যদিও তার প্রবচনে অভিধার চাইতে ব্যঞ্জনার প্রাধান্য বেশী।

আমরা যখন লোকোত্তরের কূলে এসে দাঁড়াই, তখন **ন বিদ্মঃ**—বলতে পারি না যে তাকে অনিঃশেষে জেনেছি বা পেয়েছি। অথচ কিছুই যে পাইনি, তাও তো বলতে পারি না। এ যেন এই সবকিছুর অধ্যক্ষ হয়ে আছেন যিনি পরমব্যোমে, তিনি যেমন তাঁর আত্মবিসৃষ্টির উৎসকে 'বেদ, ন বেদ বা'—জানেন অথবা জানেন না[৩৮৭] বলে 'নবেদাঃ', আমরাও তা-ই। আর বিদ্যার এই অবিদ্যা-কল্পতার জন্যই[৩৮৮] আমরা **ন বিজানীমঃ**—খুঁটিয়ে কিছুই জানি না কি করে অপরের কাছে এর **অনুশাসন** সম্ভব। এ শুধু আজ আমাদের কথাই নয়—

অন্যদ্ এব তদ্ বিদিতাদ্ অথো অবিদিতাদ্ অধি।
ইতি শুশ্রুম পূর্বেষাং য়ে নস্ তদ্ ব্যাচচক্ষিরে ॥ ৪

—আর-কিছু তো বটেই সেই তৎস্বরূপ (যা-কিছু) বিদিত তাহতে; আবার (যা-কিছু) অবিদিত, তাকে ছাপিয়েও (তিনি)। এই তো শুনেছি পূর্ব(সূরি)দের মুখে যাঁরা আমাদের কাছে তৎস্বরূপকে ব্যাখ্যা করেছেন।[৩৮৯]

ব্রহ্ম **তৎ-স্বরূপ**—সংহিতার 'তদ্ একম্'।[৩৯০] 'সঃ' এবং 'সা' তাঁর যুগ্ম-বিভাব, তিনি দুয়ের অতিষ্ঠা। তিনিই যেমন সব-কিছু হয়েছেন, তেমনি আবার সব-কিছু ছাপিয়েও আছেন।[৩৯১] সবকিছুর 'আবৃতিতে' বা আবেশে তিনি 'সৎ'—আমাদের সংবিৎএর গোচর, অতএব **বিদিত।** কিন্তু সংবিৎ তো তাঁকে বেড়ে পায় না, তিনি যে তাকেও ছাপিয়ে। অতএব তিনি আমাদের বিদিত রূপকেও ছাপিয়ে **অন্যৎ**—আর কিছু। কি, তা আমরা বিশেষ করে জানি না। অতএব তিনি **অবিদিত**—আমাদের সংবিৎএর বাইরে। তখন তিনি 'অসৎ'। কিন্তু এই অসৎএরও বোধ হয়—বিজ্ঞানে নয় প্রজ্ঞানে বা

সংজ্ঞানে যা জ্যেষ্ঠ সুনীথ ও সর্বাত্মক জ্ঞান।[392] অথচ তা ব্যাকৃত (well-defined) নয়—বিদ্যুতের মত ঝলকে-ঝলকে অনন্তের দিক্‌চক্রবালকে উদ্‌ভাসিত করে তোলে মাত্র। অতএব ব্রহ্ম সৎও নন অসৎও নন,[393] তাঁর স্বরূপ আমাদের নিঃশেষে বিদিত নয়, আবার একেবারে অবিদিতও নয়। বরং বিদ্যাকে ছাপিয়ে যে-অবিদ্যা তা-ই তাঁর অফুরন্ত রহস্যের নির্ঝর—'যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ'।[394] তাই তিনি অনির্বচনীয় 'তৎ'।

এইজন্যই বলেছিলাম, আমরা 'নবেদাঃ'—তাঁকে জানতে গিয়ে পেতে গিয়ে আমরাই ফুরিয়ে যাই, কিন্তু তিনি ফুরান না। তাই কি করে যে তাঁর কথা অপরের কাছে বলব, তার বিজ্ঞান আমাদের নাই।

তবুও কিছুটা ইশারা করতে পারি।

ব্রহ্মপুরুষের মাধ্যমেই তোমার ব্রহ্মোপসনা। এতদিন তাঁকে জেনেছ পরাক্‌বৃত্তির দ্বারা তাদের বিস্ফারণে। বাক্‌ মন চক্ষু শ্রোত্র প্রাণ আপ্যায়িত হয়ে বৃহৎকে জেনেছে। কিন্তু সে-জানা 'একং সৎ'এর বিভূতিকে জানা—সৎএর মর্মবন্ধন যে-অসৎএ তাকে জানা নয়। তাকে না জানলে সৎএর বিজ্ঞান পূর্ণ হয় না। তাই এবার তোমাকে ধরতে হবে নিবর্তন বা অন্তরাবৃত্তির পথ। জানতে হবে ঃ

> যদ্‌ বাচা-নভ্যুদিতং যেন বাগ্‌ অভ্যুদ্যতে।
> তদ্‌ এব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নে-দং যদ্‌ ইদম্‌ উপাসতে॥ ৫

—যা বাক্‌ দ্বারা অভিব্যক্ত হয়নি, যা দিয়ে বাক্‌ অভিব্যক্ত হয়, তাকেই ব্রহ্ম বলে তুমি বিদিত হও—একে নয়, এই যাকে ওরা উপাসনা করে।

আগেই বলেছি, বেদ স্ফুরিত হয়েছে বাক্‌এ। বাঙ্‌ময় তিনটি বেদের সার হল ভূঃ ভুবঃ স্বঃ। এ তিনটি ব্যাহৃতি বাকেরই বিভূতি। এরা দানা বাঁধল পৃথিবী অন্তরিক্ষ আর দ্যুলোকে। তাদের মধ্যে আবির্ভূত হলেন অগ্নি বায়ু আর আদিত্য। কিন্তু এইসব ছাপিয়ে আছে বাক্‌। সে-বাক্‌ ওম্‌। ওম্‌ ব্রহ্ম।[395] কিন্তু বাক্‌ বা ওম্‌ বাচক, আর ব্রহ্ম বাচ্য। বাক্‌ সাধন, ব্রহ্ম সাধ্য। সাধন আর সাধ্য স্বরূপে অভেদ হলেও উপাসনার বেলায় দুয়ে ভেদ আছে। সাধন বা আলম্বন ক্রমসূক্ষ্ম হয়ে সাধ্যকে পাইয়ে দেয়। ব্রহ্মের 'অভিমুখে' যে-বাক্‌ বা ওম্‌ 'মনুষ্যা বদন্তি',[396] তা বস্তুত ব্রহ্মকে ব্যক্ত করতে পারে না। তার গুহাহিত তিনটি পদ ক্রমিক সূক্ষ্মতায় ব্রহ্মের কাছাকাছি যায়,

কিন্তু তবু তার দ্বারা ব্রহ্ম স্বরূপত **অভ্যুদিত** বা অভিব্যক্ত হন না। কেবল শেষপদে বাক্ যেখানে পরমব্যোমে সহস্রাক্ষরা,[৩৯৭] সেইখানে ভেদাভেদে 'য়াবদ্ ব্রহ্ম বিষ্ঠিতং তাবতী বাক্'[৩৯৮]—বক্ষ্যমাণ 'যক্ষ আর হৈমবতী'র মত। ব্রহ্মের স্বরূপশক্তি বলে সংহিতায় এই বাকের সংজ্ঞা 'ব্রহ্মী'।[৩৯৯] মধ্যমা এবং সৌরী বাক্এর উজানে ইনি সোম্যা বা আনন্দময়ী। সৌরী বাক্ 'সূর্যদুহিতা সসর্পরী'[৪০০] প্রজ্ঞানময়ী—বিদ্যুতের মত সর্পিল বিভায় তাঁর উন্মেষ-নিমেষ। আর মধ্যমা বাক্ অন্তরিক্ষচারিণী কারণসলিলগোহিনী 'গৌরী' প্রাণময়ী। একই ব্রহ্মীর এই ত্রিধামূর্তি। এঁরা অথবা ইনি ধেনুস্বরূপিণী, আর যাঁর বাক্ সেই 'হরি' বা হিরণ্ময় আনন্দঘন পুরুষ বৃষভ। বৃষভ আর ধেনুতে একটি মিথুন।[৪০১] বৃষভের অভ্যুদিত যে-বাক্, তা-ই আবার ধেনুর কাছ থেকে বৃষভের কাছে ফিরে আসে প্রতিধ্বনি হয়ে।[৪০২] এই হল বাকের রহস্য।

অতএব তোমার অভ্যুদিত বাকে ব্রহ্ম অভিব্যক্ত হন না, তোমার উদ্দেশে ব্রহ্মের যে-অভিবদন, তা-ই তোমার মধ্যে স্ফুরিত হয় বাক্‌রূপে। তার আহ্বানে তুমি সাড়া দাও, তিনি তোমাকে বরণ করে নেন বলে তুমি তাঁকে পাও। এইভাবে তোমার বাক্‌কে যদি তাঁর 'ইষিত' বলে অনুভব কর, তবেই তাঁর **সংবিৎ** তোমার পক্ষে সম্ভব।

এমনি করে প্রত্যেকটি ব্রহ্মপুরুষের মূলে যে-দেবতার প্রেরণা তিনিই **ব্রহ্ম**। এটি বুঝতে পারবে আবৃত্তচক্ষু 'ধীর' হয়ে—নিবর্তনের দ্বারা। নইলে অধি-দৈবতদৃষ্টিতে সামান্যত **ইদম্‌এর যে-উপাসনা,** তাতে ইদম্‌কেই বড় করে পাওয়া যায়—ব্রহ্মকে নয়।

বাক্ হতে আরও গভীরে গেলে—মনে। তোমার মন্ত্রের 'বচন'[৪০৩] উত্তীর্ণ হল মননে। ব্রহ্মকে পেতে চাইছ তুমি মন দিয়ে। কিন্তু

য়ন্ মনসা ন মনুতে য়েনা-হুর্ মনো মতম্।
তদ্ এব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নে-দং য়দ্ ইদম্ উপাসতে ॥ ৬

—যাকে মন দিয়ে কেউ মনন করে না, যাকে দিয়ে—ওঁরা বলেন—মনের মনন হয়, তাকেই ব্রহ্ম বলে তুমি বিদিত হও: একে নয়, এই যাকে ওরা উপাসনা করে।

সুন্দরের সন্ধানী তোমার **মন** উড়ে চলেছে অলখের পানে। শুক্লপক্ষের চাঁদের কলার মত তার মধ্যে আলোর উপচয় ঘটছে। সে হয়ে যাচ্ছে 'চিকিত্বিনু মনঃ'—পূর্বচিত্তির আভায় যেন ঊষার মত, হয়ে যাচ্ছে 'বোধিনু-মনঃ'—প্রতি-বোধের সৌরদীপ্তিতে ঝলমল।[৪০৪] কিন্তু শুক্লপক্ষের পর আসে কৃষ্ণপক্ষ—এক-এক করে চাঁদের কলা ক্ষীণ হয়ে যায়। এই শুক্ল-কৃষ্ণের আবর্তনের ঊর্ধ্বে

যদি 'ষোড়শী ধ্রুবা কলা'তেও[৪০৫] পেঁছে যাও, তোমার মন যদি হয় 'দেবগন্ধর্ব' চন্দ্রমা',[৪০৬]—নিত্য জ্যোৎস্নায় নাওয়া, তবুও জেনো সে-আলো তোমার আলো নয়, অলক্ষ্যে থেকে এক 'সুষুম্ণ সূর্যরশ্মি' তাকে আলোকিত করছে। তোমার মনোজ্যোতি যাঁর জ্যোতি, তোমার দীপ্ত মননের মূলে যাঁর প্রেষণা, তিনিই **ব্রহ্ম**। মনের প্রবর্তনে তুমি যা পাচ্ছ, তা তাঁর বিভূতিমাত্র। তার উপাসনা **ইদম্-এরই উপাসনা**—ব্রহ্মের নয়।

আরও গভীরে গেলে। তোমার মন হয়ে গেল 'দৈবং চক্ষুঃ।[৪০৭] সে-মনের প্রত্যক্ষ কেবল ভাবময় আন্তর প্রত্যক্ষ নয়, বিজ্ঞানের গাঢ়তায় তা এক দিব্য ইন্দ্রিয়সংবিৎ। দ্যুলোকের যে-আদিত্য তোমার দৃক্‌শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তাঁর আবেশে তুমি হয়ে গেছ 'সূরচক্ষাঃ'। কিন্তু এমনি করে অন্তর আর বাইরের ভেদ ঘুচে গিয়ে যে দিব্য দৃকশক্তির উদ্ভাস, তা দিয়ে তুমি যা দেখছ, সে তো ব্রহ্ম নয়। কেননা ব্রহ্ম তা-ই

য়চ্ চক্ষুষা ন পশ্যতি য়েন চক্ষূংষি পশ্যতি।
তদ্ এব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং য়দ্ ইদম্ উপাসতে॥ ৭

—যাকে চোখ দিয়ে (কেউ) দেখে না, যা দিয়ে চোখেরা দেখে,[৪০৮] তাকেই ব্রহ্ম বলে তুমি বিদিত হও—একে নয়, এই যাকে ওরা উপাসনা করে।

আদিত্যকে ব্রহ্মজ্যোতি জ্ঞানে উপাসনা করা জ্যোতিরগ্র আর্যদের চিরায়ত রীতি। কিন্তু আমরা এই চোখে যে-আদিত্যকে দেখি, তা-ই কি সেই 'স্বর্ বৃহৎ' বা 'বৃহজ্ জ্যোতিঃ' যার কথা ঋষিরা বলে গেছেন?[৪০৯] এ তো সেই পুরুষের পুরোভাগ মাত্র—যা তাঁর 'শুক্লং ভাঃ'। তার নেপথ্যে রয়েছে তাঁর সেই 'নীলং পরঃকৃষ্ণম্', যেখানে 'ন রাত্র্যা অহ্...প্রকেতঃ'—রাত্রি বা দিনের কোনও নিশানা নাই।[৪১০] অথচ সেই অনালোকের আলোকেই এখানকার ছায়াতপের লীলায়ন। এই চর্মচক্ষু দিয়ে তো তাঁকে দেখা যায় না—এমন-কি দৈব চক্ষু দিয়েও নয়। তোমার চোখ দিয়ে তাঁকে দেখা নয়, তোমার নিজেকে দেখা তাঁর চোখ দিয়ে—যে-চোখ বারুণী রাত্রির চোখ, যার উপর-নীচ-সব-ছাওয়া অমর্ত্য দৃষ্টির পরঃকৃষ্ণ জ্যোতিতে অচিত্তির তমিস্রা কেটে যায়।[৪১১]

চল আরও গভীরে। আদিত্যমণ্ডল পার হয়ে গাহন কর আকাশের নীলে। সেখানে রূপ নাই, অতএব চোখ কিছু দেখে না। কিন্তু তবুও অদৃশ্য কিছু সেখানে আছে। চোখ দিয়ে দেখি আলোর সহায়ে—কিন্তু এই তো অনুভবের চরম নয়। দিনের শেষে আদিত্যের আলো চলে যায়—ওঠে চাঁদ। অমানিশায় চাঁদ থাকে না—থাকতে পারে আগুনের আলো। তাও যখন থাকে

না—তখন থাকে বাক্, যা অস্তিত্বের প্রজ্ঞাপক।[৪১২] তেমনি সব আলো নিবে গেলেও মহাকাশের পরঃকৃষ্ণ নীলিমায় নিকষে সোনার রেখার মত জেগে থাকেন 'প্রথমা চিকিতুষী' সেই ব্রাহ্মী বাক্—যিনি অবরোহক্রমে তোমার দ্যুলোকে পূর্বচিত্তির[৪১৩] পশ্যন্তী বিদ্যুৎ, তোমার অন্তরিক্ষে আত্মবিসৃষ্টির প্রাণস্পন্দ। দিব্যশ্রুতি দিয়ে সেই উশতীকে শুনছ।[৪১৪] কিন্তু এই ভূরিশ্রবস্ত্বই[৪১৫] ব্রহ্মের সংবিৎ নয়।

য়চ্ শ্রোত্রেণ ন শৃণোতি য়েন শ্রোত্রম্ ইদং শ্রুতম্।
তদ্ এর ব্রহ্ম ত্বং রিদ্ধি নে.দং য়দ্ ইদম্ উপাসতে ॥ ৮

—যাকে শ্রোত্র দিয়ে (কেউ) শোনে না, যাকে দিয়ে এই শ্রোত্রের শ্রবণ চলে, তাকেই ব্রহ্ম বলে তুমি বিদিত হও—একে নয়, এই যাকে ওরা উপাসনা করে।

ব্রহ্মপুরুষ চক্ষুর সম্পর্কে যেকথা বলেছিলাম শ্রোত্র সম্পর্কেও সেই একই কথা ঃ তোমার শ্রোত্র দিয়ে তাঁকে শোনা নয়—তোমার নিজেকে শোনা তাঁর শ্রোত্র দিয়ে, যে-শ্রোত্র 'আশ্রুৎ' অর্থাৎ সর্বত শ্রুতিমৎ হয়ে সব ছেয়ে আছে, সর্বভূতের হৃদয়ে-হৃদয়ে অনুরণিত ওঙ্কারে শুনছে নিজেরই আত্মঘোষণার অনুকৃতি ঃ 'হাঁ, আমি' 'হাঁ, আমিই'।

এমনি করে তাঁর অভিমুখে প্রচোদিত হয়েছিল তোমার যত ইন্দ্রিয়ব্যাপার, তারা তলিয়ে গেল তাঁর 'নিঃশ্বসিতে'র[৪১৬] মধ্যে। তোমার বাক্ মন চক্ষু শ্রোত্র কিছুই রইল না। নির্বিষয় চেতনায় নেমে এল সুপ্তির অন্ধকার। কিন্তু তবুও তুমি সে-আঁধারে জেগে রইলে প্রাণাগ্নির শিখা হয়ে।[৪১৭] কিন্তু সুষুপ্ত চেতনায় নির্বিশেষে সে-প্রাণ কি তুমি, না তিনি? যেখানে মৃত্যু নাই অমৃত নাই, দিন বা রাত্রির নিশানা নাই, তমিস্রায় নিগূঢ় সেই তমিস্রার অপ্রকেততা তো তাঁরই সুষুপ্তি। সেই সুষুপ্তিতে 'আনীদ্ অবাতং স্বধয়া তদ্ একম্'—বাতাস ছিল না সেখানে, তবুও যেন আত্মস্থিতির মহিমায় সেই অনির্বচনীয় এক তার মধ্যে নিঃশ্বাস ফেললেন।[৪১৮] সুপ্তির এই নির্বিষয় নির্বিশেষ শূন্যতায় জীব আর ব্রহ্ম প্রাণে-প্রাণে একাকার।[৪১৯] এই প্রাণই ব্রহ্ম। কিন্তু ভূতে-ভূতে প্রেতিযুক্ত যে-প্রাণ, তাকে যেন ব্রহ্ম বলে ভুল করো না ঃ

য়ৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি য়েন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদ্ এর ব্রহ্ম ত্বং রিদ্ধি নে.দং য়দ্ ইদম্ উপাসতে ॥ ৯

—যা প্রাণের সহায়ে প্রাণন করে না, যাকে দিয়ে (মর্ত্য) প্রাণ হয় প্রণীত, তাকেই ব্রহ্ম বলে তুমি বিদিত হও—একে নয়, এই যাকে (ওরা) উপাসরা করে।

তিনিই প্রাণ। কিন্তু তাঁর প্রাণন মর্ত্য প্রাণীর মত নিশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলে বেঁচে থাকা নয়। বস্তুত তাঁর প্রাণন হল **প্রণয়ন** কি-না এগিয়ে নিয়ে চলা।

দ্যুলোকে থেকে সর্বভূতের 'প্রণেতা' তিনি—আদিত্যরূপে দিনের আলোয়, বরুণরূপে রাতের জ্যোৎস্নায় বা আঁধারে ; অন্তরিক্ষে প্রজ্ঞা ও প্রাণের সমাহারে ইন্দ্ররূপে, মরুদ্‌গণরূপে ; পৃথিবীতে প্রেতীষণি অগ্নিরূপে[৪২০] প্রণয়ন করেন বলেই তিনি প্রাণ—সর্বভূতের মর্ত্য প্রাণকে এগিয়ে নিয়ে চলেন অমৃত-জ্যোতির দিকে। তিনি মহাপ্রাণ—তোমার প্রাণের প্রাণ ; কিন্তু তোমার প্রাণোপাসনাকে অগ্নি বায়ু বা ইন্দ্ররূপী তাঁর প্রাণবিভূতিতে সঙ্কুচিত রেখো না—তাকে প্রসারিত কর তাঁর প্রাণে—সেই 'মহৎ ভূতে'র নিবাত নিঃশ্বসিতের দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং প্রণীত হয়ে বাঁচ। মহাপ্রাণের মধ্যে অল্পপ্রাণের প্রলয়ে অমৃত হয়ে বাঁচা—এই তাঁর প্রাণের প্রসাদ, তাঁর প্রকৃষ্ট সংবিৎ।

উপনিষদের প্রথম খণ্ড এবং সেইসঙ্গে আচার্যের অনুশাসনের প্রথম পর্ব এইখানে শেষ হল। এতে এই তত্ত্বগুলি পেলাম :

বিবিদিষু বিদগ্ধ অন্তেবাসীর চিত্তে প্রশ্ন জেগেছে, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা ব্রহ্ম-পুরুষদের আপ্যায়নে যে-দেবতার আভাস পাচ্ছি, তিনি কে, কি তাঁর স্বরূপ ? তাঁরই প্রেষণায় আর প্রযোজনায় আমার এই প্রবর্তন, তা বুঝতে পারছি। কিন্তু তাঁর পরিপূর্ণ সংবিৎ পাব কি করে ?

বিদ্বান আচার্যের উত্তর হল, মুখ ফুটে তাঁর কথা বলা যায় না। তাই তোমাকে কি বলব তা বুঝতে পারছি না। তিনি জানা না-জানা পাওয়া না-পাওয়ার বাইরে। শুধু এইটুকু বলা চলে, অধিদৈবত দৃষ্টির পরাক্‌ বৃত্তি দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায় না। পেতে হলে ধীর হতে হয়, আবৃত্তচক্ষু হতে হয় —ধরতে হয় নিবর্তনের পথ। তখন বোঝা যায়, ব্রহ্মপুরুষদের আলোক তাঁরই আলোক, তাঁরই প্রভাসে এরা উদ্‌ভাসিত। কিন্তু সে-পথ ধরতে গেলে বাক্‌ মন চক্ষু সব যে কোন্‌ অতলে তলিয়ে যায়। কি দিয়ে তাঁকে ধরবে ? তবে সব গেলেও প্রাণ থাকে। তখন প্রাণের প্রণেতারূপে প্রাণে-প্রাণে তাঁর অনুভব হয়। তাঁর সম্পর্কে এইটুকুই ইশারা করা চলে। উক্‌থ আর উদ্‌গীথ দিয়ে যে-উপাসনা শুরু করেছ তার পর্যবসান প্রাণে।

এই প্রাণ সুপ্তিতে বাক্‌ মন চক্ষু শ্রোত্র সবাইকে গ্রাস করে। এই প্রাণই 'দেব এক…ভুবনস্য গোপাঃ'। আবার এই প্রাণ বাকে প্রতিষ্ঠিত, বাক্‌ প্রাণে প্রতিষ্ঠিত।[৪২১] অন্যোন্যপ্রতিষ্ঠিত বলে তারা একটি মিথুন।

এই মিথুনকে পরে আমরা পাব যক্ষ ও উমারূপে। যক্ষ অনির্বচনীয়, প্রাণও সর্বগ্রাসী বলে অনির্বচনীয়। আবার উমা অদিতি, বাক্‌ও অদিতি।[৪২২]

আচার্যের অনুশাসনের ইঙ্গিত এইদিকে।

দ্বিতীয় খণ্ড

আচার্য আর অন্তেবাসীর সংবাদ চলছে। ব্রহ্ম যে 'বিদ্যা' আর 'অবিদ্যার' ওপারে, আচার্য এই তত্ত্বটি শিষ্যের হৃদয়ে দৃঢ়মূল করতে চাইছেন। আবার তাঁর সংবেদন কোন্ রহস্যময় রীতিতে সম্ভব, তারও ইশারা করছেন।

আচার্য বললেন ঃ

যদি মন্যসে সুবেদে.তি, দহরম্ এরা.পি নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপম্—যদ্ অস্য ত্বং যদ্ অস্য দেবেষু। অথ নু মীমাংস্যম্ এব তে মন্যে বিদিতম্ ॥ ১

—যদি মনে করে থাক '(ব্রহ্মকে) ভাল করেই বুঝেছি', তাহলেও নিশ্চয় তুমি অল্পই বুঝেছ ব্রহ্মের রূপ (অর্থাৎ) এঁর যে (-রূপ) তুমি, এঁর যে (-রূপ) দেবসমূহে। তাইতে এখনও মীমাংসার বিষয়ই বলে মনে করি তোমার সংবিৎকে।

ব্রহ্মের দুটি রূপ ঃ তিনি সৎ, তিনি অসৎ।[৪২৩] আবার তিনি এ-দুয়ের কোনটাই নন।[৪২৪] তিনি মর্ত, তিনি অমৃত।[৪২৫] আবার এ-দুইকে ছাপিয়ে তিনি সেই বিদ্যুৎ যা উন্মেষ-নিমেষের অতীত, মরমীয়ারা যাকে বলেছেন 'নেতি নেতি' করে পাওয়া 'সকৃদ্‌বিদ্যুৎ'। সে হল 'নেতি নেতি'র ওপারের এক অনির্বচনীয় ইতি যাকে বলা হয় 'সত্যের সত্য', 'প্রাণের সত্য'।[৪২৬]

আচার্যকুলে ব্রহ্মচারীর প্রতি ব্রহ্মের প্রথম অনুশাসন 'ইতি'-মুখে। তাকে বলা হয়, ব্রহ্ম 'এই'—যা-কিছু দেখছ শুনছ ভাবছ বলছ সমস্ত তনু দিয়ে অনুভব করছ সবই ব্রহ্ম।[৪২৭]

এই 'ইতি'-ব্রহ্মের আবার দুটি রূপ। একটি বাইরে, তাকে বলা হয় 'অধিদৈবত'; আরেকটি ভিতরে, তাকে বলা হয় 'অধ্যাত্ম'। মহিদাসের ভাষায় যে-রূপ বাইরে, তা একটা 'আবিঃ' বা আবির্ভাব—উষার আলোর মত। আর যে-রূপ ভিতরে, তা 'সংযোগ'—ওই আবির্ভাবেরই জীবদেহে সঙ্কুচিত অভিনিবেশ।[৪২৮] দুটিকেই 'বৃহৎ' করে জানতে হবে।

স্বয়ম্ভু ইন্দ্রিয়ের দুয়ারগুলি খুলে দিয়েছেন বাইরের দিকে, তাইতে মানুষ 'পরাক্ পশ্যতি, না.ন্তরাত্মন্'—বাইরে রেখেই দেখে সব-কিছুকে, তাকে অন্তরাত্মায় এনে দেখে না 'ধীর' হয়ে।[৪২৯] এই পরাক্‌দৃষ্টিতে সে অল্পকেও

দেখতে পারে, ভূমাকেও দেখতে পারে। ভূমাকে দেখা ক্রান্তদর্শী কবির দেখা —তার একটা উল্লাস আছে। দ্যুলোকে অন্তরিক্ষে পৃথিবীতে, আকাশে আলোয় বাতাসে সমুদ্রে পর্বতে কান্তারে প্রান্তরে সর্বত্র কবি দেখছেন এক অনিবাধ বৈপুল্যে হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতির মহিমা।[৪৩০] এই মহিমবোধই (sense of the sublime) তাঁকে উদ্দীপ্ত উল্লসিত করছে। কিন্তু এই পরাক্ দর্শন যদি তাঁকে আবৃত্তচক্ষু না করে, ভূমার আদেশ যদি অহংকারাদেশ হতে আত্মাদেশে গভীর না হয়,[৪৩১] তাহলে একে 'পরমা সংদৃক্'[৪৩২] বলা চলবে না। 'বিশ্বদেবগণ তাঁর প্রশাসনের উপাসনা করছেন' এই পরাক্‌বৃত্ত অদ্বৈতপ্রত্যয়ই সংবিৎএর পূর্ণতা আনবে না। সেইসঙ্গে জানতে হবে তাঁকেই প্রজ্ঞারূপে 'আত্মদা' এবং প্রাণরূপে 'বলদা' বলে, জানতে হবে আমার অমৃত এবং মৃত্যু তাঁরই ছায়া বলে,[৪৩৩] তাঁকে সর্বভূতের 'অন্তর' বলে,[৪৩৪] অথর্বা বৃহদ্দিবের মত নিজের তনুকেই ঘোষণা করতে হবে পরমদেবতা ইন্দ্র বলে।[৪৩৫]

তাই আচার্য বললেন, ব্রহ্মপুরুষদের আপ্যায়নের ফলে বৃহতের পরাক্‌-বৃত্ত যে-অনুভব, তাকেই যদি তুমি ব্রহ্মের কল্যাণতম **রূপের সংবেদন** বা পূর্ণ-সংবিৎ বলে মনে করে থাক, তাহলে বলব, তুমি ব্রহ্মের যে-রূপের অনুভব পেয়েছ, তা দভ্র অর্থাৎ অল্প—তাঁর ভূমার রূপ নয়।[৪৩৬] অথচ এই ভূমার সংবিৎই ব্রহ্মের পূর্ণসংবিৎ।

তার জন্য অনুভবের মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে নিবর্তনের পথ ধরতে হবে—একথা আগেই বলেছি। কিন্তু তাও খুব সহজ নয়। সেখানেও সমনস্ক থাকতে হবে, পদে-পদে সংবিৎকে **মীমাংসা** বা গভীর এবং পৌনঃপুনিক মননের দ্বারা যাচাই করে নিতে হবে।

বাইরে দেবতাকেই দেখছ—কিন্তু বহুরূপে। 'একো দেবঃ' সেখানে 'দেবাঃ'। এই দেবেষু ব্রহ্মের যে-রূপ, তার প্রত্যক্ষ একটা মহিমা আছে একথা সত্য। সেই পরমের 'মহৎ অসুরত্ব' বা নিত্যবিচ্ছুরিত অস্তিত্বের নিরঙ্কুশ মহিমা একভাবে সব দেবতার মধ্যে উপসংক্রান্ত হয়েছে।[৪৩৭] তাইতে অগ্নি পৃথিবীস্থান হয়েও বৈশ্বানর জাতবেদা, অন্তরিক্ষের একপ্রান্তে থেকেও বায়ু মাতরিশ্বা প্রথম প্রাণ, দ্যুলোকের উপান্তে ইন্দ্র আদিত্য, মহাশূন্যে নিষ্কেবল্য। সবারই ইশারা সেই পরমের দিকে।

তবুও দেবতারা সেই একের 'বি-ভূতি'—'একং বা ইদং বি বভূব সর্বম্'।[৪৩৮] বিভূতি আর ভূমাতে ভেদ আছে। বিভূতি ভূমার একদেশ মাত্র। ভূমার রূপ হলেও সে-রূপ 'দভ্র' বা অল্প—স্বরূপের সে একটি বিভাব শুধু। তাকে একান্ত করে তুললে সংবিৎ খণ্ডিত হয়। একদেশকে নিঃশেষে পেলেও তুমি বলতে পার না, আমি 'সুবেদাঃ'।

বহু বিভূতির সমাহার ঘটতে পারে সম্-ভূতিতে—যেমন পদ্মের কর্ণিকায় পদ্মদলের সমাহার। পৃথিবী আর দ্যুলোককেও ছাপিয়ে এই সম্ভূতির একটা মহিমা আছে, অম্ভৃণকন্যা বাকের ব্রহ্মঘোষে আমরা যার উজ্জ্বল পরিচয় পাই।[৪৩৯] কিন্তু ব্রহ্মের অবিনাভূত হলেও বাক্ তাঁর শক্তিরূপ মাত্র। বিদ্যুতের মত শক্তিরও উন্মেষ-নিমেষ আছে। আর ব্রহ্ম 'অনিমিষ'। অতএব সম্ভূতিতেও তাঁর রূপ দভ্র। অক্ষর পরমব্যোমে সহস্রাক্ষরা বাক্ বিশ্বদেবগণের সমাহার।[৪৪০] কিন্তু তাঁকে পেলেও তুমি বলতে পার না, আমি ব্রহ্মকে পেয়েছি, আমি সুবেদা।

অতএব 'দেবেষু' ব্রহ্মের রূপের যে সংবিৎই তোমার হ'ক না কেন, তাকে মীমাংস্যই বলব।

অধিদৈবত প্রত্যয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অধ্যাত্ম প্রত্যয়। বিশ্বের দেবতার যে-মহিমা প্রত্যক্ষ করি, তা উপসংক্রান্ত হয় আত্মাতে। দেবতার মহিমা আমাদেরও আত্মমহিমার বোধকে উদ্দীপ্ত করে। তখন দ্যুলোকের আদিত্যের দিকে তাকিয়ে বলতে পারি 'য়োঽসাব্-সৌ পুরুষঃ সোঽহম্ অস্মি', প্রথমচ্ছদ্ সেই ধীরপুরুষের আবেশে আবিষ্ট হয়ে নিজের তনুকে ঘোষণা করতে পারি ইন্দ্র বলে।

এই উদ্দীপ্ত আত্মপ্রত্যয় প্রত্যক্-বৃত্ত বলে পরাক্-বৃত্ত দেবপ্রত্যয়ের চাইতে অন্তরঙ্গ। ব্রহ্মের রূপকে তখন তুমি প্রত্যক্ষ করতে পার আত্মার আদর্শে শুধু প্রতিবিম্বরূপেই নয়, তোমার তোমাকেই তাঁর রূপ বলে: অস্য ত্বং রূপম্। 'দেবেষু'র মত পরোক্ষ নয়—সাযুজ্যের অপরোক্ষ অনুভবে একেবারে 'ত্বম্'।

তবুও এ-অনুভবকে বলব ভূমার আভাস—প্রভাস নয়। এ অহঙ্কারাদেশ, অতএব এও তাঁর দভ্র রূপ। তাঁর উদ্ভাসে অহং তখন উদ্ভাসিত কিন্তু তাঁতে অস্তমিত নয়। আবেশের সম্যক্ প্রগাঢ়তায় অহঙ্কারাদেশ যখন রূপান্তরিত হয় আত্মাদেশে, তখন ব্রহ্মপুরুষদের আপ্যায়নে তোমার ব্রহ্মদর্শন নয়, তাদের নিবর্তনে ব্রহ্মেরই আত্মদর্শন—'ভূতেষু ভূতেষু'।[৪৪১] তখন 'সুবেদাঃ' তিনিই —তুমি নও: তুমি 'নবেদাঃ'। তাঁর আবেশে অহম্‌এর যে পরম আপ্যায়ন, তোমার মধ্যে তার উদ্‌ঘোষ 'সোঽহম্'। কিন্তু সে-অহং এখন তাঁর মধ্যে নিমজ্জিত বিগলিত। এখন আর 'সোঽহম্' নয়—বঁধুর মধুর আলিঙ্গনে বিবশা উশতী জায়ার মত 'অস্য ত্বম্': প্রাজ্ঞ আত্মার দ্বারা সম্পরিষ্বক্ত হয়ে 'ন বাহ্যং বেদ নান্তরম্'।[৪৪২] এমনি করে তাঁর মধ্যে সম্বিৎহারা 'নবেদাঃ' হয়েই তুমি 'সুবেদাঃ'।

বলতে-বলতে আচার্য কোথায় তলিয়ে গেলেন। বহুক্ষণ পরে সে-স্তব্ধতা ভাঙ্‌ল অন্তেবাসীর কম্প্র কণ্ঠস্বরে :

নাহং মন্যে সুবেদেতি ; নো ন বেদেতি, বেদ চ।
যো নস্‌ তদ্‌ বেদ, তদ্‌ বেদ নো ; ন বেদেতি, বেদ চ ॥ ২

—আমি এমন মনে করি না, (তাঁকে) ভাল করে বুঝেছি। (আবার) বুঝিনি এও নয়, বুঝেছিও। আমাদের মধ্যে যিনি (মনে করেন) তৎস্বরূপকে বুঝেছেন, তৎস্বরূপকে তিনি বোঝেননি। (যিনি মনে করেন) যে (তিনি) বোঝেননি, তিনিই বুঝেছেন।

অন্তেবাসীর কথায় সায় দিয়ে আচার্য ধীরে-ধীরে বললেন :

যস্যামতং তস্য মতং, মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতম্‌ অবিজানতাম্‌ ॥ ৩

—যাঁর কাছে (ব্রহ্ম) মননের বাইরে, তাঁরই মননের বিষয়ীভূত (তিনি)। (আবার ব্রহ্ম) মননের বিষয় যার কাছে, সে কিছুই বোঝেনি। যারা (নিজেদের ভাবে) বিজ্ঞানবান্‌, (তিনি) তাদের অবিজ্ঞাত। তাঁদের কাছে বিজ্ঞাত তিনি, যাঁরা (নিজেদের ভাবেন) না বিজ্ঞানবান্‌।

মন মনীষা আর হৃদয় দিয়ে ধীবৃত্তিদের মার্জিত করে 'প্রত্নপতি'কে অর্থাৎ পরম সাঁইকে পাওবার কথা আমরা ধীরেদের কাছে শুনেছি।[৪৪৩] মন মনীষা আর হৃদয়ের মধ্যে সাধনদৃষ্টিতে উৎকর্ষের তারতম্য আছে। তোমার মন যজমান ব্রহ্মপুরুষ—অধিদৈবত দৃষ্টি আর শ্রুতিকে সে-ই প্রথম অন্তরাবৃত্ত করে। কিন্তু তার প্রত্যয় একতান নয়। সুদূরের ভাবনায় সে চঞ্চল, বারবার আকাশে ওড়বার ছট্‌ফটানি তার ডানায়। পূর্বচিত্তির ঝলক পেয়ে সেই মন একাগ্র হয়। তখন সে মনীষা বা বিজ্ঞান—ভূমার পথে যা দেখা দেয় ক্রমান্বয়ে সঙ্কল্প চিত্ত এবং ধ্যান পার হয়ে।[৪৪৪] মনের অবিশিষ্ট জ্ঞান বিজ্ঞানে বিশিষ্ট হয়, প্রত্যয় স্থির হয়।

কিন্তু তবুও বিজ্ঞান পরম সংবিৎ নয়, কেননা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ভেদ তাতেও ঘোচে না। এই ভেদ ঘোচে প্রজ্ঞানে বা সংজ্ঞানে বা সংবিৎএ। তখন 'ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্মৈব ভবতি'—ব্রহ্মকে যে বোঝে, সে ব্রহ্মই হয়।[৪৪৫] 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' —যে প্রজ্ঞান সাধন এবং সাধ্য দুইই।[৪৪৬] তখন তুমি 'অনন্তরো ঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব'—প্রজ্ঞানঘনতার অখণ্ড সংবিৎএ তোমার না আছে বাহির

না আছে অন্তর। এই হল প্রেতির চরম। তারপর আর সংজ্ঞান থাকে না। একরস প্রত্যয়ে সব রসঘন হয়ে যায়।[৪৪৭]

এইভাবে ব্রহ্মকে পাওরা হল হৃদয় দিয়ে পাওরা। হৃদয়ই ব্রহ্ম, হৃদয়ই সব।[৪৪৮] আর হৃদয় দিয়ে ব্রহ্মকে পাওরাই হল প্রাণ দিয়ে তাঁকে পাওরা—প্রাণের প্রাণরূপে।

এমনি করে পাওরাই ভূমাকে পাওরা। মনের পাওরা বা বিজ্ঞানে পাওরা তার তুলনায় দভ্র। প্রাণে-প্রাণে যে পায়, সে বলতে পারে না কি পেল। পাওরার কৃৎস্নতায় সে টইটম্বুর, অথচ তাতেও তার পাওরা ফুরায় না। তাই সে পেয়েও পায় না, আর না পেয়েও পায়।

এই পাওরাকে বলতে পারি 'বোধে পাওরা'। আর তাইতে

প্রতিরোধবিদিতং মতম্ অমৃতত্বং হি বিন্দতে।
আত্মনা বিন্দতে বীর্যং বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্॥ ৪

—প্রতিরোধের দ্বারা বিদিত (ব্রহ্মই) মনের গোচর, কেননা (মানুষ তাইতে) অমৃতত্ব পায়—আত্মা দিয়ে পায় বীর্য, (আর) বিদ্যা দিয়ে পায় অমৃত।

দ্যুলোকে যে-উষা শাশ্বতকাল ধরে জেগে আছেন পৃথিবীর স্তিমিত মৃতকল্প জীবনের দিকে চেয়ে, তাঁর আলোর ছোঁরায় তাঁর পানে জেগে ওঠা—এই হল **প্রতিবোধ**।[৪৪৯] এই ঊষার আলোয় এখানে তোমার মধ্যে জেগে ওঠেন জাতবেদা অগ্নি আর তাঁর উতলা আহ্বানে ওখানে যেন জেগে ওঠেন 'অনিমিষ'[৪৫০] দেবতারা। সবাই 'উষর্বুধঃ'—সঙ্গে-সঙ্গে তুমিও।[৪৫১] ভূলোকে-দ্যুলোকে অন্তরে-বাইরে এই-যে আলোর উৎসবন, তা মনের কোনও ব্যাপার নয়—এমন-কি বিজ্ঞান বা বুদ্ধিরও নয়। এ সেই পরমদেবতার অনিমিষ দৃষ্টির প্রসাদ, যাকে তুমি পাও হৃদয়ের প্রত্যেষণা দিয়ে। এই প্রতিবোধের আলোই মনের উপর পড়ে তার রূপান্তর ঘটায়, তাকে করে 'বোধিন্মনঃ', হঠাৎ-আলোর ঝলকানিতে 'ধী' বা বিজ্ঞানকে করে প্রচেতনার জ্যোতিঃসমুদ্র।[৪৫২]

মনের উপর এই প্রতিবোধ বা প্রাতিভসংবিৎএর যে-প্রপাত, তাইতে ব্রহ্মের মনন সার্থক হয়। তখন মন তাঁকে পায় না, কিন্তু তাঁর আবেশে ফোটে দৈবচক্ষু হয়ে, অনন্ত হয়ে, তিনি হয়ে।[৪৫৩]

ব্রহ্মানুভবের তখন তিনটি পর্ব—প্রতিবোধ, সংবিৎ (**বিদিত**) এবং মনন (**মত**)। প্রতিবোধে ব্রহ্মকে পাওরার অর্থ হল তাঁকে সাক্ষাৎ বোধে পাওরা—একেবারে সামনাসামনি। যেমন ইন্দ্রিয় দিয়ে বিষয়কে পাই নিঃসংশয় নিবিড়তায়, এও তেমনি ব্রহ্মপুরুষদের দিয়ে ব্রহ্মকে পাওরা—চিন্ময় প্রত্যক্ষের

মাধ্যমে। ব্রহ্ম তখন 'আবিঃ'—প্রতিবুদ্ধ চেতনার কাছে উষার আলোর মত একটা জীবন্ত আবির্ভাব।[৪৫৪] ঋষি মধুচ্ছন্দা বলেছেন এক জ্যোতিঃসমুদ্রের প্রচোদনার কথা—সরস্বতী যা তাঁর 'কেতু' বা বোধির ঝলক দিয়ে আমাদের মধ্যে উদ্‌ভাসিত করে তোলেন।[৪৫৫] প্রতিবোধ তারই সগোত্র। এটি অধিদৈবত দৃষ্টির সার্থক পরিণাম—যাতে দেবতার আবেশজনিত সাযুজ্যবোধে আমরা দেবতা হয়েই দেবতাকে দেখি সর্বত্র। এ-বোধ একটা সুষুপ্তিকল্প প্রত্যয়—যেখানে দৃশ্য দৃষ্টি এবং দ্রষ্টা একাকার।

প্রতিবোধের একরস প্রত্যয়ে যখন দ্রষ্টা ও দৃশ্যের ভেদাভাস দেখা দেয়, ব্রহ্ম তখন বিদিত বা বিদ্যার বিষয়। যিনি বিদিত, তাঁকে নিবিড় করে জানি বলে জানার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁকে পাইও। একসঙ্গে তাঁকে জানা এবং পাওয়া যেন সম্প্রয়োগ হতে বিলাসে উন্মজ্জন। পুরুষ পূর্বে ছিলেন সুষুপ্তিস্থান এবং আনন্দভুক্, এখন তিনি স্বপ্নস্থান এবং প্রবিবিক্তভুক্ কিনা ভেদাভেদে রমমাণ।[৪৫৬]

বোধ যেখানে বিবিক্ত, দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের ভেদ স্পষ্ট, সেইখান থেকে মনের শুরু। ব্রহ্ম তখন মত বা মনের বিষয়।

মন বিচরণ করে জাগ্রৎ-ভূমিতে—স্থূলভুক্ হয়ে। বিষয় যখন জ্ঞাতার বাইরে, তখন তা স্থূল বা বিবিক্ত। যখন অন্তরে, তখন হয় তা প্রবিবিক্ত—যেমন স্বপ্নে, অথবা অবিবিক্ত—যেমন সুষুপ্তিতে। বিষয়কে অন্তর দিয়ে জানা হল তাকে পাওয়া। এইখান থেকে বিদ্যার শুরু। তার পর্যবসান সুষুপ্তিতে বা সম্প্রসাদে[৪৫৭]—যার আরেক নাম 'ব্রহ্মলোক'। এই ব্রহ্মলোকই পুরুষের পরমা গতি, পরমা সম্পৎ, পরম লোক এবং পরম আনন্দ।[৪৫৮]

মনের মধ্যে যদি বিদ্যার অর্থাৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তির সংবিৎএর আবেশ[৪৫৯] না থাকে, তাহলে মন দিয়ে ব্রহ্মকে জানা হবে তাঁকে পরোক্ষ বা স্থূলভাবে জানা। এ কখনও ব্রহ্মের সম্যক্ সংবিৎ হতে পারে না। তাই তোমায় বলছিলাম 'মতং য়স্য, ন বেদ সঃ'।

কিন্তু এই মনের উপরেই যদি প্রতিবোধ এবং সংবিৎএর আলো পড়ে তাকে অনুবিদ্ধ এবং জারিত করে, তাহলে তার ব্রহ্মমনন সার্থক হয়। মন তখন আর সাধারণ মন নয়—সে যে 'বোধিন্মনঃ' একথা আগেই বলেছি।

অবশ্য সাধনজীবনে মনেরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। 'মনো হ বার য়জমানঃ'—সাধনযজ্ঞের যজমান হল মন।[৪৬০] যে-জিজীবিষা মানুষের স্বভাবগত, এই মনেই তার প্রকাশ মানুষের অমৃতত্বের আকুতিতে। আদিত্যায়নের সঙ্গে জীবনায়নের একটা মিল আছে। জীবনের মধ্যাহ্ন পর্যন্ত প্রাণের সহজ উপচয়, তার পরেই শুরু হয় অবক্ষয়—যার পর্যবসান মৃত্যুতে।

মানুষের মন এই জরা-মৃত্যুকে রুখতে চায়। কিন্তু প্রবর্তনের পথে চেতনার অবক্ষয়কে রোধ করা যায় না। তার জন্য নিবর্তনের পথ ধরতে হয়। অর্থাৎ জাগ্রতের গভীরে আবিষ্কার করতে হয় স্বপ্নের সংবিৎ ও সুপ্তির প্রতিবোধকে। প্রতিবোধে সমস্ত প্রত্যয় সম্প্রসাদে একরস এবং অদ্বৈত।[৪৬১] এই অদ্বৈতই ব্রহ্ম, এই অদ্বৈতই অমৃত। তাই প্রতিবোধবিদিত মনন দিয়েই মানুষ অমৃতত্বকে লাভ করতে পারে।

সাধারণ মনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য, তার মধ্যে আত্মপ্রত্যয় ক্রমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রত্যেক পুরুষের নিজস্ব ভুবনের কেন্দ্রে রয়েছে তার অহংকার। অহংকার পরিশুদ্ধ হয়ে হয় **আত্মা**। আত্মা 'অণু',[৪৬২] ব্রহ্ম 'ভূমা'। আবেশের ফলে ব্রহ্মের সহজ প্রতিবোধ সম্ভব হলেও তাকে সুপ্রতিষ্ঠ করতে হলে—কিংবা অধিকারিভেদে—আত্মবোধকে বীর্যশালী করতে হয়। সনৎকুমার তাই ভূমার অনুশাসনের পর নারদের কাছে ক্রমান্বয়ে অহংকারাদেশ এবং আত্মাদেশের কথা তুলেছিলেন।[৪৬৩]

আত্মাতে **বীর্য** আহিত হয় আবৃত্তচক্ষু হয়ে আত্মার প্রত্যক্-দর্শনের ফলে। এটি অমৃতপিপাসু ধীরের পথ—সবাই এ-পথ ধরে না।[৪৬৪] ধীরের মন 'ঊর্জস্বী' অর্থাৎ উজানপথে বিজ্ঞানের দিকে তার মোড় ঘুরে গিয়েছে বলে তাতে বলের সঞ্চার হয়েছে। এই মনই অবশেষে হয় 'বোধিস্মনঃ'—যে-মন তার চিন্ময় বৃত্তি দিয়ে ব্রহ্মকে জানে বোঝে এবং পায়।

আত্মবীর্যে প্রতিষ্ঠিত পুরুষের সংজ্ঞা হল '**স্বধাবান্**'। '**স্বধা**' অর্থ আপনাতে আপনি থাকা, নিজেকে হারিয়ে কিছুতেই 'আত্মহা' না হওরা।[৪৬৫] এটি একটি দৈবী সম্পদ—সৃষ্টির আদিতেই উপর হতে নীচে নেমে এসেছে আধারশক্তি হয়ে।[৪৬৬] স্বধাবান্ পুরুষের যে-**বিদ্যা** অর্থাৎ প্রতিবোধ এবং সংবিত্তি, তা-ই দিয়ে তিনি যে শুধু 'বেত্তি' বা জানেন তা নয়—**বিন্দতে** বা লাভ করেন, সম্ভোগ করেন **অমৃত** বা ব্রহ্মানন্দরূপী সোম্যসুধার নিঝর্র।[৪৬৭]

বীর্য আর বিদ্যার সমাহরণে পাওরার পূর্ণতা। কিন্তু তার পথে বাধাও আছে। আচার্য এখন তার কথা বলছেন:

ইহ চেদ্ অবেদীদ্ অথ সত্যম্ অস্তি
ন চেদ্ ইহাবেদীন্ মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্ লোকাদ্ অমৃতা ভবন্তি ॥৫

—এইখানে যদি (কেউ) বুঝল, তবে (সে) সত্যি আছে। না যদি এখানে বুঝল, (তাহলে) মহতী বিনষ্টি। ভূতে-ভূতে খুঁটিয়ে দেখে ধীরেরা এই লোক থেকে এগিয়ে গিয়ে অমৃত হন।

ইহ এইখানে অর্থাৎ এই লোকে, এই আধারে, এই জাগ্রৎভূমিতে। দেহ প্রাণ মন নিয়ে মানুষের জাগ্রতের কারবার বা ব্যবহারদশা। ব্রহ্মের **সংবিৎকে** নামিয়ে আনতে হবে এই ব্যবহারের মধ্যে, সেই সংবিৎ দিয়ে দেহ প্রাণ মনকে উদ্‌ভাসিত করতে হবে,[৪৬৮] আক্ষরিক অর্থে মানুষকে 'ব্রহ্মচারী' হতে হবে। তবেই তার **অস্তিত্বের সত্যকার** সার্থকতা।

অবিদ্যার দুটি পর্বের মধ্যে বিস্তৃত রয়েছে বিদ্যার অধিকার। এক অবিদ্যা ব্যবহারিক—মানুষ যেখানে দেহ-প্রাণ-মনের উজানের খবর রাখে না। এ তার বহিশ্চর মনের ভূমিতে ভরা জাগ্রৎ নিয়ে কারবার। এর উজানে বা গভীরে রয়েছে বিজ্ঞান এবং আনন্দ—কিন্তু তাদের সম্পর্কে সে সজাগ নয়। স্বভাবের নিয়মে প্রতিদিন তার বহিশ্চর মন শ্রান্ত হয়ে যখন অন্তরাবৃত্ত হয়, তখন সে স্বপ্নে বা সুষুপ্তিতে তলিয়ে যায়। এই স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি বস্তুত বিজ্ঞান এবং আনন্দেরই প্রাকৃত রূপ, কিন্তু মানুষ তা বোঝে না। প্রতিদিন অন্তরাবৃত্তির পথে ব্রহ্মকে পেয়েও সে পায় না।[৪৬৯]

কিন্তু যদি কদাচিৎ সে আবৃত্তচক্ষু **ধীর** বা ধ্যানী হয়ে চেতনার পরাক্ প্রত্যাখ্যান ক'রে প্রত্যক্ বৃত্তিকে আশ্রয় করে, তাহলে সুষুপ্তিকল্প বৃত্তিকে সমাধির প্রত্যন্তে সে আরেক অবিদ্যার সম্মুখীন হয়—যেখানে সৎ নাই অসৎ নাই, দিন নাই রাত নাই, লোক নাই অলোক নাই, কোনও-কিছুই নাই অথচ সবই যেন আছে।[৪৭০] এই অবিদ্যা বিদ্যার উজানে, যেমন লৌকিক অবিদ্যা বিদ্যার ভাটিতে। একটিতে ত্বাষ্ট্র বিশ্বরূপের দ্বারা ব্রহ্ম অপিহিত, আরেকটিতে ব্রহ্মের অতিস্থিতিতে বিশ্ব নিরাকৃত।[৪৭১]

দুটি অবিদ্যাতেই **বিনষ্টি** বা সব খোয়ানোর পালা। একটিতে ব্রহ্মকে খোয়ানো, আরেকটিতে বিশ্বকে খোয়ানো। তার মধ্যে দ্বিতীয়টিকে বলা চলে **মহতী** বিনষ্টি—কেননা প্রথম বিনষ্টি হতে উদ্ধার পাওয়ার একটা প্রেষণা জীবনের নেপথ্যে আছেই, কিন্তু দ্বিতীয় বিনষ্টি হতে ফেরবার সম্ভাবনা আছে কি না কেউ বলতে পারে না। মহাবিনাশে যদি সব তলিয়ে যায়, তাহলে জিজীবিষার তর্পণ হল কোথায়, অমৃতসম্ভোগের আকূতি সার্থক হল কই! অসৎএর মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াই কি সত্তার একমাত্র সত্য?

তা তো নয়। যেমন আছে অসৎএ সৎএর বিনষ্টি, তেমনি তার পাশেই আছে অসৎ হতে সৎএর বিসৃষ্টি।[৪৭২] একটিতে নিরোধ, আরেকটিতে আপ্যায়ন। একটি অসম্ভূতির শূন্যতা, আরেকটিতে সম্ভূতির পূর্ণতা। একটিতে মৃত্যু, আরেকটিতে অমৃত। দুয়ের সহবেদনেই অনুভবের সমগ্রতা—কেননা এ-দুটিই হিরণ্যগর্ভের ছায়া।[৪৭৩] আত্মায় বীর্যাধানের জন্য বিনাশের পথ ধরে উজিয়ে

যেতেই হয়। কিন্তু তার পরেই আসে 'প্রথমচ্ছদ পিতার' আবেশের উল্লাস,[৪১৪] সংসিদ্ধ জীবনের অমৃতবর্ণ আপ্যায়ন।

ধীরেরা তাই নচিকেতার মত (সংহিতায় 'কুমার যামায়ন')[৪১৫] মৃত্যুর কাছ থেকে ছিনিয়ে আনেন অমৃত, ফিরে আসেন এই মর্ত্যলোকে এই মৃত্যুদিগ্ধ ভূতের মেলায়—ভূতেষু ভূতেষু। কিন্তু তাঁদের বি-চিতি বা সন্ধানী দৃষ্টির আলো[৪১৬] মৃত্যুর মধ্যেই দেখে অমৃতের লীলা, দেখে ঃ শ্বাস ফেলতে-ফেলতে শুয়ে আছে ত্বরিতগতি 'জীব'—সে কাঁপছে, আবার স্থির হয়ে আছে ধারাদের মধ্যে ; মৃতের 'জীব' বা প্রাণ চলতে থাকে তার 'স্বধা'র শক্তিতে ; অমর্ত্য আর মর্ত্যের একই যোনি বা উৎস।[৪১৭] অবিদ্বানের দৃষ্টিতে এই লোক মৃত্যুর লীলাভূমি। কিন্তু তাঁদের দৃষ্টিতে এখানে জীবন-মৃত্যুর তরঙ্গভঙ্গে শাশ্বত অমৃতেরই উচ্ছলন। তাইতে মৃত্যুকে অমৃতের দ্বারা জারিত করে তাকে ছাপিয়ে তাঁরা অমৃত হয়ে যান।

এমনি করে স্বধার বলে লোকোত্তর অমৃতের অক্ষীয়মাণ উৎসে অবগাহন করে আবার সেই অনুভবকে নিয়ে আসা এইখানে, এই দেহ-প্রাণ-মনের জাগ্রৎ লীলায়নে—এই হল অমৃতসম্ভূতি[৪১৮], যাতে অস্তিত্বের সত্যকার আপ্যায়ন।

মহাবিনাশের সঙ্কর্ষণ যত প্রবলই হ'ক না কেন, নচিকেতার মতই মৃত্যু-প্রসৃষ্ট হয়ে আবার তোমাকে এইখানে ফিরে আসতে হবে,[৪১৯] একথা যেন মনে থাকে।

আচার্যের অনুশাসনের আরেকটি পর্ব এইখানে শেষ হল।

তৃতীয় খণ্ড

আচার্যের অনুশাসন হতে আমরা এপর্যন্ত এই ক'টি কথা পেলাম। কোনও লৌকিক উপায়ে ব্রহ্মকে নিঃশেষে জানা বা পাওয়া যায় না। আমাদের মনন বিজ্ঞান বা সংবিৎ—কোনটাই ব্রহ্মোপলব্ধির পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। মন মনীষা এবং হৃদয় দিয়ে আমরা ধীবৃত্তিগুলিকে মার্জিতই করতে পারি তাঁকে পাবার জন্য[৪৮০]—কিন্তু ওদের প্রাপ্তিকে যদি পরম প্রাপ্তি বলে মনে করি, তাহলে আমাদের ভুল হবে। আমাদের 'সুকৃৎ' হতে হবে অর্থাৎ তাঁকে পাওয়ার জন্য আমাদের কিছু করা চাই—একথা সত্য। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁকে পাওয়া নির্ভর করে তাঁর আবেশের উপর, তাঁর প্রসাদের উপর। তিনি 'আবিঃ'-রূপে আমাদের সন্নিহিত হন যখন,[৪৮১] তখনই তাঁর উদ্ভাসে উদ্দীপ্ত আমাদের প্রতিবোধ এবং সংবিৎ তাঁকে মনোগোচর করে। এই বোধময় মনই আমাদের এনে দেয় অমৃতের অধিকার। আর মন দিয়ে তাঁকে পাওয়ার অর্থ হল এইখানে এই আধারে এই জীবনে তাঁকে পাওয়া। তখন অন্তরাবৃত্ত মনের সংবেগ যেমন আত্মাতে বীর্যাধান করে, তেমনি প্রাতিভসংবিৎ দেয় অমৃতের আস্বাদন। বস্তুত এইখানেই তাঁকে পেতে হবে। এই বিশ্ববৃক্ষের কটু পিপ্পলকে তাঁর রসে স্বাদু করে নিয়ে পিপ্পলাদ হতে হবে, তবেই আমরা সে অমৃতস্বরূপকে পাব।[৪৮২] নইলে তাঁকে পেতে গিয়ে অসৎএর অন্ধতমিস্রায় হারিয়ে যাওয়া আর তাঁকে মোটেই না খোঁজা একই কথা হয়ে যায়। দুইই অবিদ্যা, দুইই বিনাশ।

এইবার আচার্য আরেকদিকে অন্তেবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। আত্মাতে বীর্যাধান ব্রহ্মোপলব্ধির অপরিহার্য সাধন। কিন্তু এই বীর্যাধান যেন আত্মাভিমানের সৃষ্টি না করে এইদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সনৎকুমারও অহঙ্কারাদেশের পর আত্মাদেশের কথা বলেছিলেন। অহঙ্কারের নির্বিশেষ শুদ্ধ রূপ হল আত্মা। সাধনার প্রাথমিক আলম্বন অহঙ্কার, কিন্তু তাঁকে আত্মায় রূপান্তরিত করতে না পারলে সিদ্ধি পরাহত হতে বাধ্য। 'অস্য ত্বম্'—তুমি তাঁর, এই অনুশাসনে অহং-নিরসনের একটি সংকেত আচার্য আগেই দিয়েছেন। এইবার এই বিষয়টিকে একটি উপাখ্যানের মাধ্যমে পরিস্ফুট করতে চাইছেন।

উপাখ্যানের পটভূমিকা দেবাসুর-সংগ্রাম—যা বেদে মানুষের সাধনজীবনের বহুপ্রপঞ্চিত একটি রূপক। এখানে উপাখ্যানের পাত্র-পাত্রী ব্রহ্ম (যক্ষ), দেবগণ, অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র এবং স্ত্রী (উমা)। ব্রহ্ম সংহিতায় একটি বহুপ্রযুক্ত সংজ্ঞা - বোঝায় সেই 'বৃহৎ' চৈতন্য বা ব্যাপ্তিচৈতন্য, যা পরা বাকের সঙ্গে অবিনাভূত। অতএব ব্রহ্ম অক্ষর পরমব্যোম।[৪৮৩] ব্রহ্মের অপরাপর সংজ্ঞা 'ঋতং বৃহৎ' 'একো দেবঃ' 'একং সৎ' 'একং তৎ'। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ব্রহ্ম পরমের আবেশজনিত কবিচেতনার স্ফূর্তি এবং তাতে আবিভূর্তা দিব্যা বাক্। যা আত্মায়, তা-ই বিশ্বে। তাই ব্রহ্ম বিশ্বমূলে চৈতন্য এবং আত্মচৈতন্য যুগপৎ। 'স্ত্রী' ব্রহ্মশক্তি, দেবতারা তাঁর বিভূতি। জৈমিনীয়োপনিষদে ব্রহ্মের পরিচয়—তিনি অমৃত, তিনি প্রাণ, তিনি পুরুষ, তিনি সাম।[৪৮৪] তিনি অমৃত গায়ত্রের আদি প্রবক্তা।[৪৮৫] ব্রহ্ম পরমব্যোম—এই লক্ষণটি প্রণিধেয়।

ব্রহ্মকে কি করে পাওয়া যায়, আখ্যায়িকাতে তার অধিদৈবত বিবৃতি। অধিদৈবতভাবনা বিশ্বগত, আর অধ্যাত্মভাবনা ব্যক্তিগত। দুটি ভাবনা ওতপ্রোত। এ-বিষয়ে আধুনিক প্রকল্প হল, যা ব্রহ্মাণ্ডে (macrocosm) ঘটছে, তা ঘটছে পিণ্ডেও (microcosm)।

আচার্য বলে চলছেন :

ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে। তস্য হ ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবা অমহীয়ন্ত। ত ঐক্ষন্তাস্মাকম্ এবায়ং বিজয়োঽস্মাকম্ এবায়ং মহিমেতি ॥ ১

—ব্রহ্মই দেবতাদের পক্ষে বিজয়ী হলেন। সেই ব্রহ্মেরই বিজয়ে দেবতারা মহান হলেন। তাঁরা দেখলেন, 'এ তো আমাদেরই বিজয়, এ তো আমাদেরই মহিমা'।

বিশ্ব জুড়ে চলছে দেবাসুর সংগ্রাম—যেন আলো আর আঁধারের লড়াই। দেবতারা আলোর শক্তি, অসুরেরা আঁধারের। বাইরে যা আলো, ভিতরে তা বিদ্যা ; তেমনি যা অন্ধকার, তা অবিদ্যা। বিদ্যার উন্মেষ যেন অন্ধকারকে পরাভূত করে সকালবেলাকার আলো ফোটার মত। আলো আর আঁধারের লড়াইকে বেদে ইন্দ্র আর বৃত্রের লড়াইরূপে দেখানো হয়েছে। ইন্দ্র দেবতাদের প্রধান, বৃত্র অসুরদের।

অহোরাত্রের মধ্যে আলো-আঁধারের একটা আবর্তন দেখা যায়। ভোর হতে দুপুর পর্যন্ত আলোর উপচয় সহজ—যেমন আমাদের জীবনে শৈশব হতে যৌবন পর্যন্ত প্রাণ-চেতনার উপচয়ও সহজ। দুপুরের পর হতে আলো

নিস্তেজ হয়ে আসে, সন্ধ্যায় নিবে যায়। আমাদেরও জীবনে আসে জরা আর মৃত্যু।

আমরা আলোর পরাভব চাই না, জরা-মৃত্যুর কবলিত হতে চাই না। চাই অক্ষয় প্রজ্ঞা এবং প্রাণ। তা কি সম্ভব নয়?

তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ বলছেন, আদিত্যের নীচেই অহোরাত্রের আবর্তন। আমরা যদি আদিত্যের ঊর্ধ্বে চলে যেতে পারি, তাহলে দেখব, আলো-আঁধারের খেলা আমাদের পায়ের তলায়। আদিত্যের ঊর্ধ্বে 'সকৃদ্ দিবা'—কেবলই দিনের আলো।[৪৮৬] এইখানে পৌঁছনই ব্রহ্মকে পাওয়া।

দেখতে পাচ্ছি, আলো আর আঁধার, বিদ্যা আর অবিদ্যা দুইই ব্রহ্মশক্তি। উপনিষদের ভাষায় দেবতা আর অসুর দুইই 'প্রাজাপত্য' বা প্রজাপতির সন্তান।[৪৮৭] সুতরাং দুয়ের মধ্যে যে-দ্বন্দ্ব, তার চরম সমাধান হতে পারে ব্রহ্মেই, আদিত্যের ওপারে সকৃদ্দিবার ভূমিতেই—নীচে নয়।

নীচে যতক্ষণ আলোর জোয়ারে প্রাণের উল্লাসে ভেসে চলি, ততক্ষণ মনে হয়, এমনি করে ভেসে চলা কত সহজ: অন্ধকারের উপর আলোর বিজয়, এ তো আমাদেরই বিজয়, আমাদেরই মহিমা। কিন্তু শেষপর্যন্ত এ-অভিমান টেকে না। দিন ফুরিয়ে আসতে দেখি, অন্ধকারকে আর ঠেকাতে পারছি না। তখন বুঝি, দিনের আলো আমরা জ্বালাইনি, জ্বালিয়েছিল আর কেউ। অন্ধকারের উপর আলোর বিজয়ের যে-মহিমা, তার অনুভব আমরা পেয়েছি। কিন্তু মধ্য দিনের পর সে-মহিমা পরাভূত হল কেন? অতএব আমরা যে-আলো খুঁজছি, এ তো সে-আলো নয়। এই আলো-আঁধারের উজানে কোথায় সে অনালোকের আলো, কোন অনির্বচনীয় 'যক্ষে'র সে-উদ্ভাস, যার প্রতিভাসে আমাদের মহিমা? সাধনজীবনের এই সংকট আর তার সমাধানের ইঙ্গিত আছে উপাখ্যানটিতে।

উপাখ্যানের প্রথমেই চারটি সংজ্ঞাশব্দ পাচ্ছি—ব্রহ্ম, দেবগণ, বিজয় এবং মহিমা। ব্রহ্মের বিজয় এবং দেবগণের মহিমা—অবশ্য আমাদের জীবনে এবং তাইতে বিশ্বেও।

সংহিতায় ব্রহ্মের লক্ষণ 'স্বর্ বৃহৎ'—বৃহৎ জ্যোতি বা নাদ।[৪৮৮] প্রত্যক্ষ আদিত্য এবং আকাশ ব্রহ্মেরই রূপ—তাতে জ্যোতি এবং নাদের অনুভব হয়। ব্রহ্মের আরেক লক্ষণ 'একং সৎ' বা 'একং তৎ'—এক অনির্বচনীয় সত্তামাত্র, যা থেকে দেবতারা বেরিয়ে এসেছেন।[৪৮৯] আবার তিনি সৎ বা অসৎ এই আখ্যারও অতীত।[৪৯০]

ব্রহ্মকে যদি আদিত্যরূপে দেখি, তাহলে আদিত্যরশ্মিরা বিশ্বদেবগণ![৪৯১] যদি আকাশরূপে দেখি, তাহলে তাঁরা দিক্‌সমূহ বা অলৌকিক শ্রোত্রগম্য

'সহস্রাক্ষরা' বাক্—একেকটি অক্ষর একেক দেবতার মন্ত্র।[৪৯২] এককথায় দেবতার ব্রহ্মের বিভূতি—আমাদের মধ্যে চিদ্‌বৃত্তি।

চিৎপ্রকর্ষই বিশ্বজীবদের লক্ষ্য। সংহিতার ভাষায়, যে-বরুণ পরম-দেবতা,[৪৯৩] আমাদের কাছে যিনি এক 'রহস্যময় সমুদ্র', তিনি তাঁর জ্যোতির্ময় চরণের আঘাতে অসুরের মায়াসমূহ দিকে-দিকে ছিটিয়ে দিয়ে আরোহণ করছেন বিশোক লোকে—এই তাঁর 'ব্রত' বা 'দক্ষ' অর্থাৎ সত্য সঙ্কল্প।[৪৯৪] আমাদের 'আয়ুর প্রতরণে'[৪৯৫] বা জীবনের উত্তরায়ণে এই সঙ্কল্পের উদ্ভাস।

এই হল ব্রহ্মের **বিজয়** এবং তা-ই ফোটে দেবতার **মহিমা** হয়ে। 'মহিমা' সংহিতায় একটি পারিভাষিক সংজ্ঞা—বোঝায় জ্যোতিঃশক্তির বিপুল হয়ে ছড়িয়ে পড়াকে।[৪৯৬] এটি ব্রহ্মের শক্তিরূপ এবং এই ধরে তাঁর আরেক সংজ্ঞা 'ঋতং মহৎ'।[৪৯৭] 'ঋত' বিশ্ববিধানের ছন্দোময় পরিণাম—যার লক্ষণীয় প্রকাশ 'ঋতু'-চক্রের আবর্তনে। 'স্বর্'-রূপে ব্রহ্ম 'বৃহৎ', ঋতচ্ছন্দে 'মহৎ'। দর্শনে এই 'মহৎ' অব্যক্তের প্রথম অভিব্যক্তি, আমাদের মধ্যে যার স্ফুরণ বুদ্ধি, সত্ত্ব বা বিজ্ঞানে।[৪৯৮] এইখানে এক বহু হচ্ছেন, এবং বহুর প্রত্যেক বিভাবে সংক্রামিত হচ্ছে তাঁর অহম্। ব্রহ্মের অহন্তা তাঁর বিভূতিবিস্তরে পরিণত হচ্ছে 'অস্মিতা'তে বা আমিত্বের অভিমানে। দেবতারা ব্রহ্মের আদিবিভূতি। ব্রহ্মের বিজয় এবং মহিমা তাঁদের মধ্যে উপসংক্রান্ত হয়ে অস্মিতাকে চেতিয়ে তুলল। তাঁরা অনুভব করলেন, 'এই বিজয় মহিমা **অস্মাকম্** এর'—আর কারও নয়, আমাদেরই। এই অস্মিতা অবিদ্যার প্রথম পরিণাম।

ব্রহ্মের বৃহত্ত্ব সঙ্কুচিত হল বিভূতির অস্মিতায়—সঙ্কটের সূত্রপাত এইখানে। ব্রহ্মই এই সব-কিছু হয়েছেন, অতএব স্বরূপদৃষ্টিতে তাঁর সঙ্গে সাযুজ্যবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে বিভূতি বলতে পারে 'অহং ব্রহ্মাস্মি'। কিন্তু উৎসৃষ্টির বেলায় একথা খাটলেও বিসৃষ্টির বেলায় খাটে না। বিসৃষ্টি শক্তির এলাকায়। ব্রহ্মের এই-যে বিজয় এবং মহিমা, তাতে তাঁর শক্তিরই পরিচয়। স্বরূপে বিভূতি ব্রহ্মসম হতে পারে, কিন্তু শক্তিতে নয়। অস্মিতা এইখানে ভুল করে।

দেবতাদেরও এই ভুল হল। কিন্তু এ হল 'ধূর্তি' কিনা চলার পথে একটা আবর্ত—আমার আমিকে নিয়ে পাক খেয়ে মরা। এ বস্তুত আত্মার বৃহত্ত্ব বা মহিমা নয়—এ 'অংহঃ' বা চেতনার সঙ্কোচ। অস্মিতা ছাড়া বিভূতি-বিস্তর সম্ভব ছিল না। তাই এটি অপরিহার্য—কিন্তু অনতিক্রমণীয় নয়। যিনি এই সঙ্কটের সৃষ্টি করেছেন, সমাধানও তিনিই করেন—অস্মিতাকে কোথাও ঠেকিয়ে দিয়ে।

তাইতে

তদ্ধৈষাং বিজজ্ঞৌ। তেভ্যো হ প্রাদুর্বভূব। তন্ন ব্যজানত কিম্ ইদং যক্ষম্ ইতি ॥ ২

—ব্রহ্ম কিন্তু এঁদের (ঈক্ষণ) বেশ জানতে পারলেন। (তিনি) তাঁদের কাছে তাই প্রাদুর্ভূত হলেন। তাঁকে তাঁরা ঠিক জানতে পারলেন না এই যক্ষ কি।

দেবতাদের ঈক্ষণ হল, 'অন্ধকারের উপর আমরা বিজয়ী হয়েছি—এই আমাদের বীর্য। প্রজ্ঞানের আলো হয়ে আমরা ছড়িয়ে পড়েছি—এই আমাদের মহিমা। শক্তি এবং জ্ঞান—দুই দিক দিয়েই আমরা কৃতার্থ। আমাদের আর করবার বা জানবার কিছু নাই'।

এই তৌষ্টিকতা বা আত্মতুষ্টির সঙ্গে আমরা পরিচিত। আগেই বলা হয়েছে, যে মনে করে ব্রহ্মকে সে জেনেছে, সে অল্পই জেনেছে; বরং সে-ই তাঁকে জেনেছে, যে মনে করে, এত জেনেও সে কিছুই জানেনি।[৪৯৯] সব না জেনেও 'সব জেনেছি' এই অভিমান হল অস্মিতার দুর্বিপাক।

অস্মিতা যেন ঘটের মত, তার চারদিকে একটা গণ্ডি আছে। ঘটের মধ্যে আলো জ্বাললে ভিতরের সবটা আলো হয়ে ওঠে, কিন্তু ঘটের বাইরে সে-আলো তো ছড়ায় না। সীমিত করণ দিয়ে অসীমকে জানার এই বিপত্তি।

কিন্তু এই তৌষ্টিকতা সব দেবতার ধর্ম নয়। পরে দেখব, অন্তত তিনজন দেবতা তৌষ্টিক নন। তাঁরাই ব্রহ্মের সবচাইতে কাছে গিয়ে তাঁকে স্পর্শ করেছিলেন।[৫০০]

ব্রহ্ম তৎ কিনা অনির্বচনীয়—জানা-অজানার বাইরে, আমাদের সমস্ত বিজ্ঞান এবং সংবিৎএর অতীত। কিন্তু তিনি বিজ্ঞানঘন,[৫০১] তাঁর বিজ্ঞান সর্বানুস্যূত। তাইতে দেবতাদের এই আত্মাভিমান এবং তৌষ্টিকতা তিনি **বিজজ্ঞৌ** জানতে পারলেন।

অধ্বরগতি একটা আবর্তে এসে আটকে গেছে। তার কুণ্ডলমোচন করতে হবে। তাই ব্রহ্ম দেবতাদের কাছে **প্রাদুর্বভূব** প্রাদুর্ভূত হলেন। এই প্রাদুর্ভাব যেন বিদ্যুৎ-ঝলকের মত[৫০২]—দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়। ছান্দোগ্যোপনিষদে একে বলা হয়েছে 'স্মর', যা আকাশেরও বাড়া। অর্থাৎ এ যেন অসীম শূন্যতায় বার-বার এক অজানার জানান দেওয়া—ঝলকে-ঝলকে।[৫০৩] তাকে যেন চিনি-চিনি মনে করি, অথচ চিনতে পারি না।

ব্রহ্মের প্রসাদে দেবতাদের হৃদয়াকাশেও এই অজানার হাতছানি বারবার ঝিলিক হানতে লাগল। কিন্তু তাঁরা ধরতে পারলেন না—**ন ব্যজানত**—এ কিসের ইঙ্গনা। তাঁদের বিজ্ঞানের অভিমান একটা ধাক্কা খেল। ভাবলেন, 'এ তো দেখছি এক **যক্ষ** বা বিচিত্র রহস্য। এ কি, তা তো জানতে হবে।'[৫০৪]

ব্রহ্ম 'যক্ষ'—বিদ্যা-অবিদ্যার ওপারে এক অগম রহস্য। এবং তিনিই 'ঈশান'। 'যক্ষ' সংজ্ঞায় তাঁর অদ্ভুত বিজ্ঞান এবং অদ্ভুত বীর্যের সমাহার। তাইতে তিনি 'মায়াবী'। সংহিতায় বরুণ মায়াবী। মায়া সেখানে বিসৃষ্টির অনুকূল প্রজ্ঞাবীর্য।[৫০৫]

দেবতারা এক অপরূপ বিস্ময়ের সামনে দাঁড়িয়ে। এক নতুন দিগন্ত তাঁদের সামনে উন্মোচিত। জানার তো শেষ নাই। আবার নতুন করে জিজ্ঞাসা জাগল তাঁদের মধ্যে। তখন

তে ঽগ্নিম্ অব্রুবন্, জাতবেদ এতদ্ বিজানীহি কিম্ এতদ্ যক্ষম্ ইতি। তথে'তি ॥ ৩

—তাঁরা অগ্নিকে বললেন, জাতবেদা, এই যক্ষ কি—এটা ভাল করে জেনে নাও তো। (অগ্নি বললেন), 'আচ্ছা'।

অনন্তের অভিমুখে আবার নতুন অভিযান। কে তার অগ্রণী হবেন? সূচনায় যিনি হয়েছিলেন, এবারও সেই **অগ্নিই**[৫০৬] হবেন।

অগ্নি পৃথিবীস্থান দেবতা—আমাদের দেহে ফুটছেন পার্থিব চেতনার তাপ এবং আলো হয়ে। দেবতাদের মধ্যে তিনি 'অবম' কিনা সবার নীচে, যেমন বিষ্ণু বা মাধ্যন্দিন সূর্য সবার উপরে।[৫০৭] অগ্নিশিখা সবসময় ঊর্ধ্বগামী—যেন সূর্যে পৌঁছতে চাইছে। আমাদের মধ্যে বৃহৎএর অভীপ্সাও এমনিতর।

অগ্নির একটি বিশিষ্ট সংজ্ঞা হল **জাতবেদাঃ**—যা-কিছু জাত, তিনি তাকে জানেন। অর্থাৎ বৃহদারণ্যকের ভাষায় তিনি সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের 'অন্তর্যামী'।[৫০৮] ঋক্‌সংহিতায় সংজ্ঞাটি একবার মাত্র সূর্যের সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়েছে। সেখানে অন্ধকারকে ছাপিয়ে ক্রমে উত্তর এবং উত্তম জ্যোতি দেখার কথা আছে।[৫০৯] এতে অগ্নিশিখার সূর্যে উত্তরণ অথবা জীবচেতনার ব্রহ্মজ্যোতিতে সমাপন্ন হওয়ার ধ্বনি আছে।

আকাশে এক যক্ষের রূপ ফুটে উঠেছে। জাতবেদা নিশ্চয় এই নবজাতকেরও অন্তরে নিহিত। অতএব তার বিজ্ঞান তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া যাবে—দেবতাদের এই আশা।

যা পেতে চাই: অভীপ্সার তীব্রসংবেগেই আমরা তা পেতে পারি। তাইতে অগ্নি

তদ্ অভ্যদ্রবৎ। তম্ অভ্যবদৎ, কো ঽসী.তি। অগ্নির্ বা. অহম্ অস্মী.ত্য.ব্রবীজ্, জাতবেদা বা অহম্ অস্মী.তি ॥ ৪

—সেই (যক্ষের দিকে) দৌড়ে চললেন (অগ্নি)। (যক্ষ) তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, 'কে বট'? (অগ্নি) বললেন, 'আমি হচ্ছি গিয়ে অগ্নি, 'আমি হচ্ছি কিনা জাতবেদা'।

অগ্নি ছুটে চলছেন, কিন্তু যক্ষ যেন তাঁকে ছাপিয়ে স্থির হয়ে আছেন।[১০] অগ্নি কিছু বলবার আগেই গহন গভীর হতে প্রশ্ন হল, কে? কাছে আসার প্রভাব অলক্ষ্যে অগ্নিতে সংক্রামিত হল। একটু গর্বের সঙ্গেই অগ্নি তাঁর আত্মপরিচয় দিলেন। যক্ষ বুঝি কৌতুকের সঙ্গে বললেন:

তস্মিংস্ ত্বয়ি কিং বীর্যম্ ইতি। অপী.দং সর্বং দহেয়ং যদ্ ইদং পৃথিব্যাম্ ইতি ॥ ৫

—'বটে? তোমাতে তাহলে কোন্ বীর্য আছে?' 'এই সব-কিছু পুড়িয়ে দিতে পারি— এই যা (আছে) পৃথিবীতে।'

যক্ষ তখন

তস্মৈ তৃণং নিদধৌ। এতদ্ দহে.তি। তদ্ উপ প্রেয়ায় সর্বজবেন। তন্ ন শশাক দগ্ধুম্। স তত এব নিববৃতে নৈ.তদ্ অশকং বিজ্ঞাতুং যদ্ এতদ্ যক্ষম্ ইতি ॥ ৬

—তাঁর সামনে একটি তৃণ রাখলেন। বললেন, 'এটা পোড়াও'। [অগ্নি] তার দিকে এগিয়ে গেলেন সমস্ত সংবেগ নিয়ে। (কিন্তু) তাকে পোড়াতে পারলেন না। ওখান থেকেই তিনি ফিরে এলেন। (দেবতাদের বললেন), 'এ তো কিছুই জানতে পারলাম না—এই যক্ষ যে কি।'

অধ্যাত্মদৃষ্টিতে উপাখ্যানটির তাৎপর্য খুবই প্রাঞ্জল। ব্রহ্ম 'তৎ', ব্রহ্ম 'যক্ষ' —অর্থাৎ এক অনির্বচনীয় রহস্য। দেবতারা তাঁর 'বিভূতি'। ব্রহ্ম আর তাঁর

বিভূতিদের মধ্যে আরেকটি তত্ত্ব আছে 'সম্ভূতি'। ঈশোপনিষদের প্রমাণে তত্ত্বের ক্রম হল অসম্ভূতি সম্ভূতি এবং বিভূতি। সবই দিব্য, সবই চিন্ময়। অধিভূত দৃষ্টিতে অসম্ভূতি মহাকাশের শূন্যতা, সম্ভূতি তাতে আদিত্যবিম্ব, আর দেবতারা—সংহিতার ভাষায় 'বিশ্বে দেবাঃ'—আদিত্যের রশ্মিজাল।[৫১১] ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ করে রশ্মিরা জীবে-জীবে নিহিত বা অনুপ্রবিষ্ট হয়।[৫১২] অতএব জীব যেমন বিশিষ্ট, তার দেবতাও তেমনি বিশিষ্ট। বিশিষ্ট দেবতাকে ধরে নির্বিশেষ ব্রহ্মে উত্তরণ—এই হল অধ্যাত্মসাধনার পরিণাম। মাঝখানে দেখা মেলে সম্ভূতির বা আদিত্যের পুঞ্জজ্যোতির। তখন সবার দেবতাই আমার দেবতা।

আবার লোকভেদে দেবতার বৈশিষ্ট্য আছে। লোক মানে আলোকের ভুবন যোগচেতনার ভূমি। মোটের উপর তিনটি লোক—পৃথিবী অন্তরিক্ষ দ্যৌঃ। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে দেহ প্রাণ এবং 'মনোজ্যোতির'[৫১৩] ভূমি। দেবতা যথাক্রমে অগ্নি বায়ু এবং আদিত্য। ইন্দ্র অন্তরিক্ষ এবং দ্যুলোকের মধ্যে সেতু। আদিত্যের ওপারে আকাশের শূন্যতা। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, এই উপাখ্যানের 'যক্ষ' ওই আকাশ, আর 'স্ত্রী' আদিত্যবিম্ব বা জৈমিনীয়োপনিষদের 'সাবিত্রী'।

সাধনার শুরু পৃথিবীতে, দেহ নিয়ে। তার শেষ আকাশে। তৈত্তিরীয়োপনিষদের ভাষায় তখন 'আকাশশরীরং ব্রহ্ম সত্যাত্ম প্রাণারামং মনআনন্দং শান্তিসমৃদ্ধম্ অমৃতম্।'[৫১৪] ব্রহ্মের তখন চারটি পর্ব: একদিকে আকাশ, সত্য, আরাম এবং আনন্দ; আরেকদিকে তারই চিদ্ঘন রূপায়ণ শরীরে আত্মায় প্রাণে এবং মনে। শান্তিসমৃদ্ধ অমৃতত্বে সবার সমাহার। লক্ষণীয়, কেনোপনিষদের উপাখ্যানে উল্লিখিত চারটি দেবতারই উদ্দেশ এখানে পাচ্ছি। তবে কিনা শরীর যখন আকাশ, অগ্নি তখন 'বৈশ্বানর'—যা তাঁর কল্যাণতম রূপ।[৫১৫] **'জাতবেদা'** অরণিদ্বয়ে নিহিত এবং মন্থনের ফলে আবির্ভূত তাঁর আদিরূপ।[৫১৬] আবার এই জাতবেদাই যে সূর্য, সেকথা একটু আগেই বলেছি। ঋকসংহিতার একটি সূক্তে বৈশ্বানর অগ্নি এবং সূর্য এক।[৫১৭] সুতরাং উপাখ্যানের জাতবেদা বৈশ্বানরেরও উপলক্ষণ বুঝতে হবে। কিন্তু সাধনার আদিপর্বের বিবৃতি বলে জাতবেদা সংজ্ঞার উপরই জোর দেওয়া হয়েছে—বৈশ্বানর তাঁর মধ্যে উহ্য।

সংহিতায় অগ্নির একটি বিশিষ্ট সংজ্ঞা হল 'তপস্বান্'।[৫১৮] এই 'তপঃ' তাঁর দাহিকাশক্তি, যা ইন্ধনকে আগুনে রূপান্তরিত করে। দেহকে অধরারণি এবং প্রণবকে উত্তরারণি করে ধ্যাননির্মন্থনের দ্বারা দেহে অগ্নির আবির্ভাব ঘটানো এবং তাকে যোগাগ্নিময় করে জরা ব্যাধি ও মৃত্যুর অতীত হওয়ার কথা

উপনিষদে আছে।[৫১৯] এই হল তপস্যা'র বা অগ্নিসাধনার চরম। সংহিতায় একে বলা হয়েছে 'সূর্যত্বক্' হওয়া ব্রাহ্মণে 'হিরণ্যশরীর' হওয়া—অঙ্গের আপ্যায়ন প্রসঙ্গে একথা আগেই বলেছি।

দেখতে পাচ্ছি, এই অধ্যাত্ম অগ্নিসাধনার দুটি অংগ—প্রণবজপ এবং ধ্যান। প্রণবজপ—বিশেষ করে প্রণবের 'উচ্চারণে' সামের ঝংকার তুলে জপ—বাকের শ্রেষ্ঠ সাধনা।[৫২০] এটি দেহে আগুন ধরিয়ে দেয়—অগ্নি বস্তুতই 'বাক্ হয়ে মুখে প্রবেশ করেন'।[৫২১] জপ হয় 'বাঙ্ময় তপঃ' বা বাঙ্ময় একটি অগ্নি-স্রোত। এই বাক্ ব্রহ্মের সঙ্গে অবিনাভূত, ব্রহ্মোপলব্ধির সাধন—ছান্দোগ্যের ব্রহ্মপুরুষ বা ঐতরেয়ের ব্রহ্মগিরি।

অগ্নি যখন বললেন, 'আমি পৃথিবীতে যা-কিছু সব দগ্ধ করতে পারি—এই আমার বীর্য', তখন তাঁর ইশারা হিরণ্যশরীরত্বের দিকে। এটি খুব বড়-রকমের সিদ্ধি হলেও চরম সিদ্ধি নয়। ছান্দোগ্যে একে বলা হয়েছে আদিত্যো-পাসকের প্রথম অমৃত পান।[৫২২] এ কেবল দিনের আলোর উপাসনার ফল। উপাসকের গতি এখানে পৃথিবীকে ছাপিয়ে নয়। অগ্নিও বললেন, আমি দগ্ধ করতে পারি **যদ্ ইদং পৃথিব্যাম্**। সুতরাং এ-সিদ্ধি জাতবেদারই সিদ্ধি—বৈশ্বানরের নয়।

যে কোনও সিদ্ধি বা বিজয় একটা আত্মাভিমান বা মহিমবোধ নিয়ে আসতে পারে। তখন তৌষ্টিকতা আসে, মনে হয় এর পর আর কিছুই নাই।

কিন্তু ব্রহ্ম যাকে বরণ করেন, তাকে তিনি থামতে দেন না। একটা ভূমি লাভ করে কিছুদিন চলে তার ঐশ্বর্যের সম্ভোগ, তার পরই জাগে নচিকেতার অতর্পণ অভীপ্সা—'হল না, আরও কিছু চাই'। যেন আমার এই আকৃতিতেই সুদূর দিগন্তে এক অনির্বচনীয়ের আভাস জাগে, তার হাতছানি আবার আমায় পথে ছোটায়। ভাবি, এতদিনে আমি যা পেয়েছি, তা-ই দিয়ে তাকে জয় করব। কিন্তু পারি না। কেন?

তার জবাব দিয়েছেন কঠোপনিষদের ঋষি। বলছেন, 'প্রবচন মেধা বা বহুশ্রুতি দিয়ে আত্মাকে পাওয়া যায় না। তাঁকে সে-ই পায়, যাকে তিনি বরণ করেন'।[৫২৩] অর্থাৎ আমার যা সিদ্ধি, বস্তুত তা তাঁর প্রসাদ। অগ্নি-সাধনায় আমি যদি হিরণ্যশরীর হয়ে থাকি, তাহলে তা হয়েছি সেই অসীমের সৌরদ্যুতি আমাতে সংক্রামিত হয়েছে বলে। আমার অরণিমন্থন প্রকাশের আবরণকে ক্ষয় করেছে মাত্র—এইটুকু আমার কৃতিত্ব। আমার তপস্যা আর তাঁর প্রসাদ দুয়ে জুড়ি মিলিয়ে সাধনার সম্যক্ সিদ্ধি। তার মধ্যে মুখ্য হল তাঁর প্রসাদ, তারই প্রয়োজনায় আমার মধ্যে তপঃশক্তির উন্মেষ।

অগ্নি একবার পরাভূত হয়েছিলেন বৃত্রের কাছে, আবার পরাভূত হলেন

যক্ষের কাছে। আত্মবীর্যে তিনি বৃত্রকে পরাভূত করেছিলেন, কিন্তু যক্ষকে পারলেন না। সমস্ত পৃথিবীকে আত্মসাৎ করেও যক্ষের উপস্থাপিত একটি তৃণকে কিছুই করতে পারলেন না।

দেহসিদ্ধির অপর্যাপ্ত প্রমাণিত হল, এইবার প্রাণসিদ্ধির পালা। তার আগে ব্রহ্মপুরুষদের সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা বলে নিই, তাহলে উপাখ্যানটি বোঝা সহজ হবে।

অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ব্রহ্মপুরুষেরা বাক্ প্রাণ মন চক্ষু এবং শ্রোত্র। এদের প্রত্যেকের একটি করে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। অর্থাৎ এরা এক বিশ্বগত চিৎশক্তির বিভিন্ন প্রকাশ। যথাক্রমে এই দেবতারা হলেন অগ্নি বায়ু ইন্দ্র (চন্দ্রমা) এবং দিক্ (আকাশ)।[১২৪] তাঁদের তিনটি লোকে ভাগ করে দেওরা যায়—অগ্নিকে পৃথিবীতে, বায়ু এবং ইন্দ্রকে অন্তরিক্ষে, সূর্য এবং দিক্‌কে দ্যুলোকে। পৃথিবী আর দ্যুলোকের মধ্যে অন্তরিক্ষ সেতুর মত। সেতুর একটি প্রান্ত ছুঁয়ে আছে পৃথিবীকে—সেখানকার দেবতা বায়ু; আরেকটি প্রান্ত ছুঁয়ে আছে দ্যুলোককে—সেখানকার দেবতা ইন্দ্র। সংহিতায় বায়ু প্রাণ, এবং ইন্দ্র 'প্রথমো মনস্বান্'[১২৫] অতএব শুদ্ধ মন। 'ইন্দ্রিয়ে'রা ইন্দ্রবীর্য ছিল, পরে দর্শনে দেখা দিয়েছে মনোবৃত্তিরূপে। বৈদিক দর্শনে মন প্রচলিত অর্থে ইন্দ্রিয় নয়—ওটি প্রাণ ও প্রজ্ঞার মাঝামাঝি। কৌষীতক্যুপনিষদে ইন্দ্র তাই 'প্রাণঃ প্রজ্ঞাত্মা'। সংহিতায় এইটি মরুত্বান্ ইন্দ্রের স্বরূপ—যিনি বৃত্রঘাতী। বৃত্রহত্যার পর তিনি আর মরুৎসহচর নন—তিনি নিঃসঙ্গ বা 'নিষ্কেবল্য' অর্থাৎ প্রশান্ত আকাশ, যাতে চিন্ময় প্রাণের ঝড়ও নাই।

ব্রহ্ম ঔপনিষদ পুরুষ। ছান্দোগ্যে তাঁর বর্ণনা, তিনি 'অন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষ', তাঁর যেমন আছে শুক্ল ভাতি, তেমনি আছে পরঃকৃষ্ণ নীলিমা।[১২৬] অধিভূতদৃষ্টিতে তিনি আদিত্য এবং তাঁকে ছাপিয়ে আকাশ। আদিত্য দ্যুস্থান, আকাশও তা-ই। আদিত্যরূপে তিনি 'চক্ষুষ্য' এবং আকাশ-রূপে 'শ্রুত'।[১২৭] সংহিতার মরমীয়া ভাষায় তিনি 'স্বর্ বৃহৎ' অর্থাৎ বৃহৎ জ্যোতি এবং বৃহৎ সাম দুইই।[১২৮] আলোকে ছাপিয়ে সুর। আলো আদিত্যে, সুর আকাশে। পুরাণকার বলবেন, যেন কৃষ্ণের বাঁশির সুর। উপাখ্যানে যক্ষ আকাশ, আর স্ত্রী তাঁরই বহু'শোভমানা' শুক্লভাতি।

অতএব ব্রহ্মপুরুষদের বেলায় বাক্ প্রাণ ও মনের পর চক্ষু এবং শ্রোত্রের ব্যাপার। অবশ্য এ প্রাকৃত চক্ষু-শ্রোত্র নয়—এরা মনের ওপারে দিব্যচক্ষু এবং দিব্যশ্রুতি। তখন মরমীয়ার চিন্ময় প্রত্যক্ষ। ব্রহ্মের এষণা শুরু হয় বাক্ দিয়ে, তাঁর বাচক প্রণবের জপ দিয়ে। কিন্তু যতক্ষণ পৃথিবীকে ছাড়িয়ে যেতে না পারছি, ততক্ষণ ব্রহ্মকে পাওরা যাবে না। পার্থিব ঋদ্ধিই ব্রহ্মপ্রাপ্তি নয়।

প্রাণ এসে বাক্‌কে সমৃদ্ধ করে। কিন্তু সে-প্রাণও পৃথিবী-ঘেঁষা, ব্রহ্ম, তার কাছেও ধরা দেন না। অবশেষে ধরা দেন দ্যুলোক-ঘেঁষা প্রজ্ঞাত্মক প্রাণের কাছে বা শুদ্ধ-মনের কাছে। সেই মন ব্রহ্মকে দেখে বৃহৎ জ্যোতীরূপে এবং তাতেই অবগাহন করে তাঁকে শোনে বৃহৎসামরূপে।

উপাখ্যানটিতে অধ্যাত্ম এবং আধিদৈবত দৃষ্টিতে ব্রহ্মপুরুষদের একটা সুনিরূপিত পরম্পরা আছে—এইটি লক্ষণীয়।

অগ্নি ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেন যক্ষের কাছ থেকে। দেবতারা

অথ ৱায়ুম্ অব্রুবন্। ৱায়ৱ্ এতদ্ ৱিজানীহি কিম্ এতদ্ য়ক্ষম্ ইতি। তথে-তি ॥ ৭

তদ্ অভ্যদ্রৱৎ। তম্ অভ্যৱদৎ, কোঽসী তি। ৱায়ুর্ ৱা অহম্ অস্মী-ত্য- ব্রবীন্ মাতরিশ্বা ৱা- অহম্ অস্মী-তি ॥ ৮

তস্মিংস্ ত্বয়ি কিং ৱীর্য'ম্ ইতি। অপী-দং সর্ব'ম্ আদদীয়ং য়দ্ ইদং পৃথিৱ্যাম্ ইতি ॥ ৯

তস্মৈ তৃণং নিদধৌ। এতদ্ আদৎস্বে তি। তদ্ উপপ্রেয়ায় সর্বজবেন, তন্ ন শশাকা-দাতুম্, স তত এৱ নিৱৱৃতে। নৈ-তদ্ অশকং ৱিজ্ঞাতুং য়দ্ এতদ্ য়ক্ষম্ ইতি ॥ ১০

—তখন বায়ুকে বললেন, 'বায়ু, এই যক্ষ কি—এটা ভাল করে জেনে নাও তো'। (বায়ু বললেন), 'আচ্ছা'।

সেই (যক্ষের) দিকে দৌড়ে চললেন (বায়ু)। (যক্ষ) তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, 'কে বটে ?' (বায়ু) বললেন, 'আমি হচ্ছি গিয়ে বায়ু। আমি হচ্ছি কিনা মাতরিশ্বা'।

'বটে ? তোমাতে তাহলে কোন্ বীর্য আছে ?' 'এই সব-কিছু গ্রাস করতে পারি—এ যা (আছে) পৃথিবীতে'।

(যক্ষ) তাঁর সামনে একটি তৃণ রাখলেন। বললেন, 'এটা গ্রাস কর'। (বায়ু) তার দিকে এগিয়ে গেলেন সমস্ত সংবেগ নিয়ে। (কিন্তু) তাকে গ্রাস করতে পারলেন না। ওখান থেকেই তিনি ফিরে এলেন। (দেবতাদের বললেন), 'এ তো কিছুই জানতে পারলাম না—এই যক্ষ যে কি'।

ব্রহ্মবিজিজ্ঞাসা আরেক ধাপ এগিয়ে গেল। অগ্নির পর বায়ুকে দিয়ে ব্রহ্মকে জানা। বায়ু অন্তরিক্ষস্থান দেবতা, সুতরাং অগ্নির একধাপ উজানে। কিন্তু তবুও তিনি পৃথিবী-ঘেঁষা। অগ্নির সঙ্গে তাঁর প্রধান পার্থক্য—অগ্নি মর্ত', কিন্তু বায়ু অমর্ত'।[১২৭] অধ্যাত্মদৃষ্টিতে অগ্নির অধিষ্ঠান দেহ,

আর বায়ুর অধিষ্ঠান প্রাণ। অগ্নির অনুভব তাপরূপে, জ্যোতীরূপে—দেহে যা 'ব্রহ্মবর্চঃ'। আর বায়ুর অনুভব অমূর্ত স্পর্শরূপে। ধ্যানে দেহের মধ্যে নাড়ীর ভিতর দিয়ে প্রাণের স্রোত ঊর্ধ্ববাহী হয়। অগ্নিসম্পর্কে এই স্রোতের অনুভব তরল তাপের—বেদে যার পারিভাষিক সংজ্ঞা 'দ্রবিণ'। অগ্নি তখন 'দ্রবিণোদাঃ'। মন আরও গভীরে ডুবলে নাড়ীতে বইতে থাকে অমূর্ত স্পর্শের স্রোত—দেহের ঘনত্ববোধও বিলুপ্ত হয়ে যায়। নাড়ীদের পারিভাষিক সংজ্ঞা তখন 'নিয়ুৎ'। সংহিতায় শব্দটি প্রায়ই বহুবচনান্ত এবং নিয়ুৎএরা বায়ুর বাহন।

ছান্দোগ্যোপনিষদে ঋষি রৈক্ব বায়ুকে এবং প্রাণকে বলেছেন 'সংবর্গ' কিনা লয়স্থান।[৫৩০] আমরা যা-কিছু চোখে দেখি—যেমন অগ্নি সূর্য চন্দ্র এবং অপ্ (এঁরা সবাই দেবতা)—তা মিলিয়ে যায় অরূপ বায়ুতে। তেমনি সুষুপ্তিতে বাক্ চক্ষু শ্রোত্র এবং মন সব লীন হয় প্রাণে। বায়ু এবং প্রাণ সর্বগ্রাসী। উপনিষদের 'আদান' বোঝাচ্ছে 'হাঁ করা', 'গ্রাস করা'।[৫৩১]

বায়ু অদৃশ্য, কিন্তু তবুও সংহিতায় তাঁর একটি বিশেষণ 'দর্শত'।[৫৩২] অবশ্য এ-দর্শন যোগজ-সন্নিকর্ষমূলক—আরোহক্রমে স্পর্শের মধ্যে রূপের সূক্ষ্ম সংবিৎএর অনুভব। এই অনুভব চরমে ওঠে মরুদ্‌গণে, যাঁরা বায়ুরই আরেক রূপ। মরুদ্‌গণ বিশ্বপ্রাণ—সপ্তলোকে 'প্রাণা গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত'।[৫৩৩] নামের অর্থ 'আলো-ঝলমল'। বৃত্রবধে জ্যোতির্ময় মরুদ্‌গণ ইন্দ্রের নিত্যসহচর, কিন্তু নিষ্কেবল্য ইন্দ্রে তাঁরা তল্লীন। ঐতরেয়োপনিষৎ-প্রসঙ্গে নিষ্কেবল্য ইন্দ্রের বিষয় আলোচিত হয়েছে। এই ইন্দ্র আর যক্ষ একই তত্ত্ব। সুতরাং মরুদ্‌গণ বা বিশ্বপ্রাণ ব্রহ্মের অবর তত্ত্ব। অবর তত্ত্ব পরম তত্ত্বের সূচকই হতে পারে, কিন্তু তাকে প্রকাশ করতে পারে না। তাই বায়ু মরুদ্‌গণ হয়েও ব্রহ্মের প্রকাশক নন।

বায়ুর চরম উৎকর্ষ **মাতরিশ্বাতে**। তিনি প্রাণের আদিরূপ। এখানে অগ্নির মত বায়ুও তাঁর এই রূপের কথা যক্ষের কাছে বলছেন—একটু গর্বের সঙ্গেই। সংহিতায় মাতরিশ্বার পরিচয়—'মাতরিশ্বা যদ্ অমিমীত মাতরি'—মাতরিশ্বা তিনি, যিনি মায়ের মধ্যে রূপ নেন।[৫৩৪] মাতা আদিমাতা অদিতি। মাতরিশ্বা বা বিশ্বপ্রাণ মাতার মধ্যে প্রশান্ত সমুদ্রের বুকে ঢেউএর মত ফুলে ওঠেন। ছান্দোগ্যের ভাষায় এই হল ব্রহ্ম-'ক্ষোভ'।[৫৩৫] ক্ষোভ ব্রহ্মের সম্ভূতি, তিনি স্বয়ং ক্ষোভের ঊর্ধ্বে। তাই মাতরিশ্বা হয়েও ব্রহ্মকে নিঃশেষে জানা বা পাওয়া যায় না।

অধ্যাত্মদৃষ্টিতে কথাটা এই। বায়ু প্রাণ, ব্রহ্ম প্রজ্ঞান। প্রাণ ও প্রজ্ঞা সহচরিত হলেও প্রাণ প্রজ্ঞাসম্ভূত। প্রাণ প্রজ্ঞার স্পন্দন, সুতরাং প্রাণে প্রজ্ঞা

অনুস্যূত। কিন্তু প্রাণ যখন নিস্পন্দ, তখন সে প্রজ্ঞাতে নিমেষিত। প্রজ্ঞা তখনও অনিমেষ। এই অনিমেষদশার বর্ণনা সংহিতায় পাই ঃ সেখানে মৃত্যু নাই অমৃত নাই, সেখানে রাত্রি বা দিনের কোনও নিশানা নাই, সেখানে 'আনীদ্ অবাতং স্বধয়া তদ্ একম্'—সেই এক আপনাতে আপনি থেকে বাতাস ছাড়াই নিঃশ্বাস ফেললেন।[৫৩৬]

বাক্ এবং প্রাণের অধিকার বহুদূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত। এরা ব্রহ্মের দিকে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু তবুও এরা তাঁর দ্বারপাল। ব্রহ্মতত্ত্বের ভিতরে ঢোকবার সামর্থ্য এদের নাই। এদের মহিমা ব্রহ্মের আবেশে। তাইতে এরা ব্রহ্মকল্প হয়ে উঠতে পারে। বাক্ তখন ব্রহ্মের সঙ্গে অবিনাভূত, প্রাণ প্রজ্ঞাত্মক। তবুও এরা ব্রহ্মসম্ভূত—ব্রহ্ম নয়। এদের ধরে ব্রহ্মের দিকে যাওয়া হল পুরুষার্থ ; কিন্তু ব্রহ্মকে পাওয়া যায় ব্রহ্মের প্রসাদেই। শুকতারা সূর্যের সূচনা আনে, কিন্তু তার দীপ্তি সূর্যেরই দীপ্তি। সূর্যোদয়ে সে দীপ্তি সূর্যে মিলিয়ে যায়। এমনি করে বৈবস্বত মৃত্যুতে বা আলোর মরণেই ব্রহ্মপুরুষদের সার্থকতা।

দুটি ব্রহ্মপুরুষের পরাভব বর্ণিত হল। এর পর ডাক পড়ল মনের—যার দেবতা এখানে 'ইন্দ্র'। বিকল্পে মনের দেবতা 'চন্দ্রমা' ; মন তখন দিব্যমন নয়, পার্থিব মন—চন্দ্রকলার মতই তার হ্রাস-বৃদ্ধি আছে। ইন্দ্র আদি-মন—'প্রথমো মনস্বান্', সংহিতার ভাষায় 'চিকিত্বিন্মনঃ' বা 'বোধিন্মনঃ'। অগ্নি আর বায়ুতে পৃথিবীর ছোঁয়াচ ছিল। ব্রহ্মসন্ধিৎসু হলেও ঋভুদের মতই তাঁদের গায়ে যেন মনুষ্যগন্ধ।[৫৩৭] কিন্তু ইন্দ্র দ্যুলোক-ঘেঁষা। এই ভূমিতে উপাসকের মন ছান্দোগ্যের ভাষায় 'দৈবং চক্ষুঃ'।[৫৩৮]

দেবতারা

অথেন্দ্রম্ অব্রুবন্। মঘবন্ন্ এতদ্ বিজানীহি কিম্ এতদ্ যক্ষম্ ইতি। তথেতি। তদ্ অভ্যদ্রবৎ। তস্মাৎ তিরোদধে॥ ১১

স তস্মিন্ন্ এবাকাশে স্ত্রিয়ম্ আজগাম বহুশোভমানাম্ উমাং হৈমবতীম্। তাং হোবাচ, কিম্ এতদ্ যক্ষম্ ইতি॥ ১২

—তখন (তাঁরা) ইন্দ্রকে বললেন, 'মঘবা, এই যক্ষ কি—এটা ভাল করে জেনে নাও তো'। (ইন্দ্র বললেন), 'আচ্ছা'। সেই (যক্ষের) দিকে তিনি দৌড়ে চললেন। তাঁর কাছ থেকে (যক্ষ) তিরোহিত হয়ে গেলেন।

তিনি সেই আকাশেই এক স্ত্রীর দেখা পেলেন—(তিনি) বহুশোভমানা উমা হৈমবতী। তাঁকে বললেন, 'এই যক্ষ কি'?

সংহিতায় ইন্দ্র একাধারে সাধ্য এবং সাধন দুইই। সাধ্যরূপে তিনি পরমদেবতা—নিষ্কেবল্য বা অসঙ্গ আকাশ তাঁর স্বরূপ। যখন সাধন, তখন তিনি 'বজ্রী' বা ওজঃশক্তির সেই পরিণাম, যা আকাশের শূন্যতা হতে নেমে এসে আধারে প্রাণ ও প্রজ্ঞার অবরোধকে বিদীর্ণ করে। সংহিতায় এটিকে মেঘ বিদীর্ণ করে জল ঝরানো বা আঁধার সরিয়ে আলো ফোটানোর ছবি এঁকে বর্ণনা করা হয়েছে। 'আকাশ থেকে বজ্র' এই নিগূঢ় সংকেতটি এখনও বৌদ্ধসাধনায় টিকে আছে—সেখানে 'শূন্যতা বজ্র উচ্যতে'। বেদের ভাষায় যিনি 'নিষ্কেবল্য' বা আকাশের মত শূন্য, তিনিই 'মরুত্বান্' এবং বজ্রী। তাঁর শূন্যতাই সাধনবীর্য।

আগেই বলেছি,[৫৩৯] জৈমিনীয়োপনিষদে ইন্দ্র সংহিতার মত সাধ্য এবং সাধন দুইই—বরং সেখানে তাঁর সাধ্যরূপের উপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। কেনোপনিষদে ইন্দ্রকে দেখা হয়েছে সাধনদৃষ্টিতে—যদিও তাঁর সাধ্যরূপটি এইসঙ্গে অন্বিত। তাইতে এখানে যক্ষ স্ত্রী এবং ইন্দ্র এই তিনটি তত্ত্ব পরস্পরের অবিরোধে ওতপ্রোত হয়ে আছে। ইন্দ্র যক্ষের অভিমুখে ছুটে যেতেই যক্ষ মিলিয়ে গেলেন—রইল কেবল আকাশ। ইন্দ্র 'প্রথম মন'—তাঁর একদিক যেমন বিসৃষ্টিতে অনুবৃত্ত, তেমনি আরেকদিক ছুঁয়ে আছে বিসৃষ্টির অতীত অসম্ভূতি বা শূন্যতাকে। সেই শূন্যতাতেই অনির্বচনীয়ের আবির্ভাব দেবতাদের বিজিজ্ঞাসাকে উদ্রিক্ত করেছিল। মনের মোড় সেইদিকে ফিরতেই সব ফাঁকা হয়ে গেল। কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর সেই শূন্যতাকে আপূরিত করে দেখা দিল এক বহুধাবিকীর্ণ **শুভ্রতা**—যেন মহাশূন্যে আদিত্যের দ্যুতি ঝলসে উঠল। ইন্দ্র 'দেবী'কে 'দেখলেন'। শুধু দেখাই নয়, দেবী তাঁর সঙ্গে কথা কইলেন, ইন্দ্র তাঁকে 'শুনলেন'। এবং আখ্যায়িকার পরের খন্ডেই আছে, শুনে ইন্দ্র 'ব্রহ্মবিৎ হলেন'।

এই 'দেখা' এবং 'শোনা' হল 'প্রথম মনের' দেখা আর শোনা—সাধনাঙ্গ 'বাক্' এবং 'প্রাণ'কে ছাপিয়ে আকাশে গিয়ে আকাশ হয়ে। মন যা দেখল তা লৌকিক রূপ নয়, যা শুনল তা লৌকিক বাক্ নয়; সে নিজেও লৌকিক মন নয়। ঋষি একথা প্রথমেই বলেছিলেন, 'ন তত্র চক্ষুর্ গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ'।[৫৪০]

অগ্নি এবং বায়ুর মত ইন্দ্রের বিশিষ্ট পরিচয় হল **মঘবা**। এই সংজ্ঞাটি ঋক্‌সংহিতায় ইন্দ্রে নিরূঢ়—অর্থ যিনি 'মহান্, জ্যোতির্ময় শক্তিময়'—এককথায় মহিমময়।

ইন্দ্র যাঁকে আকাশে দেখলেন, তিনি **হৈমবতী** বা তুষারকন্যা সরস্বতীর ধারা—যিনি প্রাণ ও প্রজ্ঞার যুগ্মপ্রবাহ। তাঁর পটভূমিকা আকাশের মহাশূন্যতা। তাঁরই কাছে ইন্দ্র শুনলেন 'যক্ষে'র কথা—যিনি একাধারে আকাশ এবং প্রাণ।

যক্ষের আকাশ-স্বরূপ সূচিত হয়েছে তাঁর তিরোধানে। এই আকাশের কথা আগেই বলেছি।[৫৪১] আর তিনি যে প্রাণ, তা পেয়েছি জৈমিনীয়োপনিষদে।[৫৪২] উপনিষদে আকাশ আর প্রাণ ব্রহ্মের অন্যোন্যসম্পৃক্ত দুটি বিভাব—আকাশ তাঁর অধিষ্ঠান, আর প্রাণ তাঁর স্ফুরত্তা (dynamic)। অধিভূতদৃষ্টিতে যা আকাশ, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তা-ই প্রজ্ঞা। মনের আকাশ হয়ে যাওয়া প্রজ্ঞানের লক্ষণ।

দেখতে পাচ্ছি, ইন্দ্র যেমন প্রাণ ও প্রজ্ঞার মিথুন, হৈমবতীও তা-ই. যক্ষও তা-ই। তিনের একই তত্ত্ব। তিনটিতে যেন গোতম রাহূগণের ভাষায় অদিতির ত্রিধামূর্তি—'অদিতির্ মাতা স পিতা স পুত্রঃ'।[৫৪৩] যক্ষ পিতা, হৈমবতী মাতা, ইন্দ্র পুত্র।[৫৪৪]

এইবার ব্রহ্মপুরুষদের দিক থেকে আখ্যায়িকাটিকে দেখা যাক, তাহলে তার অধ্যাত্মব্যঞ্জনা আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে।

বেদের সাধনা মুখ্যত বাকের সাধনা, মন্ত্রের সাধনা। এই সাধনার চরমে বাক্ এবং ব্রহ্ম একাকার।[৫৪৫] কিন্তু মনুষ্যোদিত 'তুরীয়া বাক্' দিয়ে সাধনা শুরু করলেও যেপর্যন্ত তার গুহাহিত পদগুলি আবিষ্কৃত না হয়, সেপর্যন্ত বাক্ 'অপুষ্পা এবং অফলা'।[৫৪৬] পরমব্যোমে যে অক্ষর, যাতে বিশ্বদেবেরা নিষণ্ণ রয়েছেন, তাতেই সমস্ত ঋকের পর্যবসান ; তাকে যে না বোঝে, ঋক্ দিয়ে সে কি করবে ? সে তো উক্‌থশংসনকারী জল্পক মাত্র, তার দুচোখ কুয়াসায় ঢাকা।[৫৪৭] অতএব এই বৈখরী বাকের সাধনায় আমরা কখনও ব্রহ্মকে পাব না।

বৈখরী বাক্ নিষ্প্রাণ। সপ্রাণ হলে সে হয় মাধ্যমিকা বাক্। তখন বাক্‌কে আহুতি দিতে হয় প্রাণে। প্রাণনের এবং অপাননের ক্রিয়ায় তখন বাকের সূক্ষ্ম উচ্চারণ। কৌষীতক্যুপনিষদে একে বলা হয়েছে প্রতর্দনের আবিষ্কৃত 'সাংযমন' নামে আন্তর অগ্নিহোত্র।[৫৪৮] বৃহদারণ্যকে একে বলা হয়েছে মধ্যম প্রাণ বা বায়ুর উপাসনারূপ 'একব্রত'।[৫৪৯]

কিন্তু প্রাণ আন্তরিক্ষের তত্ত্ব। অন্তরিক্ষ একদিকে ছুঁয়ে আছে পৃথিবীকে, আরেকদিকে দ্যুলোককে। দ্যুলোক প্রজ্ঞানের ভূমি। প্রাণ যদি প্রজ্ঞাযুক্ত না হয়, তাহলে সেও আমাদের ব্রহ্মে পেঁাছিয়ে দিতে পারবে না।

প্রজ্ঞাত্মক প্রাণ হলেন ইন্দ্র, যিনি 'প্রথমো মনস্বান্'। ইনি শুদ্ধমন—সংহিতায় 'চিত্তি' বা 'বোধি'। এই উপনিষদে তা-ই হল 'প্রতিবোধবিদিত মনন'—যা দিয়ে ব্রহ্মকে পাওয়া যায়।

এই মনের আছে দিব্যচক্ষু এবং দিব্যশ্রোত্র—সংহিতায় যাদের বলা হয়েছে 'চক্ষঃ' এবং 'শ্রবঃ'। মন এই চক্ষু দিয়ে দেখল আদিত্যের শুক্র ভাতিকে, শুনল তারও উজানে আকাশের পরঃকৃষ্ণ নীলিমাকে। যা দেখল তা যেমন 'স্বর্',

তেমনি যা শুনল তাও 'স্বর্'। দুটিতে মিলে আলোর সুর। এই হল 'ওম্ ইত্যে৽তদ্ অক্ষরম্ উদ্গীথঃ'।[৫৫০] সামবেদের এই রহস্য। আর তাতেই পাঁচটি ব্রহ্মপুরুষের তর্পণ।

এইবার আখ্যায়িকার প্রধান পাত্র-পাত্রী 'যক্ষ' ও 'স্ত্রী'র সম্পর্কে কিছু আলোচনা করে এই বিবৃতি শেষ করা যাক। আগে স্ত্রীর কথা বলি।[৫৫১]

যক্ষের আবির্ভাব এবং ইন্দ্রের কাছে তাঁর তিরোধান এক মহাশূন্যতায় বা আকাশে। যতক্ষণ যক্ষ ছিলেন, ততক্ষণ ওই আকাশে রহস্যময় একটা-কিছুর আভাস ছিল। এর পর আর কিছুই থাকল না – এক পরঃকৃষ্ণ নীলে সব ছেয়ে গেল। ইন্দ্র সেই আকাশ ভেঙে চলছেন। চলতে-চলতে আজগাম এসে পড়লেন এক স্ত্রীর সামনে। এ-স্ত্রী যেন নিষুতি রাতের আঁধারকে তরল-করা মহীয়মানা 'দিবো দুহিতা' ঊষার মত।[৫৫২]

ঊষার উপমা এখানে নানাদিক দিয়ে সার্থক। আগেই দেখেছি, কেনোপনিষদের উপক্রম গায়ত্রসামের উপনিষৎ দিয়ে, আর তার উপসংহার সাবিত্রীর তত্ত্ব দিয়ে। সমস্ত উপনিষৎটি গায়ত্রী এবং সাবিত্রীর প্রসাদ। গায়ত্রী অগ্নির ছন্দ, অগ্নি 'উষর্বুৎ' কিনা ঊষায় জাগেন। আর সাবিত্রী সবিতার সেই দীপ্তি, যা প্রাচীমূল থেকে একটা উদ্ভাসরূপে মধ্যগগন পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে দেবযানের পথকে আলোকিত করে তোলে। যাস্ক বলেন, তখন দ্যুলোক 'অপহততমস্ক এবং কীর্ণরশ্মি' হয়, কিন্তু সূর্যোদয় হয়নি বলে পৃথিবীতে অন্ধকার থাকে।[৫৫৩] ঊষার পর সবিতা। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে, সাধনজীবনের ঊষায় হৃদয়ে অভীপ্সার আগুন জ্বলে উঠেছে, দেবতার প্রসাদে মূর্ধন্য চেতনায় অলখের আলো এসে পড়েছে, কিন্তু মর্তচেতনার ঘোর তখনও কাটেনি। উপাখ্যানেরও প্রথম অংশে আমরা এই ছবিই পাই।

ঐন্দ্রচেতনার মহাকাশে অলখের আলোর এই প্রথম ঝলক এক দিব্য স্ত্রী-সংস্থানরূপে। যেমন যক্ষ অনির্বচনীয়, তেমনি এই স্ত্রীও। তাঁর রূপ আছে কিন্তু আকৃতি নাই, সংবিৎ আছে কিন্তু সংজ্ঞা নাই। ছান্দোগ্যে আকাশকে বলা হয়েছে 'নাম-রূপের নির্বাহক'।[৫৫৪] এই স্ত্রী সেই আদি নাম-রূপ — অম্ভৃণকন্যার ভাষায় 'দ্যুলোক-ভূলোক ছাপিয়ে সেই মহাসম্ভূতি যা বিশ্বভুবন-বিসৃষ্টির ঝড়রূপে বইছে'।[৫৫৫] এমনিতর এক স্ত্রীর অনুভবের কথা বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন সৃষ্টিপ্রকরণের আদিতে ঃ 'তাইতে আমরা একেকজন ডা'লের আধখানার মত। তাইতো এ-আকাশ পূর্ণ হয়েই আছে স্ত্রীকে দিয়ে'।[৫৫৬] নাসদীয়সূক্তের ভাষায় এ 'একং তৎ'এর অবাত নিঃশ্বসিত

অথবা 'মনসঃ প্রথমং রেতঃ'-রূপী আদিকাম, অসৎএর বুকে লগ্নবৃন্ত সৎএর ফুল।[৫৫৭]

উষার উদ্‌ভাস ধীরে ধীরে 'বৃহদ্দিবা'র[৫৫৮] জ্যোতির্ময় প্রভাসে রূপান্তরিত হল। ইন্দ্র স্ত্রীকে দেখলেন **বহুশোভমানা**—দিকে-দিকে ঠিকরে পড়ছে তাঁর শুভ্র জ্যোতি। তাঁর এই শোভা বা শুভ্রতার একটি পারিভাষিক সংজ্ঞা আছে সংহিতায়—'শুভ্‌'। মরুদ্‌গণ বিশ্বপ্রাণের আলোকঝঞ্ঝা—তাঁরা সবসময় ছুটে চলেছেন 'শুভে কম্‌'—এক অনির্বচনীয় শুভ্রতার দিকে।[৫৫৯] অন্তরিক্ষের ঝড় পেঁছিয় দ্যুলোকে, দ্যুলোক ছাপিয়ে 'স্বর্‌'লোকে…'নাকে'।[৫৬০] 'শুভ্‌' আর 'স্বর্‌' একই কথা। 'স্বর্‌' আদিত্যের আলো আর আকাশের সুর দুইই। দেবী সাবিত্রী এবং গায়ত্রী।

স্বর্‌ আলো, 'নাক' আনন্দ।[৫৬১] দেবী চিন্ময়ী, দেবী আনন্দময়ী। তাঁর আনন্দ ইন্দ্রের উপর ঝরে পড়ল প্রসাদরূপে, মমতার কবচ হয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরল। তাইতে তিনি হলেন **উমা**। 'উমা' এখানে সংজ্ঞাশব্দ নয়, 'বহু-শোভামানা'র মতই 'স্ত্রী'র বিশেষণ—এ নিয়ে বিচার পরে করছি। বেদে এটি সংজ্ঞাশব্দরূপে ব্যবহৃত হয়েছে একমাত্র তৈত্তিরীয়ারণ্যকে—রুদ্রকে সেখানে বলা হয়েছে অম্বিকাপতি এবং উমাপতি।[৫৬২] তৈত্তিরীয়সংহিতায় কিন্তু 'অম্বিকা' রুদ্রের বোন—রুদ্রের সঙ্গে তাঁর সমান যজ্ঞভাগ।[৫৬৩] যিনি বোন তিনিই আবার প্রিয়া, এটি অর্ধনারীশ্বরভাবনার রকমফের—এক বোঁটায় জোড়াফুলের মত। সংহিতায় এর আরও উদাহরণ আছে।[৫৬৪] পুরাণে উমা রীতিমত শিবপত্নী কুমারজননী। 'উমা'র সম্ভাবিত ব্যুৎপত্তি অব্‌ ধাতু হতে। সমব্যুৎপন্ন দুটি শব্দ 'অবঃ' এবং 'ঊতি' সংহিতায় বহুপ্রযুক্ত—বোঝায় যথাক্রমে দেবতার প্রসাদ এবং পরিরক্ষণ। একটি 'যোগ', আরেকটি 'ক্ষেম'।[৫৬৫] দেবী দুয়েরই ঈশানী বলে 'উমা'।

তারপর বহুশোভমানা দেবীর আলোর প্রসাদ এবং শক্তি যেন প্রজ্ঞানের তুঙ্গশৃঙ্গ হতে তুষার-গলা প্রাণের স্রোত হয়ে নেমে এল। দেবী হলেন **হৈমবতী**। এটিও একটি বিশেষণ, সংজ্ঞাশব্দ নয়। এর প্রয়োগ পাওয়া যায় শৌনকসংহিতার একটি অপ্‌সূক্তে, যার প্রথমেই আছে 'শং ত আপো হৈমবতীঃ শম্‌ উ তে সন্তু‌ৎস্যাঃ'।[৫৬৬] পাণিনির মতে এটি হিমবৎ-শব্দের পর তত্র-ভবার্থে অণ্‌প্রত্যয়নিষ্পন্ন।[৫৬৭] প্রত্যয়টি অপত্যার্থক নয়—এটি লক্ষণীয়। হিমবৎ-পর্বতের কথা ঋক্‌সংহিতাতেই আছে ঃ 'যস্যে·মে হিমবন্তো মহিত্বা'—এই এরা হিমবন্ত হয়েছে যে-হিরণ্যগর্ভের মহিমায়।[৫৬৮] বর্ণনা প্রত্যক্ষদর্শীর, নইলে 'ইমে' বলা হত না। হৈমবতী নদীর আরেকটি বর্ণনা পাই বৃহদারণ্যকের গার্গী-যাজ্ঞবল্ক্যসংবাদে ঃ 'এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোঽন্যা

নদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্বতেভ্যঃ, প্রতীচ্যোহন্যা, য়াং য়াং চ দিশম্ অনু'।[৫৬৯] বিদেহের উত্তরেও হিমবৎপর্বতের তুষারশৃঙ্গ আছে। তবে মনে হয়, বর্ণনাটি সমগ্র হিমবৎপ্রস্থের।

একটি হৈমবতী নদী বৈদিক ভাবনায় প্রভাস্বর হয়ে আছে—সে হল 'সরস্বতী'। সরস্বতী নদীও বটে, দেবতাও বটে। 'একা.চেতৎ সরস্বতী নদীনাং শুচির্ য়তী গিরিভ্য আ সমুদ্রাৎ··ঘৃতং পয়ো দুদুহে'—একা সরস্বতীই চেতনাময়ী নদীদের মধ্যে শুচি হয়ে নেমে আসেন পৃথিবীর গিরিশিখর আর তারও উজানে অন্তরিক্ষের সমুদ্র হতে; বিচিত্র ভুবনের বিচিত্র সংবেগের চেতনা তাঁর মধ্যে, জ্যোতির্ময় আপ্যায়নের ধারা তিনি দোহন করেছেন নহুষতনয়ের জন্য।[৫৭০] সরস্বতীর শুভ্র ধারাই প্রজ্ঞা বাক্ আর প্রাণের হৈমবতী ধারা। এই ধারা পবমান সোমের সেই অমৃতরস, যা আদিপ্রাণ মাতরিশ্বার দ্বারা আস্বাদিত এবং ঋষিদের হৃদয়ে সম্ভৃত সারস্বত প্রসাদ।[৫৭১]

ইন্দ্রচেতনায় যক্ষের তিরোভাব আর দেবীর আবির্ভাব যেন হিমবৎপ্রস্থে সূর্যোদয়ের একখানি ছবি।

এইবার 'উমা'কে সংজ্ঞাশব্দ ধরে তার ঐতিহাসিক বিচারে আসা যাক।

আগেই বলেছি, বেদে একবার মাত্র সংজ্ঞারূপে 'উমা' শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায় তৈত্তিরীয়ারণ্যকের খিলাংশে। সেখানে রুদ্র 'উমাপতি' এবং 'অম্বিকাপতি'। কিন্তু তৈত্তিরীয়সংহিতায় 'অম্বিকা' রুদ্রের বোন। 'রুদ্র' 'অম্বিকা' এগুলি সংজ্ঞাশব্দ হলেও 'ডিত্থ' 'ডবিত্থে'র মত অর্থহীন নয়। বৈদিক দেবতাদের কোনও সংজ্ঞাই তা নয়। সংজ্ঞাগুলি দেবতার পরিচায়ক বিশেষণ—অনেকক্ষেত্রেই তাদের নিরুক্তি আছে। যেখানে নিরুক্তি অসম্ভাবিত, সেখানেও তারা নিরর্থক নয়। 'রুদ্রে'র নিরুক্তিলভ্য অর্থ আছে 'অম্বিকা'র নিরুক্তি কি তা না জানা গেলেও 'মা' অর্থে যজুঃসংহিতায় তার অনেক ব্যবহার আছে। মূল 'অম্বা' বা 'অম্বী' ঋক্সংহিতায় বিশেষ করে ব্যবহার করা হয়েছে 'সরস্বতী' সম্পর্কে, যাঁর মাতৃরূপের অনন্য বর্ণনা ওই সংহিতাতেই পাওয়া যায়।[৫৭২]

তৈত্তিরীয়ারণ্যকে 'উমা' অম্বিকা অর্থাৎ 'বৃহদ্দিবা' বা 'অদিতি'র মতই[৫৭৩] বিশ্বের জননী। কিন্তু শব্দটির ব্যুৎপত্তি কি?

ঋক্সংহিতায় অব্ ধাতু হতে নিষ্পন্ন একটি শব্দ আছে 'উম'। শব্দটি দেবতাদের বহুপ্রযুক্ত বিশেষণ।[৫৭৪] বেদে অব্ ধাতুর অজস্র প্রয়োগ আছে—দেবতার সঙ্গে উপাসকের নিবিড় সম্পর্ক বোঝাতে। অর্থ 'প্রসন্ন বা অনুকূল হওয়া', 'আগলে থাকা'। প্রথম অর্থে ক্লীবলিঙ্গ 'অবঃ' এবং দ্বিতীয় অর্থে স্ত্রীলিঙ্গ 'ঊতি' শব্দের প্রয়োগও প্রচুর। 'প্রসাদ' বোঝাতে 'ওমন্' শব্দের

ব্যবহারও আছে কয়েক জায়গায়।[৫৭৫] সংহিতায় আকাশে 'ব্র্যোমন্'। আসলে তা 'রি-ওমন্' অর্থাৎ দেবতার বিশেষ আনুকূল্য, তাঁর অনিবাধ বৈপুল্যের প্রসাদ এবং পরিরক্ষণ—যেন তিনি প্রসন্ন আকাশ হয়ে পরম মমতায় আমাদের উপর নুয়ে পড়েছেন। এটি 'দ্যৌষ্পিতা'র ছবি।

'উমা' শব্দটি স্বচ্ছন্দে ওই বহুপ্রযুক্ত শব্দগুলির সগোত্র হতে পারে—পুংদেবতার বিশেষণ 'উম', আর স্ত্রীদেবতার বিশেষণ 'উমা'। এক্ষেত্রে উকারের হ্রস্ব-দীর্ঘ বিকল্পের আরও উদাহরণ আছে ঃ উষস্ ॥ ঊষস্, উধস্ ॥ ঊধস্, উরু ॥ ঊরু ইত্যাদি।

শতপথব্রাহ্মণের একজায়গায় 'উমা'র উল্লেখ আছে—বোঝায় একরকম বর্ষজীবী তৃণ।[৫৭৬] তিল মাষ ইত্যাদির মত এও একরকম শস্য, এর রীতিমত খেতি হত—একথা পাণিনিসূত্রে পাই।[৫৭৭] সায়ণ বলেন, 'ক্ষৌমরজ্জ্বোপাদানভূতাস্ তৃণবিশেষা উমাঃ'; অমর বলেন 'অতসী স্যাদ্ উমা ক্ষুমা'।[৫৭৮] অতসী আমাদের 'তিসি' (ইংরেজী 'flax,' 'linum'), ফুল নীল রঙের—যদিও বাংলার অনেক জায়গায় ঝন্ঝনিয়াকে অতসী বলা হয়। তার ফুল হলদে এবং দ্রোণ বা অপরাজিতার মতই এরা তন্ত্রের যন্ত্রপুষ্প। আর 'ক্ষুমা' প্রাচীন বাংলায় 'খুঞা', যার আঁশ থেকে সূক্ষ্ম কাপড় তৈরী হত। উমা বা অতসীর বীজ থেকে তেল হয়, আঁশ থেকে কাপড় হয়। পাণিনির লক্ষ্য বীজ, আর শতপথব্রাহ্মণের লক্ষ্য তন্তু। অতসী নানারকমের আছে, প্রাচীনকাল থেকে পৃথিবীতে তার ব্যাপক চাষ হয়ে এসেছে।

শতপথব্রাহ্মণে উমার ব্যবহারের একটি রোচক বিবরণ আছে। উখা বা অগ্নিস্থালীতে আগুন জ্বালাতে হবে। আগুন যাতে সহজে জ্বলে, তার জন্য তার চারদিকে হালকা ইন্ধনের একটি 'কুলায়' তৈরি করতে হবে। প্রথম দিতে হবে 'উমা', তার চারদিকে 'শণ', তার চারদিকে 'মুঞ্জ' (যা দিয়ে ব্রহ্মচারীর মেখলা তৈরী হত)। অগ্নি যেন একটি 'গর্ভ' বা ভ্রূণ। তার চারদিকে উমা হল 'উল্ব' (ভ্রূণ বাড়ে যে-থলিতে, 'ফুল'), শণ হল 'জরায়ু', আর মুঞ্জ হল 'যোনি'।

অগ্নি ওষধিদের গর্ভ বা ভ্রূণ—এটি বৈদিক প্রসিদ্ধি।[৫৭৯] আর্দ্র ওষধিতে অগ্নি অন্তর্নিবিষ্ট। তিনি তখন রাহস্যিক অর্থে তাদের প্রাণ। ওষধি শুকিয়ে গেলে 'বন' বা কাঠের মত তা অগ্নির ইন্ধন হয়। ওষধি যখন আর্দ্র, তখন তা রসবহা, অগ্নিও তখন 'দ্রবিণোদা'—সোম বা রসচেতনার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কিন্তু অগ্নিরস পেতে হলে আগে ইন্ধনকে রসহীন করে নিতে হয়। রসের সাধনায় আজও সহজিয়া তাই বলেন, 'শুষ্ক কাষ্ঠসম দেহেরে করিতে হয়'। মুঞ্জ শণ উমা—এরা সবাই শুষ্ক এবং কতকগুলি অংশুর

সমষ্টি। ওষধি নাড়ীর প্রতীক। এই মুঞ্জ প্রভৃতির কুলায়েরা তাহলে এমন নাড়ীজাল যাতে যোগাগ্নি সহজে 'আদীপ্ত' হতে পারে।[৫৮০] 'উমা' কুলায়-গুলির মধ্যে অন্তরতম। অগ্নি আদীপ্ত হবেন প্রথম তাকে আশ্রয় করে এবং ক্রমে তাঁর সংক্রমণ হবে বাইরের দুটি কুলায়ে।

উমাই তাহলে অগ্নির আদিজননী এবং প্রসূতি। আবার অদিতি বিশ্বের আদিজননী এবং অগ্নি 'অদিতির গর্ভ'।[৫৮১] তাহলে উমা অদিতির প্রতীক।

কেনোপনিষদের 'উমা'র মূল এইখানে। শুধু ধ্বনিসাদৃশ্যে ব্যাবিলনের umma হতে উমাকে টেনে বার করবার কোনও প্রয়োজনই হয় না। দাক্ষিণাত্যের ভাষায় মাতৃবাচক শব্দটিও 'উম্মা' নয়, 'আম্মা'—যেমন 'মন্চা-আম্মা', 'মেরী-আম্মা'। তার সঙ্গে বেদের 'অম্বা'র মিল আছে। 'অম্বাই' ব্যাবিলন থেকে এসেছে—এ বললে তা হবে শুধু দুরাগ্রহীর প্রজল্প।

আসলে 'উমা' বৈদিক সমাজে সাধারণ্যে প্রচলিত একটি ওষধির সংজ্ঞা। তার আঁশ থেকে সূক্ষ্ম কাপড় হত। মুঞ্জের চাইতে শণের আঁশ সূক্ষ্ম, উমার আঁশ আরও সূক্ষ্ম। সোমের অংশু রসবহা নাড়ীর প্রতীক—এর ইশারা ঋক্‌সংহিতার সোমমণ্ডলে অনেক আছে। অংশুজালের ভিতর দিয়ে অগ্নির অর্চিঃ' বা সোমের 'রস' দুইই প্রবাহিত হয়। যজ্ঞের অনুষ্ঠান এই প্রবহণের সাধনা। 'উমা' আদৌ একটি যজ্ঞাঙ্গ। যজ্ঞাঙ্গে দেবত্বের আরোপ বেদে একটি সাধারণ রীতি। উমা বা ক্ষুমার কাপড়ের প্রশংসা প্রাচীন সাহিত্যে অনেক আছে। তাইতে 'উমা'তে 'বহুশোভমানা' বিশেষণটিও বেশ খাটে।

খুব সম্ভবত 'উমা' একটি অব্যুৎপন্ন শব্দ। কিন্তু বেদে তাকে যখন প্রতীকরূপে গ্রহণ করা হয়েছে, তখন সে যে-ভাবের বাহন তার দিক থেকে তার একটা নির্বাচন দরকার, যাতে তার রাহস্যিক ভাবনা সহজ হয়। এটিও একটি বৈদিক রীতি। 'উমা'কে তখন অনায়াসে দেববাচক 'উম' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ ধরে নিতে পারি। কেউ-কেউ বলেন বয়নার্থক 'ব়া' ('বে়') ধাতু থেকে 'উমা' হয়েছে। সাধারণ্যে প্রচলিত 'উমা'র এ-ব্যুৎপত্তি অসম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, সমস্ত যজ্ঞানুষ্ঠানকে কাপড় বোনার সঙ্গে তুলনা করার রেওয়াজ আমরা ঋক্‌সংহিতাতেই পাই।[৫৮২] কিন্তু 'উমা' শব্দটিকে বৈদিকেরা যখন জাতে তুলে নিলেন, তখন লৌকিক ব্যুৎপত্তির সঙ্গে রাহস্যিক ব্যুৎপত্তিটিও তাঁরা জুড়ে দিয়েছিলেন নিশ্চয়। এমনি করে বিদ্যা-সম্প্রদায়ের পরম্পরার দ্বারা বাহিত হয়ে তৈত্তিরীয়ারণ্যকে 'উমা' অম্বিকা বা আদিজননীর সংজ্ঞায় পরিণত হয়েছে। পুরাণে এই উমা কুমারজননী, আর কুমার অগ্নি।

এই উমা আবার 'হৈমবতী'। কিন্তু হিমবৎকন্যা নন, হিমবৎপ্রভবা স্রোতস্বিনী—একথা আগেই বলেছি। হৈমবতী পরে হলেন 'পার্বতী'। প্রতীচ্য

ভূখণ্ডে এক প্রাচীন দেবীর সন্ধান পাওয়া যায়—তিনি পর্বতাধিষ্ঠাত্রী (পর্বতকন্যা নন) এবং সিংহবাহিনী। এই দেবীকে আমরা মার্কণ্ডেয়পুরাণের সপ্তশতীতে পাই 'চণ্ডী'রূপে। সেখানে দেবীর অনেক নাম আছে, কিন্তু উমা নামটি কোথাও নাই। সপ্তশতীতে দেবীর তিনটি চরিত্র বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে প্রথম চরিত্রে দেবী শেষশায়ী বিষ্ণুর যোগনিদ্রা—তিনি পার্বতী নন, কিংবা হিমবানের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নাই। দ্বিতীয় চরিত্রেও তিনি হৈমবতী নন – তবে দেবতাদের কোপ হতে তাঁর আবির্ভাব 'যেন জ্বলন্ত পর্বতের মত একটি তেজঃকূট'রূপে।[৫৮৩] দেবতাদের কোপ (বেদে 'মন্যু') হতে দেবীর এই দীপ্ত আবির্ভাবের ভাবনা এসেছে ঋক্‌সংহিতার দুটি মন্যুসূক্ত হতে—যা দেবীযুদ্ধের বিবৃতির বীজ।[৫৮৪] দেবী হৈমবতী না হলেও সিংহবাহিনী, আর সিংহটি হিমবানের দান।[৫৮৫] মহিষাসুরবধের পর থেকে দেবী হিমবৎপর্বতকে আশ্রয় করে হলেন 'পার্বতী' এবং সিংহ রীতিমত তাঁর বাহন হল।[৫৮৬] মধ্যম এবং উত্তম দুটি চরিত্রেই দেবী 'অম্বিকা' এবং 'চণ্ডিকা'—সংজ্ঞা দুটি তাঁতে রূঢ়।[৫৮৭]

তাহলে দেখতে পাচ্ছি, দেবী অম্বিকা বেদে 'হৈমবতী উমা' আর পুরাণে 'হৈমবতী চণ্ডিকা'। উমা তাঁর শান্তমূর্তি আর চণ্ডিকা ঘোরমূর্তি। বেদে তিনি রুদ্রের স্বসা বা পত্নী। পুরাণে রুদ্রের জায়গায় পাই ঈশান বা শিবকে।[৫৮৮] দেবী সেখানে স্বতন্ত্রা, শিবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অবিনাভাবের। বেদে রুদ্র ঘোরদেবতা, তিনিই আবার শান্ত হলে হন 'শিব'[৫৮৯]—ঝড়ের পর আকাশের মত। বেদে শিব-শক্তির যে-রূপ, পুরাণে বিবৃত রূপ তার অনুপূরক। একটিতে দেব ঘোর, দেবী শান্তা; আরেকটিতে দেবী ঘোরা, দেব শান্ত। উপনিষদের ভাষায় একটিতে দেবী প্রজ্ঞা, আরেকটিতে প্রাণ। বেদের উমা তাই সিংহবাহিনী নন, কিন্তু উমা আর চণ্ডিকা দুজনেই হৈমবতী এবং পার্বতী।

'হৈমবতী' শব্দের অর্থ শঙ্কর একবার করেছেন 'হেমালঙ্কারভূষিতা', আরেকবার 'হিমবানের পুত্রী'। কিন্তু সোনা বোঝাতে 'হেম' শব্দের প্রয়োগ মূল সংহিতায় বা ব্রাহ্মণে নাই; আর 'হৈমবতী'তে প্রত্যয়টি যে অপত্যার্থক নয়—একথা আগেই বলেছি। তবে মরমীয়ার দৃষ্টিতে দুটি ব্যাখ্যাই সত্য হতে পারে। ঐশ্বচেতনার মহাকাশে যে-স্ত্রীমূর্তির আবির্ভাব হল তিনি হিরণ্ময়ী, অথবা তিনি চেতনার শুভ্র তুঙ্গতা হতে জাত—দুইই অনুভবসিদ্ধ। বেদে 'পর্বত' বা 'গিরি' চেতনার উৎক্রান্তির প্রতীক। 'পর্বত' পর্ববান্—ধাপে-ধাপে উপরে উঠে গেছে; আর 'গিরি' যেন উদ্‌গীর্ণ—হঠাৎ ঠেলে উঠেছে।[৫৯০] অধ্যাত্মচেতনার উদয়ন যেন পর্বতের সানু হতে সানুতে আরোহণ

আর সেইসঙ্গে দৃষ্টির সম্মুখে দিগন্তের বিস্ফারণ ঃ[৫৯১] অবশেষে আকাশের অনিবাধ নীলের তলায় এক তুষারশুভ্র তুঙ্গতায় উত্তরণ। এই তো দেবীকে পাওয়া, লোকোত্তরের আনন্ত্যকে পাওয়া। এজন্যই দেবী 'হৈমবতী'। স্মরণীয়, বেদের প্রধান দেবতারা সবাই 'গিরিষ্ঠাঃ' বা 'গিরিক্ষিৎ'—যেমন ঋক্‌সংহিতায় মরুদ্‌গণ, ইন্দ্র, সোম, বিষ্ণু ;[৫৯২] যজুঃসংহিতায় রুদ্র 'গিরিশন্ত', 'গিরিশ' বা 'গিরিশয়'।[৫৯৩] হিমাচলের তুষারশৃঙ্গের মহিমা রুদ্রেরই শিবরূপ। হিমবানের বহু উল্লেখ সংহিতাগুলিতে আছে। বৈদিকেরা যে একসময় হিমবৎপ্রস্থের অধিবাসী ছিলেন, তার আভাস পাওয়া যায় সংবৎসরবাচক সংজ্ঞার ক্রমিক বিবর্তনে—প্রথমে 'হিম' বা বরফ পড়া, তারপর 'শরৎ' বা পাতা ঝরা, আর অবশেষে নীচে আসার পর 'বর্ষ' বা বর্ষা নামা। নিসর্গে অধিদৈবত দৃষ্টি যাঁদের ধর্মের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ, পৃথিবীপৃষ্ঠে তুষারশৃঙ্গের শুভ্র উত্তুঙ্গতা যে তাঁদের দেবত্বভাবনাকে উদ্দীপ্ত করবে এবং তাইতে তাঁদের দেবতারা যে 'গিরিষ্ঠাঃ' হবেন—এ তো অস্বাভাবিক কিছুই নয়। তাই পার্বতীকে ব্যাবিলন থেকে হিমবৎপ্রস্থে টেনে আনবার কোন প্রয়োজনই হয় না। সিংহের শৌর্যের ইঙ্গিত ঋক্‌সংহিতাতেও কিছু কম নাই। তবে এও লক্ষণীয়, উমা এবং চণ্ডিকা দুজনেই অম্বিকা এবং হৈমবতী হলেও চণ্ডিকাই সিংহবাহিনী—তিনি যেন উমার মন্যু-মূর্তি।

'স্ত্রী'র কথা হল, এইবার সংক্ষেপে যক্ষের কথা। দেবতাদের সামনে দূরদিগন্তে অনির্বচনীয় একটা-কিছু প্রাদুর্ভূত হয়েছিল, যা আলোও নয় অন্ধকারও নয়—যেন ছায়াতপের মায়া।[৫৯৪] এই আবিঃ-ই 'যক্ষ'।

বেদে 'যক্ষ' বহুপ্রযুক্ত শব্দ। প্রয়োগের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট অর্থপরিণাম লক্ষ্য করা যায়। ঋকসংহিতায় শব্দটি ভাববাচী—বোঝায় 'রহস্য'। বৈশ্বানর অগ্নি 'যক্ষের বৃহন্‌ অধ্যক্ষ' অর্থাৎ সর্বাতিশায়ী বলে লোকোত্তর রহস্যের সাক্ষী।[৫৯৫] এই রহস্য বরুণের মায়া, তাই বরুণ 'য়ক্ষিন্‌'।[৫৯৬] বৃহস্পতি মন্ত্রবীর্যের দেবতা—তিনিও 'য়ক্ষভৃৎ' অগম রহস্যকে বহন করে চলেছেন তাঁর মধ্যে।[৫৯৭] মরুদ্‌গণ বৈশ্বানর অগ্নির মতই 'য়ক্ষদৃশঃ'—এই যক্ষকে দেখতে পান আর দেখতে-দেখতে যেন 'শুভ্র' হয়ে ওঠেন।[৫৯৮] লক্ষণীয়, অগ্নি বৈশ্বানররূপে এবং বায়ু মরুদ্‌গণরূপে দুজনেই যক্ষের অধ্যক্ষ এবং দ্রষ্টা, আর ইন্দ্রসহচর বৃহস্পতি 'য়ক্ষভৃৎ'—সংহিতার এই ভাবনার ছায়া পড়েছে কেনোপনিষদের উপাখ্যানে। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সংহিতায় সিদ্ধচেতনার বিবৃতি, আর উপনিষদে সাধকচেতনার।

সংহিতায় 'ব্রহ্ম'-সংজ্ঞা যেমন প্রজ্ঞান এবং তার শক্তি এই দুই অর্থে ব্যবহৃত

হয়েছে, 'যক্ষ'ও তেমনি বোঝাচ্ছে রহস্য এবং রহস্যশক্তি দুইই। 'অসুর' এবং 'মায়া' শব্দের মত 'যক্ষ' শব্দেও শক্তি বোঝাতে কোথাও-কোথাও[৫৯৯] খানিকটা অর্থাপকর্ষ ঘটেছে—'যক্ষ' যেন 'যক্ষ্ম' বা রোগের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। মনে রাখতে হবে, রোগ হয় কোনও রহস্যময় অপশক্তির ক্রিয়ায়—এ-বিশ্বাস খুব প্রাচীন। এই অর্থাপকর্ষের ধারা ধরে যক্ষ পরে হয়েছে 'দেবজন'—যে মানুষের ভাল বা মন্দ দুইই করতে পারে।

শৌনকসংহিতায় দেহস্থিত রহস্যময় আত্মা: 'অষ্টাচক্রা নৱদ্বারা দেৱানাং পূর্ অয়োধ্যা তস্যাং হিরণ্ময়ঃ কোশঃ স্বর্গো জ্যোতিষাৱৃতঃ, তস্মিন্ হিরণ্ময়ে কোশে ত্র্যরে ত্রিপ্রতিষ্ঠিতে, তস্মিন্ য়দ্ য়ক্ষম্ আত্মন্ৱৎ তদ্ ৱৈ ব্রহ্মৱিদো ৱিদুঃ'।[৬০০] আবার অন্যত্র: পুণ্ডরীকং নৱদ্বারং ত্রিভির্ গুণেভির্ আৱৃতম্, তস্মিন্ য়দ্ য়ক্ষম্ আত্মন্ৱৎ' ইত্যাদি।[৬০১] আবার যক্ষ ভুবনের অন্তর্যামী মহাদেব: 'মহদ্ য়ক্ষং ভুৱনস্য মধ্যে তপসি ক্রান্তং সলিলস্য পৃষ্ঠে, তস্মিঞ্ছ্রয়ন্তে য় উ কে চ দেৱা ৱৃক্ষস্য স্কন্ধঃ পরিত ইৱ শাখাঃ'।[৬০২] আবার, 'দূরে পূর্ণেন ৱসতি দূর ঊনেন হীয়তে, মহদ্ য়ক্ষং ভুৱনস্য মধ্যে তস্মৈ বলিং রাষ্ট্রভৃতো ভরন্তি।[৬০৩] যক্ষ এখানে রাজা সোমের মত পূর্ণিমার আলো আর অমাবস্যার অন্ধকার—দুয়েরই সমাহার। বিশ্বভুবন তাঁর রাজ্য আর দেবতারা তাঁর রাজ্যপাল। আবার যক্ষ রুদ্র পশুপতির রহস্যশক্তি, যা আছে কারণসলিলের গভীরে: 'তুভ্যম্ আরণ্যাঃ পশৱো মৃগা ৱনে হিতা হংসাঃ সুপর্ণাঃ শকুনা ৱয়াংসি, তৱ য়ক্ষং পশুপতে অপ্স্ৱন্তস্, তুভ্যং ক্ষরন্তি দিৱ্যা আপো ৱৃধে'।[৬০৪] দেখছি, বরুণের মত রুদ্রও 'য়ক্ষিন্'। এখানে তাঁর শান্ত রূপ। মন্ত্রের শেষাংশে গঙ্গাধর ধ্যানী শিবের ছবি ফুটে উঠেছে। বরুণ আর শিব একই তত্ত্ব। রুদ্র-শিবের সঙ্গে যক্ষের যোগ পরে পুরাণে পল্লবিত হয়েছে। কেনোপনিষদের যক্ষে উমাপতি রুদ্রের বা শিবের অনুষঙ্গ সহজেই মনে আসে।

মাধ্যন্দিনসংহিতায় মনকে বলা হয়েছে 'অপূর্ৱং য়ক্ষম্ অন্তঃ প্রজানাম্'—জীবের মধ্যে এক অপূর্ব রহস্য।[৬০৫]

শতপথব্রাহ্মণে রূপ আর নামকে বলা হয়েছে ব্রহ্মের দুটি 'মহতী য়ক্ষে'—রহস্যময় মহাশক্তি।[৬০৬] তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে নাচিকেতাগ্নিচয়নে ইষ্টকোপধানের সময় প্রতিটি ইষ্টককে সম্বোধন করে বলা হয়, 'ত্বয়ীদম্ অন্তঃ ৱিশ্বং য়ক্ষং ৱিশ্বং ভূতং ৱিশ্বং সুভূতম্'।[৬০৭] যক্ষ এখানে বিশ্বমূল রহস্যশক্তি। অন্যত্র যক্ষ ব্রহ্মের তপঃশক্তি।[৬০৮] গোপথব্রাহ্মণে ব্রহ্মকে বলা হয়েছে 'মহদ্ য়ক্ষম্ একম্ এৱ'।[৬০৯]

ব্রাহ্মণেই যক্ষকে পাই দেবজনরূপে। তখন সে ভাল-মন্দ দুইই। যখন

ভাল, তখন সে গন্ধর্ব অপ্সরা বৈশ্রবণ এবং ইন্দ্রের দলে।[৬১০] তার রূপ তখন নয়নভুলানো।[৬১১] আর যখন মন্দ, তখন সে রক্ষঃ পিশাচ জম্ভক আর অসুরদের দলে।[৬১২]

পুরাণে বৈশ্রবণ কুবের যক্ষদের অধিপতি। আবার কুবের শিবের ভাণ্ডারী। স্পষ্টতই যক্ষ তখন যোগৈশ্বর্য। যোগ নরের সাধনা, বিপ্রের সাধনা যাগ—একটি আত্মশক্তির উদ্‌বোধন, আরেকটি দেবশক্তির উপাসনা। একমাত্র যক্ষাধিপতি কুবেরই নরবাহন—এটা লক্ষ্য করবার মত। তাঁর পুষ্পক রথ একবার কেড়ে নিয়েছিল রাবণ। এখন কেড়ে নিয়েছে বুঝি নরেরা। বৌদ্ধধর্মে যক্ষেরা অনুকূল যোগশক্তি। খৃষ্টপূর্ব যুগ হতে এদেশের বাস্তু- এবং মূর্তিশিল্পে যক্ষ-যক্ষিণীর ছড়াছড়ি।

কেনোপনিষদের 'যক্ষ' এবং 'স্ত্রী' পুরাণের উমা-মহেশ্বরকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কাহিনীর অনুবৃত্তি চলছে পরের খণ্ডে।

চতুর্থ খণ্ড

আকাশে বহুশোভমানা দেবীর আবির্ভাব—আদিত্যের মাধ্যান্দিন উদ্ভাসের মত 'আ প্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষম্'।[৬১৩] ইন্দ্র দেখলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি এই যক্ষ?' শুনলেন ঃ

সা ব্রহ্মে-তি হো-বাচ। ব্রহ্মণো বা এতদ্ বিজয়ে মহীয়ধ্বম্ ইতি। ততো হৈ-ব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মে-তি ॥ ১

—সেই (স্ত্রী) এই কথাই বলিলেন, 'ইনি ব্রহ্ম'। এই যে তোমরা মহান্ হয়ে উঠেছ, এ কিন্তু ব্রহ্মেরই বিজয়ের ফলে। তাইতে (ইন্দ্রের) সংবিৎ হল, এই তো ব্রহ্ম।

দেবী বললেন। ইন্দ্র শুনলেন। শোনামাত্রই তাঁর সংবিৎএর উদয় হল। পরম ব্যোমে সহস্রাক্ষরা পরা বাকের এই প্রসাদ। অম্ভৃণকন্যার কণ্ঠে তিনিই বলেছিলেন, এখনও বলে চলছেন,[৬১৪]

অহম্ এব স্বয়ম্ ইদং বদামি
জুষ্টং দেবেভির্ উত মানুষেভিঃ।
য়ং কাময়ে তং-তম্ উগ্রং কৃণোমি
তং ব্রহ্মাণং তম্ ঋষিং তং সুমেধাম্ ॥

—আমি নিজেই একথা বলছি—যার আস্বাদ পেয়েছে দেবতারা আর মানুষেরা ; যাকেই আমি কামনা করি, তাকে বজ্রতেজা করি, তাকে (করি) বৃহতের ভাবক, তাকে (করি) ঋষি তাকে (করি) সুমেধা।

ছান্দোগ্যে আছে ব্রহ্মের গমক (যিনি নিয়ে যান) এক 'অমানব' পুরুষের কথা। মানুষ দেবপথ ধরে সংবৎসর হতে আদিত্যে যায়, আদিত্য হতে চন্দ্রমায়, চন্দ্রমা হতে বিদ্যুতে। তখন ওই অমানব পুরুষ তাকে ব্রহ্মে নিয়ে যান।[৬১৫] দেবী এই অমানব পুরুষ। তাঁর আবির্ভাব অরোরার মত। কেনোপনিষদেও কিছুক্ষণ পরে বিদ্যুতের কথা বলা হবে।

দেবী যখন স্বয়ম্ আবির্ভূত হয়ে ব্রহ্মকে পাইয়ে দেন, তখনই তাঁকে পাওয়া সহজ হয়, পূর্ণ হয়। সব দেবতারই গতি ব্রহ্মের অভিমুখে, কিন্তু ব্রহ্মকে

সবাই পান না। আভাসে তাঁরা ব্রহ্মকে জানেন, কিন্তু প্রভাসে তাঁকে ধারণা করতে পারেন না। দেবী 'অদিতির্ দেবতাময়ী'[৬১৬]—সমস্ত দেবতার সমাহার এবং তা ছাপিয়েও আরও-কিছু। সুতরাং ব্রহ্মের সংবিৎ তিনিই দিতে পারেন—সমস্ত চিদ্‌বৃত্তির সমন্বয়ে এবং সমাহারে।

তিনটি লোক—পৃথিবী অন্তরিক্ষ দ্যোঃ। এরা ব্রহ্মের অভিমুখে সিঁড়ির মত চেতনার তিনটি ভূমি। প্রত্যেক লোকে একেকটি দেবতা অধিপতি—অন্যান্য দেবতা তাঁদের বিভূতি। এখানে লোকপাল দেবতাদের নাম যথাক্রমে অগ্নি বায়ু এবং ইন্দ্র। সংহিতায় অন্যান্য নামও আছে—যেমন অগ্নি ইন্দ্র মিত্র-বরুণ, কিংবা অগ্নি মাতরিশ্বা সূর্য-যম।[৬১৭] তিনটি লোকে তিনটি দেবগণ—যথাক্রমে বসুগণ রুদ্রগণ আদিত্যগণ এঁদেরই বিভূতি। অধ্যাত্ম-দৃষ্টিতে এই দেবতারা শরীর (অন্ন) প্রাণ মন অথবা বাক্ প্রাণ মন—যেমন এখানে। বৈদিক দর্শনে অনুরূপ সংজ্ঞা হল ভূত ভুবন এবং ভূম[৬১৮] অর্থাৎ যা হয়েছে যা হচ্ছে যা হয়েই আছে (সহজ এবং অনিবাধ স্থিতি)। অগ্নি-বায়ু এবং ইন্দ্রের সহায়ে হওয়ার এই তিনটি সোপান বেয়ে পেঁছিনো 'ভূমা'তে বা ব্রহ্মে—এই হচ্ছে বিজ্ঞান-সাধনার সিদ্ধি। সেখানে পেঁছিনো হল মহাসুখে পেঁছিনো।[৬১৯]

অতএব

তস্মাদ্ বা এতে দেবা অতিতরাম্ ইবা.ন্যান্ দেবান্ যদ্ অগ্নির্ বায়ুর্ ইন্দ্রঃ। তে হ্যে.নন্ নেদিষ্ঠং পস্পৃশুঃ। তে হ্যে.নৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মে.তি ॥ ২

তস্মাদ্ বা ইন্দ্রো হতিতরাম্ ইবা.ন্যান্ দেবান্। স হ্যে.নন্ নেদিষ্ঠং পস্পর্শ। স হ্যে.নৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মে.তি ॥ ৩

—তাইতে এই দেবতারা ছাপিয়ে গেছেন যেন অন্য দেবতাদের—এই যে অগ্নি বায়ু ইন্দ্র (এঁরাই)। কেননা তাঁরাই এঁকে সবচাইতে কাছে গিয়ে স্পর্শ করেছেন। কেননা তাঁরাই প্রথম এঁর সংবিৎ পেয়েছেন ব্রহ্ম বলে।

তাইতে ইন্দ্র যেন ছাপিয়ে গেছেন অন্য দেবতাদের। কেননা ইনি এঁকে সবচাইতে কাছে গিয়ে স্পর্শ করেছেন। কেননা ইনিই এঁর প্রথম সংবিৎ পেয়েছেন ব্রহ্ম বলে।

এটি আখ্যায়িকার উপসংহার। অগ্নি বায়ু এবং ইন্দ্র—বিশেষ করে ইন্দ্র ব্রহ্মসংবিত্তির মুখ্য সাধন। 'যেন' (ইব) শব্দটি লক্ষণীয়। এঁরা অন্য দেবতাদের 'যেন' ছাপিয়ে গেছেন। বস্তুত যে-কোনও দেবতাকে ধরে ব্রহ্মে

পেঁছিনো যায়। ব্রহ্ম 'একং সৎ', দেবতারা তাঁর বিভূতি।[৬২০] বিভূতি হতে সম্ভূতি, তাকে ছাপিয়ে অসম্ভূতি। অনুভাব্যের এই পরম্পরা। চরম অনুভব 'নরেদাঃ'র। সেখানে সৎও নাই, অসৎও নাই।[৬২১] ওইথেকে দেবতাদের বিসৃষ্টি।[৬২২] 'একং তৎ' এরই বিসৃষ্টি, অতএব 'মহদ্ দেবানাম্ অসুরত্বম্ একম্'[৬২৩]—সব দেবতার মহিমা এবং অতিস্থিতি এক। স্বরূপত সবাই ব্রহ্ম।

ব্রহ্মসংবিৎএর প্রকার **নেদিষ্ট স্পর্শন**—সবচাইতে কাছে গিয়ে তাঁকে স্পর্শ করা। মরমীয়া অনুভবের একটি ক্রম আছে—দেবতাকে নিজের বাইরে (বহির্ধা) দেখা, তারপর অন্তরে—নিজের হৃদয়ে অনুভব করা।[৬২৪] এই অনুভবই স্পর্শের সংবিৎ। তার পর ওই হৃদয়ের গহন গভীরে তাঁর গুঞ্জন শোনা। হৃদয়ের স্পর্শ প্রাণেরই স্পর্শ। এমনি করে চক্ষু প্রাণ ও শ্রোত্রের তর্পণে আস্বাদনের চরম চমৎকার রূপ স্পর্শ এবং শব্দের উজানধারায়।

সংহিতায় এই নেদিষ্ঠ স্পর্শকে উপমিত করা হয়েছে জায়া-পতির সম্পরিষ্বঙ্গের সঙ্গে। ঋষি অরুণ বৈতহব্য অগ্নিকে লক্ষ্য করে বলছেন, 'আমি জানি, তিনি আমাকে চান। আমি যেন তাঁর হৃদয়ের খুব কাছটিতে যাই নিবিড় স্পর্শের জন্য (নিস্পৃশে), উতলা জায়া যেমন করে যায় পতির কাছে সুবসনা হয়ে'।[৬২৫] নোধা গৌতম ইন্দ্রকে লক্ষ্য করে বলছেন, 'আমার মনীষারা তোমায় স্পর্শ করছে, উতল পতিকে যেমন স্পর্শ করে উতলা পত্নীরা'।[৬২৬]

অন্যত্র বৈরূপ নভঃপ্রভেদন তির্যক ভঙ্গিতে এই স্পর্শের একটি বর্ণনা দিয়েছেন।[৬২৭] ইন্দ্র সোমপাতম। তাঁকে তিনি আহ্বান করছেন প্রাতঃসবনেই প্রথম সোমপান করবার জন্য (১)। দেবতা চান আত্মাহুতি। তাইতে দ্রব্যযজ্ঞে দেবতাকে যা আহুতি দেওরা হয়, তা আত্মারই প্রতীক। সোম আনন্দের জনক—সে আমার আনন্দ, আমারই রসচেতনা।[৬২৮] তা-ই দেবতাকে দিতে হবে পরিপূত করে। অগ্নির মত সোমও শুচি হওরা চাই। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে একটি অভীপ্সা—দেবতাকে পাওরার তীব্র আকূতি, আরেকটি আনন্দচেতনা। দুইই শুচি হয় আদিত্যের বা 'বৃহৎ জ্যোতি'র আবেশে। সোম্য আনন্দ তখন প্রজ্ঞাজ্যোতিতে ভাস্বর। বৈরূপ ইন্দ্রকে তাই বলছেন, 'এই দেখ, আমাদের আনন্দ সূর্যের সোনালী তেজে ঝলমল করছে। তার রূপের সীমা নাই, তুলনা নাই। হে দেবতা, তোমার তনুকে তার স্পর্শ দাও (তন্বং স্পর্শয়স্ব) …গভীরে আসন পেতে এক হয়ে মিশে গিয়ে নিজেকে মাতিয়ে তোল'। বৈষ্ণবের ভাষায় এ-স্পর্শযোগ 'আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছায়' ততটা নয়, যতটা 'কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছায়'। আমার রূপসজ্জা তাঁরই জন্য, তাঁর সম্ভোগেই আমার তৃপ্তি।

এই স্পর্শের দেবতা সংহিতায় 'পৃশ্নি'—যিনি মরুদ্‌গণের মাতা। মরুদ্‌গণ বিশ্বে প্রবহমান প্রাণের জ্যোতির্ময় ঝড়। মাতা পৃশ্নি ধেনুরূপিণী। পিতা 'পৃশ্নি' বৃষভ ('অয়ং গোঃ পৃশ্নি')—সংহিতায় আদিত্যরূপী প্রাণ।[৬২৯] পিতা ও মাতার একই নাম—দুটিতে এক যুগনদ্ধ তত্ত্ব। দুয়ের সম্পরিষ্বঙ্গ হতে যে আলোর ঝড় বয়ে চলেছে, তা-ই বিশ্বপ্রাণ। অম্ভৃণকন্যা বাকের স্বানুভবে তার পরিচিতি আছে।[৬৩০]

এই ভাবনাগুলিতে 'নেদিষ্ঠ স্পর্শের' স্বরূপ বোঝা যায়। এর সঙ্গে গীতায় উল্লিখিত আত্মযোগীর 'ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ অত্যন্ত সুখ' তুলনীয়।[৬৩১] এই 'অত্যন্তসুখের' একটি উচ্ছল পরিচিতি আছে ঋক্‌সংহিতার সোমমণ্ডলের উপান্ত্যসূক্তে।[৬৩২]

ত্রয়ীবিদ্যার লক্ষ্য ব্রহ্মের আনন্দকে সম্ভোগ করা। উপনিষদে নানাজায়গায় নানাভাবে এই আনন্দের কথা এসে গেছে। সংহিতায় দেখি, অমৃতত্ব আর আনন্দ এক কথা, আনন্দসিদ্ধি হয় সোমযাগের ফলে, আনন্দ 'সোম্যং মধু'। কৌষীতকির পর্যঙ্কবিদ্যায় সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে ব্রহ্মের সম্ভোগ, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকের মধুবিদ্যা, ছান্দোগ্যে ভূমানন্দের আদেশ, তৈত্তিরীয় এবং বৃহদারণ্যকের আনন্দ-মীমাংসা, ঈশাতে ত্যাগের দ্বারা ভোগের উর্ধ্বায়ন—সর্বত্রই বেজে উঠেছে জিজীবিষা আপ্যায়ন এবং আনন্দের সুর। বৈদিক জীবন-দর্শনের এইটি বৈশিষ্ট্য। কেনোপনিষদের শেষেও আমরা আনন্দ-ব্রহ্মের উদ্দেশ পাব। যে-জৈমিনীয়োপনিষৎ কেনোপনিষদের আকর, তার উপসংহারে আছে অন্তরে-বাইরে বিশ্বের সর্বত্র সবিতা এবং সাবিত্রীর অন্যোন্যসম্ভূতির লীলা—অগ্নি আর পৃথিবীতে, বরুণ আর অপে, বায়ু আর আকাশে, স্তনয়িত্নু আর বিদ্যুতে, আদিত্য আর দ্যোঃ-তে, চন্দ্র আর নক্ষত্রে, যজ্ঞ আর ছন্দে, মন আর বাকে, পুরুষ আর স্ত্রীতে—সর্বত্র সবিতা আর সাবিত্রীতে মিলে 'দ্বে য়োনী, একং মিথুনম্'।[৬৩৩] এই মিথুনীভাবই ছন্দোগদের 'সাম'[৬৩৪] এবং সামবেদের উপনিষৎ। কেনোপনিষদের আখ্যায়িকাশেষে উল্লিখিত ব্রহ্মসংস্পর্শে তারই বিদ্যোতনা।

আখ্যায়িকা শেষ হল। তাতে কেন আমরা ব্রহ্মকে পাই না, আর কি করেই বা তাঁকে পেতে পারি—আচার্য তার একটা আভাস দিলেন। এপর্যন্ত তাঁর অনুশাসন ছিল প্রায়শ নেতিমুখে—ব্রহ্মকে এ দিয়ে পাওরা যায় না, ও দিয়ে পাওরা যায় না। শুধু একটি মন্ত্রে বলা হয়েছিল, তাঁকে পাওরা যায় প্রতিবোধের দ্বারা। এইবার পাওবার উপায়গুলি একটু বিস্তৃতভাবে আলোচিত হচ্ছে দুটি 'আদেশ' এবং একটি অনুশাসনের মাধ্যমে।

আচার্য বলছেন,

তস্যৈ.ষ আদেশো, য়দ্ এতদ্ ৱিদ্যুতো ৱ্যদ্যুতদ্ আ ৩ ইতী. ন্ন্যমীমিষদ্ আ ৩ ইত্য.ধিদৈবতম্ ॥ ৪

অথা.ধ্যাত্মম্। য়দ্ এতদ্ গচ্ছতি.ৱ চ মনঃ। অনেন চৈ.তদ্ উপস্মরত্য.-ভীক্ষ্ণং সঙ্কল্পঃ ॥ ৫

—সেই (ব্রহ্মের) বেলায় এই (হল) আদেশঃ এই যে বিদ্যুতের (ছটা) ঝলক দিয়ে উঠল যেন গো, তেমনি (ওই বিদ্যুৎ) পলক ফেলল যেন গো। এই হল দেবতাদের সম্পর্কিত (আদেশ)।

তারপরে আত্মার সম্পর্কিত (আদেশ): এই যে মন এঁর কাছে যায় যেন। আবার এই মন দিয়ে এঁকে নিবিড়ভাবে স্মরণ করে (উপাসকের) সংকল্প।

আদেশ একটি পারিভাষিক সংজ্ঞা। মৌল অর্থ নির্দেশ, সংকেত, ইশারা। আসলে এটি সূত্রাকারে তত্ত্বের খ্যাপন, যাতে পথের দিশা মেলে। কিন্তু তার সংগে জড়িয়ে থাকে প্রবক্তার একটা প্রেষণা বা প্রচোদনা—বৌদ্ধ 'ধর্মদেশনা'র মত। আদেশের নিদর্শন প্রাচীন উপনিষৎগুলির নানাজায়গায় ছড়ানো আছে।[৬৩৫] তৈত্তিরীয়োপনিষদে আদেশকে বলা হয়েছে মনোময় পুরুষের আত্মা, আর চতুর্বেদ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।[৬৩৬] ছান্দোগ্যে 'গুহ্য আদেশে'র কথা আছে, তারা মধুকর হয়ে ব্রহ্মপুষ্প হতে অমৃত সঞ্চয় ক'রে আদিত্যের ঊর্ধ্ব-রশ্মিতে জমিয়ে রাখে।[৬৩৭] অর্থাৎ আদেশ ব্রহ্মবিদ্যার পরম দেশনা।

এখানে দুটি আদেশের কথা বলা হয়েছে—একটি **অধিদৈবত** বা দেবতাকে নিয়ে, আরেকটি **অধ্যাত্ম** বা আত্মাকে নিয়ে। অধিদৈবত এবং অধ্যাত্ম দৃষ্টির কথা আগেও বলেছি।[৬৩৮] সংজ্ঞা দুটি বহু প্রাচীন এবং বেদব্যাখ্যার বলতে গেলে চাবিকাঠি। এদের প্রথম প্রয়োগ পাওয়া যায় ঐতরেয়ব্রাহ্মণে।[৬৩৯] উপনিষদে এদের ছড়াছড়ি। একটা সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিয়ে নিই।

একটা তত্ত্বকে দেখতে হবে যেমন নিজের বাইরে, তেমনি আবার নিজের ভিতরে। যেমন ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যেমন আমার বাইরে আছেন, তেমনি আছেন অন্তরেও। বাইরে তিনি জগৎ হয়েছেন, অন্তরে হয়েছেন আত্মা। জগৎ এবং আত্মা অন্যোন্যনির্ভর। ব্রহ্মে দুয়ের সমাহার।

বাইরের জগৎকে অনুভব করি, বস্তুরূপে আর অন্তরাত্মাকে ভাবরূপে। কিন্তু অন্তরাত্মাই যেমন বস্তুতে ফুটে উঠেছে তনুরূপে, তেমনি বাইরের বস্তুর অন্তরে আছে প্রাণ, আছে ভাব—এককথায় সেও 'আত্মন্বী'। তনু এবং

আত্মায় আমি যেমন পুরুষ, বাইরটাও তেমনি এক বিরাট পুরুষ। আমি সেই বিরাট পুরুষের বিভূতি। তাঁতে যা আছে, আমাতেও তা আছে। তাঁতে আছে বলেই আমাতে আছে।

বাইরে দেখছি সূর্য। তাঁর আলোয় এবং তাপে চরাচর জগৎ উদ্‌ভাসিত এবং সক্রিয়। এই সূর্য 'আত্মা জগতস্‌ তস্থুষশ্‌ চ'—যা-কিছু স্থাবর বা জঙ্গম, তার আত্মা।[৬৪০] ওই আদিত্যে যিনি আছেন আর আমাতে যিনি আছেন, দুইই এক।[৬৪১] সেই পুরুষকে বাইরে যখন দেখি, তখন অনুভব হয় 'পুরুষ এব ইদং সর্বং, যদ্‌ ভূতং যচ্‌ চ ভব্যম্‌'—পুরুষই এই সব-কিছু, যা হয়েছে আর যা হবে অর্থাৎ বিশ্বব্যাপারে তিনিই হয়ে চলেছেন।[৬৪২] এই দৃষ্টি অধিদৈবত—সব-কিছুকে দেবতাময় দেখা। দৃষ্টিকে অন্তরাবৃত্ত করে যখন অনুভব করি, 'য়ো অসাব্‌-সৌ পুরুষঃ সোহহম্‌ অস্মি',[৬৪৩] তখন তা অধ্যাত্ম।

'যা এখানে আছে, তা ওখানে আছে, যা ওখানে আছে তা-ই এখানে আছে। …আলাদা করে কিছুই নাই।'[৬৪৪] ওখানে এখানে এক করে দেখাই সম্যক্‌ দর্শন।

কঠোপনিষদে বলা হয়েছে, লোকে বাইরটাই দেখে, ভিতরে কেউ দেখে না। কদাচ কোনও ধীর আবৃত্তচক্ষু হয়ে আত্মাকে দেখেন সামনাসামনি। সাধারণ মানুষ ভাবের দৃষ্টি দিয়ে জগৎকে দেখে না, তাই সে তাকে বস্তু ও ঘটনার পুঞ্জরূপেই দেখে। তার দেখা গরজের দেখা, রসের দেখা নয়। রসদৃষ্টি পেতে হলে দৃষ্টিকে পরিশুদ্ধ করে নিতে হয় অন্তরে তলিয়ে গিয়ে। যেতে হয় মনের গভীরে—বিজ্ঞানে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দ্রষ্টার 'চিদাবরণভঙ্গ' হয়, তখন বিশ্বে সে ব্রহ্মের আনন্দরূপের বিভা দেখতে পায়। এখানে দৃষ্টি আগে অধ্যাত্ম, পরে অধিদৈবত—আগে দেবতাকে দেখা আত্মাতে, তার পর বিশ্বভুবনে।

প্রাচীন উপনিষৎগুলিতে অধিদৈবত দৃষ্টির কথা আগে, অধ্যাত্ম দৃষ্টির কথা পরে। এটি বৈদিক ভাবনার অনুগত। ঋষির দৃষ্টি কবির দৃষ্টি। স্বভাবতই সর্বত্র আলো আর আনন্দকে আবিষ্কার করা কবিদৃষ্টির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। 'অংহঃ' (চেতনার সঙ্কোচ) 'দুর্মতি' (দৌর্মনস্য, মনমরা ভাব) বা 'ভয়' ঋষি-কবির চিত্তকে ক্লিষ্ট করে না।[৬৪৫] বৃহতের আনন্দকে তিনি অনুভবে পেয়েছেন বলে কোথাও তাঁর ভয় নাই,[৬৪৬] অতএব দুঃখ ক্ষোভ বা অনুশোচনাও নাই। তাঁর চিত্ত বালকের চিত্তের মত সহজানন্দে স্বচ্ছ এবং ধূর্তিহীন।[৬৪৭] তাইতে আবৃত্তচক্ষু হয়েই নয়, সাদা চোখেও এ-চিত্ত সর্বত্র দেবতাকে প্রত্যক্ষ করতে পারে।

রামকৃষ্ণদেব বলতেন, 'বালক সব চিন্ময় দেখে। ফড়িং ধরতে গিয়ে গাছের পাতা নড়তে দেখে বলছে, চুপ, আমি এখন ফড়িং ধরব'। এ-দৃষ্টি যেমন অবোধের দৃষ্টি, তেমনি আবার প্রতিবোধেরও দৃষ্টি। গোড়ায় এই এবোধ থাকে আভাসরূপে, তারপর বুদ্ধির মারপ্যাঁচে তা হারিয়ে যায়। সেই প্যাঁচ খসিয়ে আবার তা ফিরিয়ে আনতে হয়। তাই যাজ্ঞবল্ক্য কহোলকে বলেছিলেন, 'পণ্ডিতের যা পাবার তা পেয়ে আবার বালক হয়ে যাবে'।[৬৪৮] সিদ্ধের অবস্থা তাই শেষ পর্যন্ত বালবৎ সহজ অবস্থা। তাঁর সর্বত্র চিন্ময় প্রত্যক্ষ।

যুগচেতনায় কখনও এটি স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে—যেমন হয়েছিল বৈদিক যুগে। একটি দিনের সূর্যোদয় কুৎস আঙ্গিরসের চোখে অপূর্ব মহিমার বিস্ময় নিয়ে ফুটে উঠল। দ্যুলোকে অন্তরিক্ষে পৃথিবীতে আলোর ঢল নামল, নামল অন্তরে। আলো আর আঁধার জীবন আর মরণ যেন মণিহারের মত দেবতার গলায় দুলতে লাগল, দেবতার কল্যাণ-করস্পর্শে নিঃশেষে মুছে গেল চিত্তের যত সঙ্কোচ আর মালিন্য।[৬৪৯] এ তো একটা আলোকপিণ্ডকে শুধু দেখা নয়—দেখা অন্তরে-বাইরে এক ভাস্বর মহিমাকে। দেখে বৃহৎ হওরা। রামকৃষ্ণদেব বলতেন—'উদ্দীপন'। তা-ই হল 'প্রতিবোধ' কিনা বৃহৎএর আলোর দিকে চেয়ে জেগে ওঠা। রামকৃষ্ণদেবের ভাষায় 'চোখে তখন ন্যাবা লেগে যায়—যা দেখি, তাঁকেই দেখি'।

ঋষি-কবির চোখে এই চিন্ময়-প্রত্যক্ষের সংস্কার সহজ ছিল বলে সর্বত্র তাঁদের দৃষ্টি আগে অধিদৈবত, তারপর অধ্যাত্ম। আমাদের পক্ষে এখন তা সহজ নয়। তাহলে উপায় কি, সেকথাও উপনিষদের শেষে আচার্য বলে দিয়েছেন। এখন তিনি যা বলছেন, তা প্রতিবোধের কথা, সহজ দৃষ্টির কথা। এ-দৃষ্টি এখনও দুর্লভ নয়। বরং মরমীয়া জানেন, এখনও 'প্রত্নথা পূর্বথা বিশ্বথে· মথা'[৬৫০] সেই অপরূপ অন্তত একবারের মত স্বীয় তনুকে তার কাছে সম্পূর্ণই বিবৃত করেন—যাকে তিনি বরণ করেন। কবির ভাষায় 'যখন আসে পরম লগন, তখন অন্ধকারে হঠাৎ তারে দেখি।...দুর্দম ঝড়ে আগল খুলে পড়ে, কার সে নয়ন 'পরে নয়ন যায় গো ঠেকি। (আর তখনই তার) দূত আসে বিদ্যুত-উদ্ভাসে, আমন্ত্রণের বাণী যায় হৃদয়ে লেখি'।[৬৫১]

এই-যে বিদ্যুতের বিদ্যোতন, এক ঝলকে তাঁর সবটুকুর 'ঝাঁকিদর্শন', এই দৈবী বা শৈবী দীক্ষা তাঁর স্বয়ংবরণের চিরন্তন রীতি। সেই বিদ্যুতে হঠাৎ দেখি তাঁর 'দিবী·ব চক্ষুর্ আততম্'[৬৫২]—তাঁর চোখের বিদ্যুৎ ঠিকরে পড়ল আমার চোখে। তাঁর দৃষ্টিতে আমার দৃষ্টি ফুটল। কিন্তু পরমুহূর্তেই তাঁর চোখে বুঝি নিমিষ পড়ল, আর সঙ্গে সঙ্গে আমারও চোখে আঁধার নেমে এল। কোথায় তিনি!

ক্ষণিক দর্শনের পর এই-যে অদর্শন, তারই বেদনা আধিদৈবত প্রসাদকে অন্তরে রূপান্তরিত করে অধ্যাত্ম এষণায়। প্রাতিবোধ থেকে আবার আমরা নেমে আসি মনে। এ-মন রূপান্তরিত না হ'ক, গোত্রান্তরিত মন। একবার সে সাঁঙিএর ছোঁয়া পেয়েছে, প্রাণের গভীর গোপন মহা আপন'কে সে জেনেছে, জেনেছে সে তাঁর স্বকীয়া স্বয়ংবৃতা বধূ। তবে তার প্রতি এ পরকীয়ার মত আচরণ কেন—যেন সে অস্পৃশ্যা অগম্যা ?

মন তখন 'রি··চরাতি দূর আধীঃ'—কেবল চঞ্চল হয়ে ওঠে সুদূরের দিকে চেয়ে-চেয়ে। কি সে বলবে, কি ভাববে—তার যেন সে দিশা পায় না।[৬৫৩] এ বুঝি 'উশতী জায়া'র মন—একবার পেয়ে হারানোর বেদনায় বিধুর, বুঝতে পারে না 'এই হিয়াদগদগি পরাণপোড়নি কি দিলে হইবে ভাল'। অথবা এ যেন জলকে-চলা কন্যা ('কন্যা বার্ অবায়তী') অপালার মন, বিশ্বের সব বিরহিণীর হয়ে যে বলেছিল, 'পতিকে আর যে আমাদের ভাল লাগছে না। আমরা চলছি···চলছি—কবে ইন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গত হব'।[৬৫৪]

এ-মনও তেমনি অলখের পানে অন্তহীন অভিসারে গচ্ছতি ইর—যেন চলছে···চলছে। চলার আর শেষ নাই। কিন্তু অটুট তার সঙ্কল্প—যার সন্ধানে সে বেরিয়ে পড়েছে, তাকে তার পেতেই হবে। তখনই তার গোত্রান্তর সার্থক হবে রূপান্তরে।

চঞ্চল মনের যে-গতি, তার দার্শনিক সংজ্ঞা হল 'আধী' বা 'বিকল্প'। এই মন স্থির হলে হয় বিজ্ঞান, তখন তার বৃত্তির সংজ্ঞা 'সঙ্কল্প'। সংহিতায় তাকে বলা হয় 'ক্রতু'। মনে আগুন ধরে গেলে সে 'অগ্নি কবিক্রতু'—বিজ্ঞানরূপে সেই তখন পথের দিশারী।

চঞ্চল মন বিজ্ঞানের সাধন বা করণ (instrument)। বিজ্ঞানের সাধনা তখন স্মরের সাধনা। এই স্মরের কথায় ছান্দোগ্যে সনৎকুমার নারদকে বলেছিলেন,[৬৫৫] স্মর আকাশেরও বাড়া। শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল আলোর ঝলক বা ঝলমলানি।[৬৫৬] আমাদের 'স্মৃতি'ও মনের আঁধারে একটা প্রত্যয়ের ঝলক।

প্রাকৃত মনের স্মৃতি বস্তু বা ঘটনাকে আশ্রয় করে জাগে। সে-স্মৃতি অশুদ্ধ, যোগের ভাষায় তা চিত্তের একটা ক্লিষ্ট বৃত্তি।[৬৫৭] কিন্তু এই স্মৃতি যখন বিজ্ঞানের আশ্রয় পায়, তখন তা আর বস্তুর স্মৃতি নয়, ভাবের স্মৃতি। তখন সে ক্ষণিকা নয়, শাশ্বতী। ছান্দোগ্যে একে বলা হয়েছে 'ধ্রুবা স্মৃতি'।[৬৫৮] দর্শনে তার সংজ্ঞা 'প্রত্যভিজ্ঞা' কিনা আবার চিনতে পারা। চিনতে পারা শাশ্বত সত্যের স্বরূপকে—আত্মায়। ঋষি যখন বলেন, 'য়ো হসাব·সৌ পুরুষঃ সো·হহম্ অস্মি', তখন তাঁর এই আত্মপ্রত্যয় প্রত্যভিজ্ঞা বা ধ্রুবা স্মৃতি—যা অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিন কালে ব্যাপ্ত। এই স্মৃতিকে

অভীক্ষ্ণং বা বারবার যা উসকিয়ে তোলে, তা-ই হল **উপস্মৃতি**—যা বিজ্ঞানের বৃত্তি, মনের নয়। গীতায় তাকে বলা হয়েছে 'অনুস্মৃতি'।[৬৫৯] জপ অনুস্মৃতির অনুকূল।

অধিদৈবত এবং অধ্যাত্ম দুটি আদেশ মিলিয়ে ব্রহ্মসাধনার তাহলে একটি ক্রম পাওয়া যাচ্ছে। গোড়ার কথাই হল, তাঁর প্রসাদ ছাড়া তাঁকে পাওয়া যায় না—তিনি যাকে বরণ করেন, সে-ই তাঁকে পায়। তবে কিনা তাঁর বরণের রীতিও বড় বিচিত্র। নচিকেতার মত কিশোরচিত্তে কখন যে শ্রদ্ধার আবেশ হয়, কেউ তা বলতে পারে না। ওই আবেশটুকু হল তাঁর 'কুটো বাঁধা'—আমাকে চিহ্নিত করে দেওয়া তাঁর ব'লে। ফলে জাগে 'অভীপ্সা'—লোকোত্তর একটা কিছু পাওয়ার ইচ্ছা। অভীপ্সা মৃদু হতে পারে, তীব্রও হতে পারে। মৃদু অভীপ্সায় আগুন জ্বলে ধুঁইয়ে-ধুঁইয়ে। তখনই বহিরংগ নানা সাধনার দরকার হয়, যার কথা আচার্য পরে বলেছেন। তীব্র অভীপ্সায় আগুন জ্বলে ওঠে দপ্ করে, আর বিদ্যুতের উদ্ভাসে পথের আদ্যন্ত আলো হয়ে যায়। এই তাঁর সাক্ষাৎ প্রসাদ।

কিন্তু এ থাকে না। তবে কিনা এর পর থেকে অলখের চোখধাঁধানো আলোয় মন চিরকালের জন্য সজাগ হয়ে ওঠে। আর সেইসংগে জাগে 'মনীষা' বা বিজ্ঞান। আলো নাই, কিন্তু তার স্মৃতি আছে। মনীষা মনকে করে সেই স্মৃতির বাহন। আবার স্মৃতি বস্তুর নয়, ভাবের। বারবার অভ্যাসের ফলে ভাবের স্মৃতি পরিণত হয় চিদ্ঘন বাস্তবের সংবিৎএ। ব্রহ্ম তখন করামলকবৎ প্রত্যক্ষ হন।

সিদ্ধির এইটি প্রথম পর্ব। কিন্তু তার পরে আরও কিছু আছে। আচার্য এবার তার কথা বললেন। এইটিই হল কেনোপনিষদের বৈশিষ্ট্য।

কাত্যায়ন বলেছিলেন, এক মহান আত্মাই বৈদিক ঋষির দেবতা—তিনি হলেন সূর্য বা আদিত্য।[৬৬০] আদিত্য তাপ দেন, আলো দেন—এই তাঁর শক্তি এবং মহিমা। কিন্তু তিনি আবার কমল ফোটান—এই তাঁর আনন্দ। কমলের কথা ছান্দোগ্যে আছে—'ব্রহ্মপুরে (অন্তর্হৃদয়ে) দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম' বা ছোট্ট একটি কমলের ঘরের কথা।[৬৬১] হৃদয়ে, এই কমলের ঘরে তাঁকে পাওয়া হল পরম পাওয়া—সমস্ত অংগ প্রাণ ইন্দ্রিয় মন আর মনীষা দিয়ে পাওয়া। হৃদয় দিয়ে পাওয়া হল আনন্দের পাওয়া, রসের পাওয়া। তাইতে পাওয়ার পরিপূর্ণতা।

বেদে হৃদয়ের কথা নানাজায়গায় নানাভাবে আছে। যে-শ্রদ্ধা দিয়ে সাধনার

শুরু, সংহিতায় তাকে বলা হয়েছে 'হৃদয়ের আকূতি'।[৬৬২] অন্যত্র আছে, প্রত্ন পতিকে পাওয়ার জন্য ধীকে মার্জিত করতে হয় মন মনীষা আর হৃদয় দিয়ে।[৬৬৩] অর্থাৎ যেমন হৃদয় দিয়ে বৈদিক সাধনার শুরু, তেমনি হৃদয়ে তার পর্যবসান। উপনিষদে এ-ভাবনা বহুপ্রপঞ্চিত। যে-যাজ্ঞবল্ক্যে ঔপনিষদ-ভাবনা চরম তুঙ্গতায় উঠেছে, তিনিও পাঁচটি ব্রহ্মপুরুষের পর হৃদয়কে ষষ্ঠ ব্রহ্মপুরুষরূপে উপস্থাপিত করে বলছেন, 'হৃদয়েই ব্রহ্মের স্থিততা, হৃদয়ই সর্বভূতের আয়তন এবং প্রতিষ্ঠা'।[৬৬৪]

তৈত্তিরীয়োপনিষদে ব্রহ্ম রসস্বরূপ।[৬৬৫] সংহিতায় অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে এই রস 'ইন্দ্রিয়ো রসঃ' বা 'সোম্যং মধু' যা ঋতকামের সবকিছুকে মধুময় করে তোলে।[৬৬৬] তা-ই তৈত্তিরীয়োপনিষদের অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বিজ্ঞানের পর আনন্দ। আর এই ব্রহ্মপুরে সে-আনন্দের প্রতিষ্ঠা হৃদয়ের ওই ছোট্ট কমলের ঘরে, দেবতা যেখানে আকাশ হয়ে নেমে আসেন। সেখানে, তাঁকে পাওয়ার যে-আনন্দ, সংহিতায় তার উপমান হল উশতী এবং সুবাসা জায়ার হৃদয়ের গভীরে নিবিড় স্পর্শে পতিকে পাওয়ার আনন্দ।[৬৬৭]

এই মধুরা রতির কথা সংহিতার নানাজায়গায় আছে। বৃহদারণ্যকেও আছে স্ত্রীর আকাশের আপূরণের কথা, প্রজ্ঞানের পরম অনুভবের সঙ্গে সম্পরিষ্বঙ্গের উপমা।[৬৬৮] উপলব্ধির এই পরিপূর্ণতার দিকে ইশারা করে আচার্য এবার বলছেন আদেশের উত্তরভাগ ঃ

তদ্ধ তদ্ বনং নাম। তদ্ বনম্ ইত্যুপাসিতব্যম্। স য় এতদ্ এবং বেদ, অভি হৈ নং সর্বাণি ভূতানি সংবাঞ্ছন্তি॥ ৬

—সেই (ব্রহ্ম) হলেন গিয়ে সেই বঁধু। 'সেই বঁধু' এই ভাবনায় তাঁর উপাসনা করবে। যে নাকি এঁকে এমনি করে বোঝে, সর্বভূতও তেমনি সবরকমে তাঁকেই চায়।

ব্রহ্ম 'যক্ষ' বা অনির্বচনীয় এক রহস্য। অন্তর্যামিরূপে তিনিই আমাদের প্রশাস্তা, কিন্তু সাধনার প্রথম পর্বে তিনি 'সন্নিহিত হয়েও গুহাচর'[৬৬৯]—তাঁর জয়ন্তী শক্তি আমাদের মধ্যে কাজ করে যায় নেপথ্য থেকে। বৈদিক ভাবনায় এই হল 'সবিতার প্রসব'—দেবতা যখন চক্রবালের নীচে থেকে অলক্ষ্যে আলো ছড়ান।[৬৭০] সাধনায় আমাদের অহংকার হয় পুরোধা। কিন্তু 'এ-অহং কার?' তাঁরই অহং প্রতিবিম্বিত হয় আমাদের অহংএ। এই কথাটি জানিয়ে দিতে দেবযানের প্রত্যন্তে তাঁর প্রথম 'অগ্নি'-যক্ষরূপে। তাঁর আবির্ভাবে 'দ্যুলোক

অপহততমস্ক হয়', কিন্তু পৃথিবীতে তখনও আঁধার থাকে।[৬৭১] তাই পার্থিব বাক্ বা প্রাণ দিয়ে আমরা তাঁকে জানতে পারি না—অথচ লোকোত্তরের হাতছানি আমাদের কাছে দুর্বার হয়ে ওঠে। অবশেষে তাঁরই অবিনাভূতা শক্তির কাছে আমরা তাঁর পরিচয় পাই শুদ্ধমনের মাধ্যমে। এই শক্তিপাত তাঁর প্রসাদ—আমাদের মধ্যে বিদ্যুৎঝলকে তাঁর দ্বিতীয় আবিঃ।

এই পর্যন্ত তাঁর দেবলীলা—তাঁর 'রূপং দেবেষু'। আমাদের সাধনায় এটি গোত্রান্তরের পর্ব। এর পর তাঁর মর্ত্যলীলা বা নরলীলা, জানতে হবে 'য়দ্ অস্য অহম্'—আমি তাঁর কে। তাইতে আমার রূপান্তর।

আবার গোড়া হতে পথ চলা। কিন্তু এবার দিশারী আমার অহংকার নয়—তাঁর সেই বিদ্যুতের উদ্ভাস। তার আলোয় পরিশুদ্ধ মনের উজানে ফুটল মনীষা, উতলা মনকে সে করল স্মৃতির বাহন। অভ্যাসে স্মৃতি হল উপস্মৃতি—তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন এক প্রতিবোধময় মনন। অবশেষে দামিনীদমক হল স্থিরা সৌদামিনী। ফুটল ধ্রুবা স্মৃতি—হৃদয়ের আকাশে প্রজ্ঞানের অরোরা। মনীষার সাধনায় মনোময় মানুষ দেবতা হল।

নরলীলার এই পূর্বভাগ। উত্তরভাগ হল দেবতা হয়ে দেবতাকে পাওয়া মানুষের মত করে। মানুষ তখন আধখানি দেবতা, আধখানি মানুষ। সংহিতায় তার সংজ্ঞা হল 'অর্ধদেব'। মা পুরুকুৎসানীর সাধনার ফলে ত্রসদস্যু এমনিতর অর্ধদেব হয়েছিলেন—তার আধখানি মানুষ, আধখানি বৃত্রহা ইন্দ্র।[৬৭২] দেবতার সঙ্গে তখন মানুষের লীলা, আবার মানুষের সঙ্গে দেবতার লীলা। এই হল মানুষের অধ্যাত্মসাধনার পরমাসিদ্ধি—ব্রহ্মাত্মভাব এবং সর্বাত্মভাবের সার্থক রূপায়ণ মানুষী তনুর আশ্রয়ে। আর তার সাধন হল হৃদয়—যা মন ও মনীষার ওপারে এবং গভীরে।

দেবতার আধখানি হয়ে তাঁর কামনার সঙ্গে আমার কামনাকে মিশিয়ে দিয়ে,[৬৭৩] তাঁর হৃদয়ের অতলের নিবিড় স্পর্শ পেয়ে, তখন বুঝতে পারি তিনি আমার কে, আমিই-বা তাঁর কি।

তদ্ ৱনম্—তিনি আমার অপরূপ বঁধু। আচার্যের এটি একটি 'আদেশ'—যক্ষেরই মত রহস্যময়।

'বন বেদের একটি বহুপ্রযুক্ত শব্দ—সাধারণত বোঝায় গাছ বন বা কাঠ। ঋক্‌সংহিতায় তার চারটি রূপ পাওয়া যায়—'ৱন্' 'ৱন' 'ৱনা' 'ৱনস্'।[৬৭৪] অগ্নির জন্ম হয় দুটি অরণি হতে—দুটিই 'বন'। তার মধ্যে একজায়গায় অধরারণিকে বলা হয়েছে 'সুভগা ৱনা'। শব্দটি তখন স্ত্রীলিঙ্গ। অগ্নি দুটি বনের নবজাতক, সুতরাং দুটিতে একটি মিথুন কল্পনা খুবই স্বাভাবিক। বৃক্ষবাচী 'বন' শব্দের ব্যুৎপত্তি যা-ই হ'ক, মিথুন-ভাবনা থেকে তার মধ্যে

মরমীয়ার দৃষ্টিতে কামনার ব্যঞ্জনা এসে গেছে। এইথেকে 'ৱনস্'-সঞ্জার উৎপত্তি, যার একটি প্রয়োগ ঋক্‌সংহিতায় পাওৱা যায় 'প্রীতি' বা 'রতি' অর্থে। লক্ষণীয়, অগ্নির অতিপ্রাচীন নাম 'ৱনস্পতি'। মনে হয়, এখানে 'ৱনস্' শব্দের মধ্যে ইন্ধন এবং কামনা দুটি অর্থ এসে মিলেছে। এ-কামনা উপনিষদের ভাষায় উপাসকের 'অভীপ্সা'—অগ্নি যার দেবতা; অরণিমন্থন অভীপ্সাকে প্রজ্বল ক'রে তাকে পেঁছে দেয় আদিত্যে। অগ্নি তখন উপাসকের দিশারী, তার অভীপ্সার নায়ক অতএব 'ৱনস্পতি'। এই ভাবটি বেদে বহুপ্রপঞ্চিত।

'কামনা করা' 'চাওৱা এবং পাওৱা' বোঝাতে বেদে 'ৱন্' ধাতুর অনেক প্রয়োগ আছে।[৬৭৫] এর প্রাচীনতর রূপ হল 'ৱেন্'।[৬৭৬] তা থেকে 'ৱেন' বঁধু—স্ত্রীলিঙ্গে 'ৱেনা' বা 'ৱেনী' প্রিয়া।[৬৭৭] দেবতারা 'ৱেন'—বিশেষ করে সূর্য এবং সোম।[৬৭৮] সোমের বেনা বা বধূ সূর্যা—যাঁর বিবাহের বর্ণনা ঋক্‌সংহিতায় আছে এবং যা আজও লৌকিক বিবাহের আদর্শ।[৬৭৯] তাছাড়া বামদেব গৌতম সন্ধাভাষায় রচিত তাঁর একটি সূক্তে বলছেন,[৬৮০] 'গোতে যে-ঘৃত ছিল, পণিরা তাকে লুকিয়ে রেখেছিল তিন ভাগে। কিন্তু দেবতারা তা খুঁজে পেলেন। ইন্দ্র একভাগকে জন্ম দিলেন, সূর্য একভাগকে। আরেক ভাগকে দেবতারা কুঁদে বার করলেন বেন হতে—আত্মস্থিতির বীর্যে।' এখানে বেন কে, তা রহস্যময় রাখা হয়েছে। তিনি সোম হতে পারেন। তাহলে তিনি সূর্যের বা মিত্রের ওপারে—বরুণের অধিকারে। আগেই বলেছি, বরুণ 'ম্রক্ষিন্' বা মায়াবী। সোম তাহলে তাঁর 'যক্ষ' বা মায়াশক্তি। কেনোপনিষদের দেবতা-বিন্যাসের সঙ্গে এখানকার দেবতাবিন্যাসের বেশ মিল পাওৱা যায়। সেখানে অন্তিম পর্বে তিনজন দেবতা—ইন্দ্র দেবী এবং যক্ষ। দেবী এখানকার সূর্য, আর যক্ষ বেন। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে শুদ্ধমন, প্রজ্ঞান আর মধুরা রতি। যক্ষের কথায় দেবী বলেছিলেন, এই ব্রহ্ম। এ-পরিচয় মনের কাছে মনীষার। শেষের পরিচয় দিলেন আচার্য। বললেন, এই যক্ষ 'তদ্ ৱনম্'—সেই বন বা বেন বা বঁধু, উশতী জায়ার মত সবার হৃদয় আউলিয়ে যায় যাঁর জন্য। তাঁর আকর্ষণে সামের সুর, দুটিতে এক হয়ে যাওৱার সুর।

আচার্যের এই আদেশ ঋকসংহিতার একটি মন্ত্রকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ঋষির প্রশ্ন, সৃষ্টির মূলে কি? 'কিং স্মিদ্ ৱনং ক উ স বৃক্ষ আস য়তো দ্যাৱাপৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ, মনীষিণো মনসা পৃচ্ছতে-দ্ উ তৎ।'[৬৮১] প্রশ্নটি এখানে উপাদানের—বন বিশ্বমূল অব্যাকৃত উপাদান। সংহিতায় এই উপাদান কোথাও 'সলিল', কোথাও-বা 'রশ্মি'।[৬৮২] লক্ষণীয়, নিঘণ্টুতে বনের দুটি অর্থ দেওৱা হয়েছে—উদক এবং রশ্মি।[৬৮৩] অর্থ দুটি স্পষ্টতই রাহস্যিক এবং তা উপরি-উক্ত প্রকরণে বিশেষ করে খাটে। এমনিতর রাহস্যিক অর্থের উদ্দেশ

নিঘণ্টুতে অনেক পাওয়া যায়—যার দিকে আধুনিক পণ্ডিতেরা নজর দেন না। উদক ও রশ্মি যথাক্রমে প্রাণ ও প্রজ্ঞার প্রতীক। বনের তাহলে তিনটি অর্থ এখানে পাওয়া যাচ্ছে—জড়ভুত, প্রাণ এবং চৈতন্য। সংহিতার অন্যত্র সৃষ্টি-প্রকরণে এদের যথাক্রমে বলা হয়েছে অসৃক্ (রক্ত), অসু (প্রাণ) এবং আত্মা।[৬৮৪] আমরা এখন বলি জড় শক্তি ও চৈতন্য।

সৃষ্টিমূল বনের এই তিনটি অর্থই এখানে আচার্যের বিবক্ষিত। অধিকন্তু চৈতন্যের দিক থেকে বনের অর্থ রতি বা প্রীতি। এই অর্থবিবক্ষার একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে ফলশ্রুতিতে **সংবাঞ্ছন্তি** পদের ব্যবহারের মধ্যে। 'বাঞ্ছ্' ধাতুটি বৈদিক সাহিত্যে বিশেষ পাওয়া যায় না—কিন্তু ঋক্‌সংহিতায় তার একটি প্রয়োগ আছে যা নিঃসন্দেহে কেনোপনিষদের প্রয়োগটির আকর। ধ্রুব আঙ্গিরস রাজাকে সম্বোধন করে বলছেন, 'বিশস্ ত্বা সর্বা বাঞ্ছন্তু'—জনসাধারণ সবাই যেন তোমায় ভালবাসে।[৬৮৫] উপনিষদের উক্তিও অনুরূপ।

এখন বাঞ্ছ্ ধাতুটি বস্তুত এসেছে বন্ ধাতু থেকেই—তার উত্তরে অধুনা-লুপ্ত 'স্ক' (=চ্ছ, তু. অচ্ছ, গচ্ছ, ইচ্ছ, যচ্ছ ইত্যাদি) বিকরণ যোগ করে। ধাতুটির অর্থ তাহলে 'কামনা করা, ভালবাসা, চাওয়া এবং পাওয়া'। শৌনক-সংহিতার একজায়গায় দেখি, প্রিয়াকে সম্বোধন করে পুরুষ বলছে, 'বাঞ্ছ মে তন্বং পাদৌ, বাঞ্ছাক্ষ্যৌ (দুটি চোখ), বাঞ্ছ সক্‌থ্যৌ' (দুটি উরু)। ওই একই সূক্তের শেষে, 'ভালবাসা' অর্থে 'সং-বন্' ধাতুর ব্যবহার আছে।[৬৮৬]

উপনিষদের ফলশ্রুতিতে উল্লিখিত বাঞ্ছ্ ধাতুর অনুষঙ্গে 'বনম্'-সংজ্ঞার প্রচলিত অর্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরেকটি অর্থ দাঁড়ায় রতি ও প্রীতি, আনন্দ এবং প্রেম। ব্রহ্ম 'তৎ' কিনা অনির্বচনীয় এবং 'বনম্' কিনা একাধারে বিশ্ববৃক্ষ এবং আনন্দ ও প্রেম। বৈদিক ভাবনায় ব্রহ্মবৃক্ষ পিপ্পল, উদুম্বর বা অশ্বত্থ, বৌদ্ধ ভাবনায় ন্যগ্রোধ বা ঝুরিনামা বট, আর ভাগবতদের একসময় ছিল 'শিংশপা' বা শিশু, পরে হয়েছে কদম্ব।[৬৮৭] ঋক্‌সংহিতায় এই বৃক্ষের বর্ণনায় বলা হয়েছে, 'মধুভোজী সুপর্ণেরা সব বাসা বাঁধছে আর ডিম পাড়ছে এই গাছে, আর তার আগায় ফলে আছে যাকে বল সেই স্বাদু পিপ্পল'। এ আবার দেহবৃক্ষও, যাকে জড়িয়ে আছে নিত্যযুক্ত সখার মত দুটি পাখি—তাদের একটি 'পিপ্পলাদ', আরেকটি 'অনাশক'।[৬৮৮] দুটি বৃক্ষই মধুর নির্ঝর।

ধাতুপাঠে বন্ ধাতুর অর্থ 'সংভক্তি' বা অনুপ্রবেশ। এই অর্থ আদিত্যে ব্রহ্মদৃষ্টির অনুকূল। আদিত্যের তিনটি বিভাব বৈদিক উপাসনায় প্রাধান্য পেয়েছে—সবিতা, ভগ এবং বিষ্ণু। সবিতা নেপথ্যচর—তাঁকে চোখে দেখি না কিন্তু তাঁর আভাস পাই। তার পরেই আদিত্য 'ভগ'—চক্রবাল বিদীর্ণ করে তিনি উপরে উঠে আসেন, তাঁকে তখন চোখে দেখি। সংজ্ঞাটির ব্যুৎপত্তিগত

অর্থ, 'যিনি ভেঙে ঢোকেন' বা আবিষ্ট হন। এই তাঁর 'সংভজন'। অধ্যাত্ম-দৃষ্টিতে তাঁর স্থান হৃদয়ে, কেননা এইখানেই তাঁর প্রথম প্রকাশ—আমাদের শ্রদ্ধা এবং আকৃতির ভিতর দিয়ে। বিষ্ণুতে তাঁর প্রকাশের পূর্ণতা; তিনি তখন মাধ্যন্দিন সূর্য। ঋক্‌সংহিতায় বিষ্ণু 'যুবা অকুমারঃ'।[৬৮৯] আর উদীয়মান আদিত্য বলে ভগ 'কুমার' এবং তাইতে তিনি 'প্রাতর্জিৎ'[৬৯০] কিনা বালসূর্য। এই ভগই 'ভগবান্'—ভাগবতদের পরমদেবতা। 'বন' বা 'বেন' যেমন বঁধূ, ভগও তেমনি বঁধূ—এই অর্থে সংহিতায় শব্দটির প্রয়োগ আছে। বিশেষ করে তিনি 'ভগঃ কনীনাম্'—কুমারী মেয়েদের বঁধূ।[৬৯১]

আদিত্যদৃষ্টিতে কেনোপনিষদের 'যক্ষ' সবিতা, আর 'বন' ভগ। আমরা তাঁকে চাই বলে তিনি 'বন', আর তিনি আমাদের মধ্যে সন্নিবিষ্ট বলে 'ভগ'। কিন্তু এই ভগ কেবল বালসূর্য নন, তিনি আদিত্যের পূর্ণ প্রকাশ। জৈমিনীয়োপনিষদে দেখি, সবিতার পরেই বিষ্ণু এবং 'মধ্যন্দিনে ভগঃ'।[৬৯২] অর্থাৎ ভগকে স্থাপন করা হয়েছে আদিত্যচেতনার তুঙ্গতায়। এই ভাবনা অভিনব। কিন্তু কেনোপনিষদে এই ভাবনাই অনুসৃত হয়েছে। সেখানে 'যক্ষে' ব্রহ্মের আভাস, 'বিদ্যুতে' উদ্‌ভাস আর 'বনে' তাঁর প্রভাস। তিনি আমার ভালবাসার ধন—এই তাঁর পরম পরিচয়।

ভগ উদীয়মান সূর্য আর ভগ মাধ্যন্দিন সূর্য—এই দুটি প্রকল্পে কোনও বিরোধ নাই। অধ্যাত্মসাধনায়, যিনি আদি তিনিই অন্ত—এই ভাবনার উপর তাদের ভিত্তি। ভগের সহচর সবিতাও ঋক্‌সংহিতায় যেমন উদিয্যান্ সূর্য, তেমনি আবার 'দেবগন্ধর্ব' বিশ্বাবসু রূপে মাধ্যন্দিন সূর্যও—এমন-কি অস্তমিত সূর্যও তিনি।[৬৯৩] অগ্নি যেমন 'উষর্ভুৎ' বা উষায় জাগেন, তেমনি বৈশ্বানররূপে তিনি মাধ্যন্দিন সূর্য—যিনি আমাদের সাধনার চরম লক্ষ্য; এমন-কি রাত্রিতে তিনিই লোকোত্তর জ্যোতি।[৬৯৪] ভগও তেমনি বালসূর্য যুবসূর্য এবং শৌনকসংহিতায় অন্ধ সূর্যও।[৬৯৫] তাঁর অন্ধতা ছান্দোগ্যবর্ণিত আদিত্যপুরুষের পরঃকৃষ্ণ নীলিমার সূচক। আবার শৌনকসংহিতার ওই সূক্তেই ভগের 'বৃক্ষ'-সম্পর্কের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে—যেন তিনি বৃক্ষদেবতা ('ভগো বৃক্ষেষ্বা.হিতঃ')। সুতরাং 'বন' সংজ্ঞার দুটি অর্থ বৃক্ষ (বা কাঠ) এবং বঁধূ ভগের বেলাতেও পাচ্ছি। তাইতে মনে হয়, কেনোপনিষদের আদেশটিতে ব্রহ্মের 'বন' সংজ্ঞায় আদিত্যপক্ষে যে-দেবতা দ্যোতিত হচ্ছেন, তিনি 'ভগ' বা ভাগবতদের ভগবান্। তিনি আনন্দের দেবতা, প্রেমের দেবতা—যে-আনন্দ এবং প্রেম মাধ্যন্দিন সূর্যের মত ভাস্বর।

আচার্য বলছেন, সেই **তৎস্বরূপকে উপাসনা** করবে **বন**রূপে—বিশ্বের উপাদানরূপে এবং পরমার্থরূপে। সে-পরমার্থ হল রতি এবং প্রীতি। তা-ই রস। 'তিনি রসস্বরূপ'।[৬৯৬] অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে এই রস 'সোম্যং মধু', অধ্যাত্ম-দৃষ্টিতে 'অমৃত আনন্দ'।[৬৯৭] আবার এরই নাম 'সম্প্রসাদ'।[৬৯৮]

এই 'বনে' বা আনন্দব্রহ্মে যিনি রমমাণ, তিনি 'উত্তমপুরুষ'।[৬৯৯] তিনি অন্তরারাম হয়েই বাইরে বিচরণ করেন[৭০০] সামময় শরীর নিয়ে—যা একটা অশরীর সুরের কম্পন।[৭০১] সে-সুর অলক্ষ্যে সবাইকে আকুল করে তোলে। তিনি তখন ব্রহ্মের মত **সর্বভূতবাঞ্ছিত** 'বেন' বা বঁধু—যিনি সবাইকে যেন বাঁশির সুরে নিজের মধ্যে আকর্ষণ করে আনেন।

আচার্যের দেশনা শেষ হল। সামের উদ্‌গীথ যেমন নিধনে মিলিয়ে যায়, তেমনি তাঁর ব্রহ্মঘোষ মিলিয়ে গেল আকাশের শূন্যতায়। আচার্য স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। তাঁর হৃদ্যসমুদ্র এক গহন গভীর আনন্দে টলমল। তার উপর বারবার ঝলক হানছে সেই বঁধুর 'অতিচ্ছন্দা অপহতপাপ্মা অভয় রূপে'র বিদ্যুৎ, সম্পরিষ্বঙ্গের অবগাঢ়তায় জড়িয়ে ধরছে তাঁকে। কি যে অন্তর আর কি যে বাহির, কিছুই তিনি বুঝতে পারছেন না।[৭০২] এই কি তিনি বলতে চেয়েছিলেন? অলখের স্পর্শে উশতী জায়ার হৃদয়ের নিবিড়ে যে রসের সমুদ্র উথলে ওঠে, মুখ ফুটে তার কথা কি বলা যায়? রসের অনুশাসন কি সম্ভব কখনও?[৭০৩] তবুও অক্ষেত্রবিৎএর নির্বন্ধে ক্ষেত্রবিৎ চুপ করে থাকতেও তো পারেন না। অনুশাসনের তখন এইটুকুই ভাল যে বিদ্যুৎ-ধারাদের কিছুটা আভাস বুঝি তাকে দেওয়া যায়।[৭০৪]...জানিনা, আমি দিতে পেরেছি কিনা।

যম নচিকেতা বলেছিলেন, 'কত লোক সেই অলখের কথা শুনতেও পায় না। আর যারা শোনে, তারাও কি সবাই বুঝতে পারে? যে বলে, সে আশ্চর্য; আর তাইতে যে তাঁকে পায়, সে কুশল। আবার অনুশাস্তাও কুশল; তাঁর অনুশাসনে যে জানে, সেও আশ্চর্য।'[৭০৫]

শাক্তের শক্তিপাতে শিক্ষমাণ[৭০৬] যেন এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ছিলেন। হঠাৎ-জাগা প্রতিবোধের উদ্ভাসে তাঁরও চেতনার দিগন্ত যেন থরথর করে কাঁপছে। ওই যে নৃত্যের ছন্দে বিক্ষিপ্ত উষার পেশোয়াজ, ওই খসে পড়ল বুকের আঁচল।[৭০৭] কিন্তু এ কি, পলক না ফেলতেই কোথায় সব মিলিয়ে গেল। আর্তকণ্ঠে অন্তেবাসী ফুকরে উঠলেন:

উপনিষদং ভো ব্রূহী.তি।

—(আমায়) উপনিষৎ বল, ঠাকুর।

আচার্য গভীরস্বরে বললেন,

উক্তা ত উপনিষৎ। ব্রাহ্মীং বাব ত উপনিষদম্ অব্রূমে·তি ॥ ৭

—তোমাকে (তো) উপনিষৎ বলা হয়েছে। ব্রাহ্মী উপনিষৎই তো তোমায় বললাম।

আচার্য শান্ত, অন্তেবাসী শিক্ষমাণ। একজন শক্তি সঞ্চার করেন, আরেকজন তা গ্রহণ করেন। শক্তিসঞ্চারের তিনটি পর্ব—অনুশাসন, আদেশ এবং উপনিষৎ।[১০৮] অনুশাসন অন্তেবাসীতে আধান করে 'শ্রদ্ধা', আদেশ 'বিদ্যা', আর উপনিষৎ 'বীর্য'।[১০৯] উপনিষদের পরিণাম সাযুজ্যজনিত রূপান্তর।

অন্তেবাসীর জিজ্ঞাসার উত্তরে আচার্যের অনুশাসন যক্ষোপাখ্যানের বিবৃতি পর্যন্ত। আচার্য 'নেতি নেতি' করে বুঝিয়ে দিলেন, ব্রহ্মপুরুষদের দ্বারা সাক্ষাৎভাবে ব্রহ্মকে পাওয়া যায় না। অবশ্য শুদ্ধমন ব্রহ্মোপলব্ধির প্রকৃষ্ট সাধন। কিন্তু সে-মন যদি প্রতিবোধের সংবিৎ দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়, তবেই তার দ্বারা অমৃতস্বরূপকে পাওয়া যায়। এই প্রতিবোধ যেন আকাশে ঊষার আলো, যা ক্রমে মাধ্যন্দিনদ্যুতিতে ভাস্বর হয়ে উঠবে।

অন্তেবাসী শ্রদ্ধাসহকারে এই অনুশাসনকে স্বীকার করার পর এল আচার্যের আদেশ—যা তন্ত্রের মান্ত্রী দীক্ষার পর শাক্তী বা বেধী দীক্ষার অনুরূপ। আচার্যের শক্তি অনুবিদ্ধ হল অন্তেবাসীতে, তাঁর চেতনায় দেবযানের পথ ঝলকে-ঝলকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

এর পর আর-কিছু করবার থাকে না। তন্ত্রে আছে, তারও পরে শাম্ভবী দীক্ষার কথা। কিন্তু সে-দীক্ষা সহজের দীক্ষা। যে-ভূমিতে সে-দীক্ষা হয়, 'সে বড় বিষম ঠাঁই, গুরু-শিষ্যে দেখা নাই'। রেতোধা পর্জন্যের ধারাসারে অভিষিক্তা রোমাঞ্চিতা পৃথিবীর এখন কেবল গজলক্ষ্মী কমলায় রূপান্তরিতা হবার প্রতীক্ষায় বসে থাকা। দীর্ঘতমা ঔচথ্যের ভাষায়, 'আমি ছিলাম নিতান্তই কাঁচাবুদ্ধির। আর তিনি ধীমান্, বিশ্বভুবনের রাখালরাজা। এইখানে তিনি আমার মধ্যে আবিষ্ট হলেন।'[১১০] তাঁর এই আবেশ, আমাতে তাঁর এই বীর্যাধান—এই তাঁর উপনিষৎ। এ-উপনিষৎ অমানব, দিব্য[১১১]—তন্ত্রের ভাষায় শম্ভুই এখানে আচার্য। তার একধাপ নীচে 'আদেশো উপনিষদাম্'।[১১২]

কিন্তু জীবনের এই-যে পরম লগ্ন, অলখের এই-যে 'নিস্পৃক্' বা সুনিবিড় স্পর্শ, অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত এই-যে রোমাঞ্চন—এও কি শুধু বিদ্যুতের বিদ্যোত? যে-চোখের আলোয় এ-চোখ পুরে উঠেছিল,[১১৩] সে-চোখে নিমেষ পড়ল কেন?

'**উপনিষদের** অগ্নিবীর্য সন্দীপ্ত কর তোমার বাকে, হে ঠাকুর'।[১১৪]

প্রশান্তকণ্ঠে আচার্য বললেন, 'আগুন তো জ্বলেছে। যা বলবার, সবই তোমায় বলেছি। **ব্রহ্মের উপনিষদে** সন্দীপ্ত বাক্-ই তো তোমায় শুনিয়েছি।

'আর আমার বলবার কিছুই নাই। যাঁর এষণায় যাঁর প্রেষণায় তোমার মন অসীম শূন্যে ডানা মেলে দিয়েছিল, তাঁর সঞ্জীবন স্পর্শ তুমি পেয়েছ।

'এখন প্রতিবোধবিদিত মননের দ্বারা সে-স্পর্শকে তুমি লালন কর। অলখকে অলখ জেনেই আবার মনের পাখি অনন্তে ভেসে যাক। উপস্মৃতির ঝলকে-ঝলকে বারবার তোমার পথ আলো হয়ে উঠবে।

'আর এমনি করে সহজের স্রোতে ভাসতে যদি না পার, তাহলে আবার গোড়া হতে শুরু কর। জেনো,

তস্যৈ তপো দমঃ কর্মে তি প্রতিষ্ঠা। বেদাঃ সর্বাঙ্গানি। সত্যম্ আয়তনম্ ॥ ৮

—এই (উপনিষদের) প্রতিষ্ঠা হল তপ দম (এবং) কর্ম। বেদেরা (তার) সমস্ত অঙ্গ। সত্য (তার) আয়তন।

'যক্ষের উপাখ্যানে বহুশোভমানা যে-দেবীর কথা শুনিয়েছিলাম, তিনিই ব্রাহ্মী উপনিষৎ। তিনিই বাক্, তিনিই সাবিত্রী, তিনিই গায়ত্রসাম। তোমার আকাশে বিদ্যুৎ হয়ে বারবার তিনিই ঝিলিক হানবেন, পৃশ্নি হয়ে অস্পর্শের স্পর্শে বারবার তোমায় রোমাঞ্চিত করবেন।

'তোমার বিনিদ্র অজল্প সাধনাই[১১৫] তাঁর **প্রতিষ্ঠা**। তার তিনটি অঙ্গ— তপ কর্ম এবং দম। দেহে অগ্নিসমিন্ধনই **তপ**[১১৬]—জাতবেদা বৈশ্বানর তার দেবতা। যজ্ঞই **কর্ম**[১১৬]—যাতে মানুষ নিজের জন্য কিছুই না রেখে দেবতাকে সব দেয়। এ-ই প্রাণের কর্ম—মাতরিশ্বা তার দেবতা। যজ্ঞেই প্রাণের ঊর্ধ্বায়ন। মানুষ দেবতাকে যা দেয়, দেবতার প্রসাদে সমৃদ্ধ হয়ে আবার তার কাছে তা ফিরে আসে। কিন্তু সে-ঋদ্ধিকে সম্ভোগ করতে হয় সংযত হয়ে। তা-ই **দম**, যা দেবোচিত ধর্ম।[১১৮] এ-ধর্ম মনের—মঘবা তার দেবতা।

'এই তিনটি সাধনাঙ্গের দ্বারা ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই তিনটি লোক জয় করা যায়। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তিনটি লোক যথাক্রমে দেহ প্রাণ এবং মন। তাদের ঈশ্বর হওয়াই লোকেশ্বর হওয়া। অধ্যাত্মচেতনার অধিলোকব্যাপ্তিতে তা সম্ভব। ব্যাপ্তিচৈতন্যই **বেদ**। দেবী বেদময়ী—বেদ তাঁর **অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ**। বেদ যেমন ব্রহ্ম, তেমনি বাক্। দুয়ের সমাহার 'ওম্' এই অক্ষরে। দেবী ওঙ্কাররূপিণী।

'আর শেষ কথা, **সত্যই** দেবীর **আয়তন** বা ধাম—তিনি সত্যে আছেন।

ঋতের নিত্যসহচর এই সত্য বিশ্বভুবনের মূলাধার, তৎস্বরূপের নিত্যপ্রজ্বল তপঃশক্তির প্রচ্ছটা।[১১৯] আবার এই সত্য তোমার হৃদয়। এই হৃদয় ব্রহ্ম, এই হৃদয়ই সব-কিছু। এই সত্য-ব্রহ্ম সেই প্রথমজ মহৎ যক্ষ, যাঁর আখ্যায়িকা তোমায় শুনিয়েছি।[১২০]

'যক্ষ, দেবী আর তোমার হৃদয়—তিনে এক, একে তিন। এ-ই সত্য।'

আচার্যের অনুশাসন শেষ হল। এর পর ফলশ্রুতি ঃ

য়ো ৱা এতাম্ এৱং ৱেদ, অপহত্য পাপ্মানম্ অনন্তে স্বর্গে লোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ৯

—যে এই (উপনিষৎকে) এইভাবে বোঝে, পাপকে হটিয়ে দিয়ে অনন্ত স্বর্গলোকে অপরাজিত লোক সে প্রতিষ্ঠিত হয়।

জীবনের যা-কিছু দুর্গতি বা দুর্গতির কারণ, তা-ই বেদে 'পাপ' বা **পাপ্মা**। পাপ মর্ত্যজীবনের 'অভিশস্তি' বা অভিশাপ[১২১]—তা দেহে প্রাণে বা মনে যে-আকারেই দেখা দিক না কেন। পাপের বিপরীত **স্বর্গলোক**—যা পৌরাণিক স্বর্গ নয়, কিন্তু বৈদিক অমৃত আনন্দ লোক, যেখানে অজস্র জ্যোতি তৃপ্তি স্বধা কামচার এবং আপ্তকামতা।[১২২] এ-স্বর্গলোক **অনন্ত**—এখানকার আলো কখনও নেবে না। বিদ্যুতের উদ্ভাসেই সে আলো ফুটে ওঠে—কিন্তু সে-বিদ্যুৎ 'সকৃদ্বিদ্যুৎ', যা আকাশে একবার চমক হেনেই স্থির হয়ে যায়।[১২৩] আর এ-লোক **অজ্যেয়** বা ব্রহ্মের 'অপরাজিতা পুরী'[১২৪]—বৃত্রের অভিযান যেখানে পেঁছিয় না।

ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী বহুশোভমানা উমা হৈমবতী দেবীকে যে পায়, এই লোকে তার প্রতিষ্ঠা।

শান্তিপাঠ

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি ৱাক্ প্রাণশ্ চক্ষুঃ শ্রোত্রম্ অথো বলম্ ইন্দ্রিয়াণি চ সর্ৱাণি। সর্ৱং ব্রহ্মৌপনিষদম্। মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য়াং, মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ। অনিরাকরণম্ অস্তু, অনিরাকরণং মে ঽস্তু। তদাত্মনি নিরতে ময়ি য় উপনিষৎসু ধর্মাস্, তে ময়ি সন্তু, তে ময়ি সন্তু। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

উপসংহার

এইখানেই উপনিষদের শেষ। তার মূল কথাগুলি এই ঃ

কেনোপনিষদের আকর হল জৈমিনীয়োপনিষৎ। আরণ্যক-ধর্মী এই উপনিষৎখানিতে সামরহস্য প্রপঞ্চিত হয়েছে। সামগান একটি নান্দন-শিল্প—সোম্য আনন্দ তার উৎস। কেনোপনিষদের ব্রহ্ম এই আনন্দের ঘনবিগ্রহ।

প্রত্যেক উপনিষদে ব্রহ্মবীজবাচক একটি মহাবাক্য থাকে—যেমন ঈশোপনিষদে 'য়ো হসাব্‌সৌ পুরুষঃ সোহহম্ অস্মি', ঐতরেয়োপনিষদে 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম'। তেমনি কেনোপনিষদের মহাবাক্য হল 'তদ্ বনম্'—অনির্বচনীয় ব্রহ্ম আমাদের বঁধু, আমাদের 'ভগ'। আনন্দ এবং প্রিয়তা তাঁর স্বরূপ। বিশ্বে বৃহৎসামের সুরমূর্ছনায় তার প্রকাশ।

সেই সুরের এষণায় এবং প্রেষণায় আমাদের মন প্রাণ বাক্ চক্ষু এবং শ্রোত্র উতলা হয়ে ওঠে। কিন্তু মর্ত্য পৃথিবীর ছোঁয়াচ যতক্ষণ পর্যন্ত থাকে, ততক্ষণ তারা বঁধুকে পেয়েও পায় না।

তাঁকে পাওয়া যায়, মন যখন তাঁর প্রসাদে এবং সংকর্ষণে প্রাণ-শরীর-নেতা হয়ে উত্তীর্ণ হয় প্রতিবোধের ভূমিতে। প্রতিবোধ দিয়ে পাওয়া হল মন ও মনীষাকে ছাপিয়ে হৃদয় দিয়ে পাওয়া।

এই পাওয়ার চরমে লোকোত্তরের মহাশূন্যতায় 'দিবো দুহিতা'র উপচীয়মান প্রচ্ছটায় ফুটে ওঠে যক্ষ আর উমার যুগনদ্ধ রূপ। আকাশে প্রজ্ঞাত্মক প্রাণের চিদ্‌বিলাস দ্যুলোকে অন্তরিক্ষে পৃথিবীতে, দেহে প্রাণে মনে বিরামবিহীন ওংকারগুঞ্জনে তোলে গায়ত্রসামের ঝঙ্কার।

টীকা

সংকেত-পরিচয়

ঈ.	ঈশোপনিষৎ।
ঈপ্র.	ঈশোপনিষৎ-প্রসঙ্গ।
উপ্র.	উপনিষৎ-প্রসঙ্গ।
ঋ.	ঋক্‌সংহিতা।
ঐআ.	ঐতরেয়ারণ্যক।
ঐউ.	ঐতরেয়োপনিষৎ।
ঐপ্র.	ঐতরেয়োপনিষৎ-প্রসঙ্গ।
ঐব্রা.	ঐতরেয়ব্রাহ্মণ।
ক.	কঠোপনিষৎ।
কে.	কেনোপনিষৎ।
কৌ.	কৌষীতক্যুপনিষৎ।
গী.	গীতা।
ছা.	ছান্দোগ্যোপনিষৎ।
জৈউ.	জৈমিনীয়োপনিষৎ।
জৈব্রা.	জৈমিনীয়ব্রাহ্মণ।
টী.	টীকা।
টীমূ.	টীকামূল/টীকা ও মূল।
তা.	তাণ্ড্যব্রাহ্মণ।
তু.	তুলনীয়।
তৈআ.	তৈত্তিরীয়ারণ্যক।
তৈউ.	তৈত্তিরীয়োপনিষৎ।
তৈব্রা.	তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ।
তৈস.	তৈত্তিরীয়সংহিতা।
দ্র.	দ্রষ্টব্য।
নি.	নিরুক্ত।
নিঘ.	নিঘণ্টু।

পাসূ.	পাণিনিসূত্র।
পূমীসূ.	পূর্বমীমাংসাসূত্র।
পৃ.	পৃষ্ঠা।
প্র.	প্রশ্নোপনিষৎ।
প্রতিতু.	প্রতিতুলনীয়।
বৃ.	বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।
বেমী.	বেদ-মীমাংসা।
ব্রসূ.	ব্রহ্মসূত্র।
ব্রা.	ব্রাহ্মণ।
ভা.	ভাগবত।
মা.	মাধ্যন্দিনসংহিতা।
মাণ্ডূ.	মাণ্ডূক্যোপনিষৎ।
মু.	মুণ্ডকোপনিষৎ।
যোসূ.	যোগসূত্র।
ল.	লক্ষণীয়।
শাংআ.	শাংখায়নারণ্যক।
শৌ.	শৌনকসংহিতা।
শ্বে.	শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।
সা.	সায়ণ।
সাভা.	সায়ণভাষ্য।
সূ.	সূক্ত।

[১] তু. ছা. কা সাম্নো গতির্ ইতি। স্বর ইতি হো.রাচ ১।৮।৪। 'স্বর', <'স্বর্' আলো (তু. ঋ. 'স্বর্ বৃহৎ' ১০।৬৬।৪) এবং সুর ('অভিস্বরন্তি বহবো মনীষিণঃ' ৯।৮৫।৩) দুইই বোঝায়; সুরের আলো। এইজন্য বলা হয়, 'স্বর্ দিয়ে পাওরা যায় সামবেদের রস। তা হল দ্যুলোক। তার রস হল আদিত্য। সামবেদ দিয়ে জয় করা হয় আদিত্যকে' (জৈউ. ১।১।১।৫)। আদিত্যপুরুষের সঙ্গে এক হওরাই বৈদিক সাধনার লক্ষ্য। [২] ঋ. সোমেনা.-নন্দং জনয়ন্ ৯।১১৩।৬; ১১। [৩] 'নান্দন' দ্র. ঐউ. ১৩।১২; সামসং.য়াভির্ গচ্ছতি নান্দনম্ ২।৬৫৩ (=ঋ. খিল ৩।১০।৬)। [৪] ছা. সাম্ন উদ্গীথো রসঃ ১।১।২…। [৫] চরণব্যূহসূত্র পৃ. ৪৫ (চৌখাম্বা সংস্করণ)। [৬] ঐ পৃ. ৪৩। [৭] দ্র. ব্রসূ. ভাষ্য ৩।৩।২৫, ২৬, ৩৬: পাসূ. কাশিকা ৫।১।৬২। [৮] বৃ. ৪।৪।১-২১; তত্র ১৪, ১৮। [৯] দ্র. পাসূ. ৪।৩।১০৬, তত্র কাশিকা: তেন প্রোক্তম্ ইত্যে.তস্মিন্ ব্রিষয়ে ছন্দস্য ভিধেয়ে [তালব-কারিন্]; জৈ.গৃহ্যসূত্র ১।১৪: ৮। [১০] মা. ৩০।২০; দ্র. তৈব্রা. ৩।৪।১৫। [১১] তু. শিব, তাঁর ডিণ্ডিম ও গালবাদ্য। [১২] তু. মহাব্রত তা. ৫।৫।১৯, ঐআ. ৫।১।৫…। [১৩] ভা. ১২।৬।৫৩। তু. চরণব্যূহসূত্র, সামখণ্ড পৃ. ৪৩ (চৌখাম্বা সংস্করণ)। [১৪] দ্র. বেমী. পৃ. ৭৫। [১৫] দ্র. ঋ. ১।৯৩।৬; বেমী. ৩।১৪৪. ১৮৪। [১৬] দ্র. জৈব্রা. ১১-২। [১৭] ঐআ. ২।১।৮; ছা. ৩।১৩।৬। [১৮] তৈস. ৫।১।৭।১, ৮।১, ২।৬।৩…। [১৯] দ্র. ঈপ্র. ১২.১৪। [২০] দ্র. জৈব্রা. ১১-৬৫। [২১] জৈউ. ৪।৯।২।২। এর পর দশম অনুবাক কেনোপনিষৎ। তার পর আরও দুটি অনুবাকে জৈউ. শেষ। [২২] জৈউ. ৪।৯।১।১। [২৩] জৈউ. ৩।৭।১।১-৪। [২৪] ঋ. ৩।৫৩।১২। [২৫] তা. ৭।১।১। [২৬] তা. ১৬।১১।১১। [২৭] ছা. ১।১।১…। [২৮] দ্র. ছা. তদ্ ব্রা এতন্ মিথুনং য়দ্ ব্রাক্ চ প্রাণশ্ চ, ঋক্ চ সাম চ ১।১।৫। [২৯] ঐআ. ২।৩।৮। [৩০] 'রস' সার বা আত্মা অর্থে দ্র. ছা. ১।১।১ [৩১] জৈউ. ১।১।১।৮। [৩২] বৃ.১।৫।১৪। [৩৩] কে. ৩।৩। [৩৪] 'গায়ত্রী' ছন্দের নাম (দ্র. ঋ. ১০।১৩০। ৪, ১৪।১৬); আর 'গায়ত্র' বোঝায় সাম এবং তার যোনিস্থানীয় ঋক্ উভয়কেই (দ্র.ঋ. ১।১৬৪।২৩।২৪; ২৫)। ঋক্ আর সাম দুয়ের মাঝামাঝি হল 'অর্ক' —বোঝায় গানের কথা এবং সুর উভয়কেই (তু. ঋ. গায়ত্রেণ প্রতি মিমীতে অর্কম্, অর্কেণ সাম ১।১৬৪।২৪; অর্কেভিঃ…সামভিঃ…গায়ত্রৈঃ…ইন্দ্রং ব্রর্ধন্তি ৮।১৬।৯; আরও তু. গায়ত্রম্ ঋচ্যতে ৮।৩৮।১০), অথবা বোঝায় সেই ঋক্‌কে যা গানযোগ্য। জৈউ.তে 'গায়ত্র' সংজ্ঞার ব্যবহার সংহিতার অনুরূপ। [৩৫] দ্র. জৈউ. ১।১।১।৮, ১২।২।৪, ১।১১।১।১১…। [৩৬] দ্র. টীমূ. ২৩। [৩৭] জৈউ.

৩।৭।৩।১, ৫।২, ৪।৮।৫।৩, ৯।১।১…। [৩৮] জৈউ. তদ্ এতদ্ অমৃতং গায়ত্রম্, অথ য়ান্য-ন্যানি গীতানি কাম্যান্যে-ব তানি ৩।৭।৫।২। [৩৯] দ্র জৈউ. ৪।১২। ১-২। [৪০] দ্র. নিঘ. অন্তরিক্ষস্থানদেবতার তালিকায় 'সোমঃ। চন্দ্রমাঃ' ৫।৫; তত্র নি.র উদ্ধরণ ঋ. নবো নবো ভবতি জায়মানঃ ১০।৮৫।১৯। [৪১] তৈউ. ২।৮। [৪২]পূমী. ১।১।২। [৪৩] দ্র. ঋ. ১০।৬৬।৪। [৪৪] দ্র. জৈউ. ৪।৯।১।১ এবং সৈ-ষা শাট্যায়নী গায়ত্রস্যো-পনিষদ্ এম্ উপাসিতব্যা ৪।৯।২।২। [৪৫] ঋ. য়াবদ্ ব্রহ্ম বিষ্ঠিতং তাবতী বাক্ ১০।১১৪।৮; আরও দ্র. বেমী. ৩।১২৬। [৪৬] ছা. ১।১।২,১। [৪৭] দ্র. ছা. ৭।২৩।১—২৫।১। [৪৮] তৈউ. ২।৮। [৪৯] ছা. ১।১।২। [৫০] দ্র. ছা. ১।১।১-৩। [৫১] ঋ. ৯।৩৩।৫। [৫২] ঋ. ১।১৬৪।৪৫। [৫৩] জৈউ. ১।১৩।১।৪। এখানে যা বলা হয়েছে তা মূলের আক্ষরিক অনুবাদ নয়—বিবৃতি। [৫৪] জৈউ. ঐ। এ-নিরুক্তি শাব্দিক নয়—অর্থানুসারী। মরমীয়াদের এখনও এটি প্রিয়। তু. ঋ. 'জীবো অসুঃ' বা সূর্য ১।১১৩।১৬, সেখানেও এই ধ্বনি; [৫৫] জৈউ. ১।১৩।২।৩। [৫৬] ঋ. ১০।১১৪।৮। [৫৭] জৈউ. ১।১৩।১।৩। [৫৮] তৈউ. ২।৪, ৯। [৫৯] ঋ. বাক্ হতে কারণসমুদ্রের ক্ষরণ, তাইতে 'ক্ষরত্য-ক্ষরং, তদ্ বিশ্বম্ উপজীবতি' ১।১৬৪।৪২। [৬০] তু. ছা. ৩।১২।১। [৬১] ঋ. গৌরীর্ মিমায় (শব্দ করলেন, ডেকে উঠলেন) সলিলানি তক্ষতী ১।১৬৪।৪১। সংহিতার 'পৃষতী' বা শ্বেতবিন্দুযুক্ত মৃগীরা মরুদ্‌গণের বাহন (ঋ. ১।৮৫।৪,৫…)। এই মরুদ্‌গণ পুরাণে দেবসেনাপতি কুমার হয়েছেন। তাঁর বাহন 'ময়ূর' আর এই 'পৃষতী' দুইই তারকিত মহাশূন্যের প্রতীক। মহাশূন্য প্রজ্ঞানের নৈঃশব্দ্য আর শ্বেতবিন্দুগুলি প্রাণের স্পন্দ বা ফুট্। সব ফুট্‌গুলি মিলে একাকার হলে পাই 'গৌরী'কে। স্ম-মরুদ্‌গণ তত্ত্বত বিশ্বপ্রাণ। গৌরী আর পৃশ্নি এক। [৬২] নিঘ. ১।১১। [৬৩] ঋ. ১।১৬৪।৪১। আত্মরূপায়ণ প্রাণিদেহের কোষবিভাজনের মত—'একপদী দ্বিপদী চতুষ্পদী অষ্টাপদী' যাতে পাই একটি 'শ্রেঢ়ি' (Progression)। [৬৪] জৈউ. ১।১৩।২।১… [৬৫] ঋ. ১।৮৯।১০। [৬৬] ঋ. ধেনুর্ বাক্ ৮।১০০।১১। তার আগের ঋকেই দোহনের কথা আছে। [৬৭] ঋ. ৮।১০১।১৫-১৬। [৬৮] নিঘ. ১।১১। [৬৯] ঋ. ১০।১২৫।১। [৭০] ছা. ৫।১০।২। [৭১] জৈউ. ১।১।১।৬…। [৭২] এটি মূলের আক্ষরিক অনুবাদ নয়—বিবৃতি। অত্র তু. তা. ৩।৮।২, ৭।৭।১; শ. ৬।২।২।১৫। [৭৩] জৈউ. ১।১।২।১। [৭৪] তু.মাণ্ডূ. ৮-১২, জাগ্রৎ হতে তুরীয়ের দিকে বোধের ক্রমসূক্ষ্মায়নের বাহন চতুষ্পাৎ ওঙ্কার। [৭৫] জৈউ. ১।১।৩।১। পাঠান্তর 'ও বাচ্' ইত্যাদি ১।১।২।৩, শেষে শুধু 'ওবা'। [৭৬] জৈউ. ৩।৭।২।১…। [৭৭] কিন্তু ছা.তে 'অনিরুক্তম্ ত্রয়োদশঃ স্তোভঃ সঞ্চরো হুঙ্কারঃ' ১।১৩।৩। 'অনিরুক্ত' অনির্বচনীয়, অব্যঞ্জন; 'সঞ্চর' বিসৃষ্টিধর্মা (তু.ঋ. 'ক্ষরত্য-ক্ষরম্'

১।১৬৪।৪২)। তু· বৌদ্ধতন্ত্রের গায়ত্রী 'ওঁ মণিপদ্মে হুম্'। সেখানে অপাননে 'ওম্', আর প্রাণনে 'হুম্' ; সেইসঙ্গে মূলবন্ধের ফলে সুষুম্ণধারার উত্তর-বাহিনী হওয়া। [৭৮] জৈউ. ৩।৭।২।২। [৭৯] জৈউ. ৩।৭।১।৮। [৮০] ঋ. য়থা কলাং য়থা শফম্ ৮।৪৭।১৭। 'শফ' গরুর চেরা খুর, সুতরাং আটভাগের এক ভাগ—যেমন 'পাদ' চারভাগের এক ভাগ। 'কলা' চাঁদের, সুতরাং ষোলভাগের এক ভাগ। [৮১] তু. জৈউ. ৩।৭।১।১০। [৮২] দ্র. ঋ. ১০।৮৫।৬-১৭ (বেমী, পৃ. ২৮২…)। [৮৩] কিন্তু তু. জৈউ. ওম্ ইত্যা.দিত্যো, ৱাগ্ ইতি চন্দ্রমাঃ ৩।৩।৩।১২ ঃ এখানে চন্দ্রমার ষোড়শী কলাকে পাওয়া যাবে ভাটার দিকে। বস্তুত ব্যক্তমধ্যের এক কোটিতে আলোর অনিরুক্ত, আরেক কোটিতে কালোর। [৮৪] জৈউ. ৩।৩।৩।১৩। [৮৫] ছা. ১৬-৭। [৮৬] ঋ. ১০।১০।১২। [৮৭] জৈউ. ১।১৭।১৫। [৮৮] বৃ. ৬।৪।২০। [৮৯] জৈউ. ১।১৭।১৬-৭। এই যৌনাতিচার পক্ষিমিথুনের মত। আদিমিথুন যেন এক বোঁটায় জোড়া ফুল। তৈস·তে তাই অম্বিকা রুদ্রের বোন্ (১।৮।৬।১)। তু·বৃ·তে সৃষ্টির আদিতে স হৈ·তাৱান্ আস য়থা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ, স ইমম্ এৱা·ত্মানং দ্বেধা·পাতয়ৎ, ততঃ পতিশ্ চ·পত্নী চা·ভৱতাম্' (১।৪।৩)। [৯০] তু. বৃ. ৪।৩।২১ ; ১।৪।৩। আরও তু· বৈষ্ণবের 'মধুর' রস। [৯১] ল. সংহিতায় সোম 'পবমান'। সোমরস পূত না হলে অনর্থ ঘটায়। [৯২] জৈউ. ১।১৭।২।১, ৬-৮। [৯৩] ছা. ২।১৪।১ ; জৈউ. ১।৩।২।৪। [৯৪] জৈউ. ১।৩।১।৮। [৯৫] জৈউ. ১।৬।২।৭। [৯৬] জৈউ. ১।৩।৩।৫ ; ২।২।৪।২। প্রাণ ব্রহ্মের মুখ্য সাধন। [৯৭] জৈউ. ১।১০।১।৬। উত্তরদিকেই আদিত্যের উত্তরায়ণ এবং আলোর ক্রমে বেড়ে চলা। [৯৮] জৈউ. ২।২।২।১…। 'ভূতি' হওয়া (তু. GK. *phusis* 'nature') ; 'আ' কাছে 'প্র' সামনের দিকে, 'সম্' সর্বত্র, সম্যক্। [৯৯] জৈউ· ৪।৭।১।১। [১০০] ঋ. ১০।১১৪।৮। [১০১] কে. ৩।১২, ৪।৩, ৪।৪। [১০২] ব্রসূ. ১।১।২২। [১০৩] দ্র. ছা· ৩।১২।৭-৯ ; ৮।১।১…। [১০৪] দ্র. জৈউ. ১।৭।১।১-২।২…। [১০৫] জৈউ· ১।৮।১।১-২…। [১০৬] জৈউ· ১।৯।১।১-৩…। 'দশ' থেকে 'ব্যোমান্ত' পর্যন্ত প্রত্যেকটি সংখ্যার আলাদা নাম আছে। সংখ্যাগণিতের অবাধ কল্পনা আনন্ত্যাভিসারী বোধের সূচক। তু. তৈউ.র আনন্দমীমাংসায় প্রকল্পিত সংখ্যা—দশের পিঠে উনিশটি শূন্য বসিয়ে (২।৮)। 'সপ্তরশ্মি বৃষভ' ঋ. ২।১২।২২। [১০৭] দ্র. ঋ. ১০।১২৯ সূ। [১০৮] ছা· ৮।১৪।১। [১০৯] কে. ৩।১২-৪।১। [১১০] ঋ· ১।৮৯।১০। [১১১] তু.ক. পঞ্চভাতি ২।২।১৫ ; ছা· ৫।৫।১ । [১১২] ছা. ৪।৭।৩, ১৩।১, ৫।১০।২। [১১৩] দ্র. জৈউ· ১।৮।২।১-৩।৭। [১১৪] জৈউ· ১।৮।১।১…। বিবৃতিসহ সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। [১১৫] তু. ছা· ১।৬।৬ [১১৬] মূলে আছে ঃ ৱিদ্যুতো ৱিদ্যোতমানায়ৈ ১।৮।২।৬ ; তু· কে. ৱিদ্যুতো ৱ্যদ্যুতদ্ আ ৪।৪। [১১৭] ছা·তে এখানে দেখা দেন

'অমানব পুরুষ' (৫।১০।২)। বৃ.তে 'অমানস পুরুষ' ৬।২।১৫। মানুষ মনোধর্মা, অমানব বা অমানস পুরুষ মনকে ছাপিয়ে। [১১৮] অর্থাৎ স্বভাবের অনুরূপ। তু. গী. স্বভাবো ঽধ্যাত্মম্ ৮।১। [১১৯] তু. ঋ. তে ইন্দ্র 'রূপংরূপং প্রতিরূপো বভূব' ৬।৪৭।১৮। [১২০] তু. ঋ. অস্মে অন্তর্ নিহিতাঃ কেতবঃ স্যুঃ ১।২৪।৭। [১২১] এই অনুভবের সঙ্গে তু. কে. ৪।৬। [১২২] দ্র. জৈউ. ১।৯।৩।১-২। [১২৩] দ্র. ঐউ. ৩।১।১৩-১৪ ; কৌ. ৩।১, ২। [১২৪] জৈউ. ১।৯।১।১···; ঋ. ২।১২।১২। [১২৫] তু. ঋ. জীবো অসুর্ ন আগাৎ ১।১১৩।১৬ (সূর্য)। [১২৬] জৈউ. ১।৬।৩।২। [১২৭] জৈউ. ১।১৪।৪।৪···; ৩।৬।৯।৬। [১২৮] জৈউ. ১।১৪।৪।১-২ ; উদ্ধৃত ঋক্ দুটি প্রচলিত বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায় না। [১২৯] জৈউ. ১।১০।১।১···। [১৩০] ঋ. ৮।৭০।৫ ; জৈউ. ১।১০।২।১। [১৩১] ছা. ১।১।৬। [১৩২] জৈউ. ১।১৪।২।৮···, ঋ. ৬।৪৭।১৮, ৩।৫৩।৮। [১৩৩] জৈউ. ১।১।১।১-২। [১৩৪] জৈউ. ১।২।১।১২। [১৩৫] দ্র. জৈউ. ৪।২।১···, ৩।৫।১।১-৯।৫, ৪।১১।৩।১···, ৩।৫।৯।৪···। [১৩৬] কে. ৪।৮। [১৩৭] ছা. ১।৫।১, ৩। [১৩৮] ঋ. ১।২৪।৭। [১৩৯] ঋ. ২।১২।১। [১৪০] ঋ. ১।৮৯।১০। [১৪১] দ্র. মু. ২।২।৮। [১৪২] ছা. ১।১।১০। [১৪৩] নি. ৭।১১। [১৪৪] দ্র. ঋ. ১০।৭১।১১ ; ছা. ৪।১৭।১···। [১৪৫] দ্র. ছা. ২।২৪।১···। [১৪৬] শঙ্করের মতে ব্রাহ্মণের অধ্যায়বিভাগ অন্যরকম। গায়ত্রসামবিষয়ক দর্শন এবং বংশ (জৈউ. ৪।৯।১।১-২।২) পর্যন্ত ব্রাহ্মণের আট অধ্যায়। নবম অধ্যায়ে উপনিষদের শুরু (দ্র. ভাষ্যভূমিকা)। [১৪৭] দ্র. ঈপ্র.। [১৪৮] দ্র. ঈ. ২,১ ৭। স্ম. যজুর্বেদ কর্মবেদ। [১৪৯] দ্র. ঐপ্র.। [১৫০] দ্র. জৈউ. ১।১।১।৩···। [১৫১] দ্র. ঋ. ১।৮৩।৫···(বেমী. ৩।২০।১[৪]) ; ঋ. ১০।১২৩ সূ.। [১৫২] দ্র. জৈউ. ১।৬।২।৯, ৩।২।৫···। [১৫৩] দ্র. ঐব্রা. ৫।৩০ ; তা. ১৬।১০।৮, শ. ১৭।২।১৭, কৌ. ৩।৫···; ঐব্রা. ৮।২। [১৫৪] দ্র. তৈউ. ৩।১০।২-৬। [১৫৫] দ্র. বেমী. পৃ. ৭৬···। [১৫৬] ছা. ৩।১৪।১ ; তু. গী. 'বাসুদেব সর্বম্' ৭।১৯। [১৫৭] বৃ. ২।৩।৬ ; ৩।৯।২৫ (যাজ্ঞবল্ক্য। [১৫৮] কে. ২।৪। [১৫৯] কে. ১।৩। [১৬০] কে. ১।৫-৯ ; ২।৫। তু. ক. ২।২।১৫। [১৬১] তু. ঋ. ১০।৮৫।৫ ; আরও দ্র. ১।৯১।১৬-১৮, ৯।৩১।৪ (=১।৯১।১৬) ; ৯।৬৭।২৮। দ্র. ঐব্রা. ১।১৭, তত্র সা. 'আপীনম্ অভিবৃদ্ধিঃ'। [১৬২] তু. ছা. ৮।১২।৩। [১৬৩] তৈউ. ৩।১০।৫, ৬। [১৬৪] তু. তৈউ. ১।১।১, তথা শান্তিপাঠ। [১৬৫] ছা. ৪।১৪।১-৬। [১৬৬] ঐআ. ২।১।৮। [১৬৭] দ্র.ঋ. ১০।১২৫।৪। ল. তত্র 'অন্নাদে'র পরিচয় 'বিপশ্যতি' 'প্রাণিতি' 'শৃণোতি' 'মন্তুঃ' (মূলে 'অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি' আর বাক্ নিজেই বলছেন 'শ্রদ্ধিবং তে বদামি'। [১৬৮] তৈস. ৫।১।৭।১, ২।৬।৩···। [১৬৯] তু. ছা. ৬।৫।১···। [১৭০] তু. ক. ২।১।১। [১৭১] ঋ. ৬।৯।৬, দ্র. বেমী. ৪।২৮[১]।

[১৭২] ঋ. নির্ অবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা ১০।১২৯।৪। [১৭৩] দ্র. ছা. ৩।১৩।১… ; 'তদ্ এতদ্ দৃষ্টং চ শ্রুতং চে-ত্যু-পাসীত' ৩।১৩।৭। [১৭৪] তু. ইন্দ্রের প্রতি প্রার্থনা ঋ. 'বলং ধেহি তনূষু নো…বলং তোকায় তনয়ায় জীবসে ত্বং হি বলদা অসি' ৩।৫৩।১৮। [১৭৫] দ্র. বেমী. 'তনূনপাৎ' (৩।৩৫৭ টীমূ.)। [১৭৬]ঐআ. ১।১।২ ; ল. 'শীর্ষ' বাদ। [১৭৭] কুমারসম্ভব ৫।৩৩। [১৭৮] তু. ছা. অথ য়দ্ অতঃ পরো দিবা জ্যোতির্ দীপ্যতে বিশ্বতঃপৃষ্ঠেষু…ইদং বাব তদ্ য়দ্ ইদম্ অস্মিন্ন্ অন্তঃ পুরুষে জ্যোতিঃ। তস্যৈ-ষা দৃষ্টির্ য়ত্রৈ-তদ্ অস্মিঞ্-ছরীরে সংস্পর্শেনো-ষ্মিমানং বিজানাতি…৪।১৩।৭। [১৭৯] দ্র. ঋ. তপঃসূ. ১০।১৫৪।২, ৪, ৫ ; বেমী. ৪।১৩৬ টীমূ. ; 'স্বর্' সোম্য অমৃতলোক, তু. ঋ. য়স্মিন্ লোকে স্বর্ হিতম্, তস্মিন্…অমৃতে লোকে অক্ষিতে ৯।১১৩।৭। [১৮০] তু. ঋ. অপালাম্ ইন্দ্র ত্রিষ্ পূত্বী (তিনবার পূত করে অর্থাৎ শরীর প্রাণ ও মনকে শুদ্ধ করে) অকৃণোঃ সূর্যত্বচম্ ৮।৯১।৭। [১৮১] তু. ঐব্রা. সো হগ্নের্ দেবয়োন্যা আহুতিভ্যঃ সম্ভূয় হিরণ্যশরীর ঊর্ধ্বঃ স্বর্গং লোকম্ এষ্যতি ২।৩, এতি ১৪। [১৮২] তু. ছা. ৩।১৪।৩-৬ ; জৈউ ৩।৩।৩।১ 'বর্চস্'॥ 'রুচি' < √রুচ্ 'দীপ্ত দেওবা'। [১৮৩] শ্বে. ২।১২। [১৮৪] তু. তৈউ. এতং ততো ভবতি, আকাশশরীরং ব্রহ্ম…১৬ ; দ্র. যোসূ. মহাবিদেহা ধারণা ৩।৪৩। [১৮৫] ক. ১।২।২০। [১৮৬] দ্র. যোসূ. ১।৩১, ২।৪৬-৪৮। [১৮৭] তু. প্র. অত্রৈ-ষ দেবঃ স্বপ্নান্ ন পশ্যতি, অথ তদৈ-তস্মিঞ্-ছরীর এতৎ সুখং ভবতি ৪।৬। [১৮৮]যোসূ. ২।৪৭। [১৮৯] স্বচ্ছন্দ অনুবাদ ঋ. ১।৮৯।৮। দেবহিত আয়ুর পরিমাণ একশ' বছর। [১৯০] দ্র. জৈউ. ৩।৬।১।৭-২।২। [১৯১] জৈউ. ৩।৭।১।১০। [১৯২] জৈউ. ৪।৭।২।১০। [১৯৩] কৌ. ৩।৮। [১৯৪] তু. ঋ. সোমো দাধার দশয়ন্ত্রম্ উৎসম্ ৬।৪৪।২৪ (দ্র. বেমী. ৩।৮০১[৪])। 'উৎস' বিষ্ণুর পরম পদ, যা 'মধ্ব উৎসঃ' (ঋ. ১।১৫৪।৫)। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তা মূর্ধা বা শীর্ষ। 'যন্ত্র' নিয়ামক—অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে কোথাও 'গ্রহ' (দ্র. ৬।৪৪।২৪ সাভা.), কোথাও 'অঙ্গুলি' (দ্র. ১০।৯৪।৭-৮ সাভা.)। বৃ.তে কর্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মনকে 'গ্রহ'রূপে বর্ণনা করা হয়েছে (৩।২।১-৯)। 'অঙ্গুলি' অগ্নিশিখার প্রতীক। অগ্নিশিখা অধ্যাত্মদৃষ্টিতে শীর্ষণ্য প্রাণ, অতএব ইন্দ্রিয়। সোমসম্পর্কে দশাঙ্গুলের কথা ঋ.র বহু জায়গায়। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তা ইন্দ্রিয়ের বোধক। 'অত্য-তিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্' (ঋ. ১০।৯০।১) অতীন্দ্রিয় অক্ষরপুরুষ। [১৯৫] ছা. ৭।২৬।২। [১৯৬] দ্র. ছা. ৫।১৯।১…। [১৯৭] দ্র. ঋ. ১।১৮৭ সূ. (বেমী. ৩।৩৭৩[১])। [১৯৮] দ্র. ঐপ্র. টীমূ. ১৮১…। [১৯৯] দ্র. ঐপ্র. টীমূ. ২৭০…। [২০০] তু. ঋ. ১।১৬৪।৩৯, ৪১। [২০১] ঋ. গৌরীর্ মিমায় সলিলানি তক্ষতী ১।১৬৪।৪১। [২০২] ঋ. ১০।৭।১৩। [২০৩] বৃ. ২।৫।৩।

[২০৪] জৈউ. ১।১।১৫-৭। [২০৫] ঋ. ১।৮৯।৮। [২০৬] কৌ, ৩।২, ৮ ; তু. ২।১৪। [২০৭] ঋ. ১।১১৩।১৯। [২০৮] তু. ঋ. অদ্রেঃ সুনুম আয়ুম্ আহুঃ ১০।২০।৭, দুর্মর্ষম্ আয়ুঃ ৪৫।৮ ; দমে বিশ্বায়ুঃ ১৬৭।১০ ; [২০৯] ঋ. আয়োর্ হ স্কম্ভ উপমস্য নীলে· ১০।৫।৬। [২১০] তু. ঋ. অস্য প্রাণাদ্ অপানতী ১০।১৮৯।২। [২১১] কৌ· ২।৫। [২১২] প্র· ১।৮, ৮ ; ৪।৩। [২১৩] ঋ. প্রাণাদ্ বায়ুর্ অজায়ত ১০।৯০।১৩। [২১৪] নিঘ· ২।১, ৩।৯। [২১৫] দ্র. ছা. ১।২।২। [২১৬] দ্র· মা· ২২।৩৩। [২১৭] ছা, ৮।৬।২ ; দ্র· প্র· ৩।৭। [২১৮] বৃ· ৪।২।৩। [২১৯] মা· ১৮।৪০। [২২০] নিঘ· ১।৪। [২২১] ঋ· ১০।১৮৯।১। [২২২] নি· ২।১৪। [২২৩] তু. গী· ৬।২৮, ২।১৪। [২২৪] দ্র. ছা· ৬।৫।১...। [২২৫] বৃ· ১।৪।৬। [২২৬] মৃত্যু এবং অমৃতের এই দ্বন্দ্ব সম্পর্কে দ্র· ঐপ্র· ১।৩।১০ + ১।৪। [২২৭] ব্রসূ· ১।১।২২-২৩। [২২৮] দ্র· মা· ৩১।১৯ ; শৌ· ১০।৮।১৩। [২২৯] দ্র· ছা. ৫।১১-২৪, তত্র বেমী, ১৪৭[২১৬] ; তু· শ· ১০।৬।১।১-১১। [২৩০] দেহে প্রাণাপানের ক্রিয়ায় বায়ু উদ্রিক্ত করে স্পর্শবোধকে—অন্তরে। অমনিতেও বায়ুকে আমরা জানি বাহ্যস্পর্শের দ্বারা। স্পর্শতন্মাত্রের বোধ এনে দেয় ব্যাপ্তিধর্মা বিশ্বপ্রাণের বোধ। তু. ঋ· মুনয়ো বাতরশনাঃ ১০।১৩৬।২ ; উন্মদিতা মৌনেয়েন বাতাঁ আ তস্থিমা বয়ম্, শরীরে·দ্ অস্মাকং মর্তাসো অভি পশ্যথ ৩ (দ্র· বেমী· ৩।৫৮৫[৬])। [২৩১] ছা. ৫।৭-৮। [২৩২] প্র· ১।১৪। দ্র· ঐপ্র· ১।১।৪ নাভির পরেই শিশ্নের উপস্থাপনা। [২৩৩] মা· প্রজাপতিশ্ চরতি গর্ভে অন্তর্ অজায়মানো বহুধা বিজায়তে ৩১।১৯। প্র·র· পাঠ ঃ প্রজাপতিশ্ চরসি গর্ভে ত্বম্ এব প্রতিজায়সে ২।৭। শৌ·তে 'অদৃশ্যমানো' বহুধা···(১০।৮।১৩)। [২৩৪] দ্র· ঐপ্র· 'প্রজনন'। [২৩৫] তু· ছা· অথ যঃ প্রাণাপানয়োঃ সন্ধিঃ, স ব্যানঃ।···অপ্রাণন্ন্ অনপানন্ বাচম্ অভিব্যাহরতি···উদ্গায়তি···যান্য·ন্যানি বীর্যবন্তি কর্মাণি...তানি করোতি ১।৩।৩-৫। [২৩৬] ছা· ৩।১২।৯ ; তু· বৃ· ২।১।৫ (কৌ· ৪।৬)। [২৩৭] তু ঈ· বায়ুর্ অনিলম্ অমৃতম্ ১৭। [২৩৮] তু· তৈউ· ১।১। [২৩৯] দ্র· ছা· ৪।৩।১-৪ 'তৌ বা এতৌ দ্বৌ সংবর্গৌ', বায়ুর্ এব দেবেষু প্রাণঃ প্রাণেষু' (৪)। [২৪০] কৌ· ২।৫। [২৪১] ছা· মূর্ধানম্ অভিনিঃসৃতৈ·কা, তয়ো·র্ধ্বম্ আয়ন্ন্ অমৃতত্বম্ এতি ৮।৬।৬; তু·প্রু· ৩।৭, ক· ২।৩।১৬। [২৪২] ছা· ৩।১৩।৫। [২৪৩] কৌ· ১।৫। [২৪৪] ছা· ৫।২৩।১-২। [২৪৫] তৈউ. এতৎ ততো ভবতি, আকাশশরীরং ব্রহ্ম সত্যাত্ম প্রাণারামং মন-আনন্দং শান্তিসমৃদ্ধম্ অমৃতম্ ১।৬। [২৪৬] ছা· ৩।১৩।৭। [২৪৭] বৃ· আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি ২।৪।৫। [২৪৮] প্র· ৩।৯। [২৪৯] শ্বে. ২।১২। [২৫০] ছা· ৩।১৩।৭ (দ্র· টী· ১৭৮)। [২৫১] তু· ঋ· চক্ষুর্ মিত্রস্য বরুণ্যা·গ্নেঃ···সূর্য আত্মা ১।১১৫।১, সূর্যং চক্ষুর্ গচ্ছতু (মৃতের)

১০।১৬।৩ ; পুরুষের ‘চক্ষোঃ সূর্যো অজায়ত’ ১০।৯০।১৩। [২৫২] ঋ. তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ, দিবী.ব চক্ষুর্ আততম্ ১।২২।২০। [২৫৩] ঋ. ৭।৩৩।৭। [২৫৪] তু. ঋ. ৬।৯।৪-৭ ; ১।১১৫।১, ১৩৩।১৬। আরও তু. অগ্নিহোত্রীর নিত্যধ্যেয় মন্ত্র ঃ ‘অগ্নির্ জ্যোতির্ জ্যোতির্ অগ্নিঃ স্বাহা’ (সন্ধ্যায়), ‘সূর্যো জ্যোতির্ জ্যোতিঃ সূর্যঃ স্বাহা’ (প্রাতে)। [২৫৫] তু. ঋ. অপাম সোমম্ অমৃতা অভূমা.গন্ম জ্যোতির্ অবিদাম দেবান্ ৮।৪৮।৩ ; যুষ্ম-নীতো অভয়ং জ্যোতির্ অশ্যাম্ ২।২৭।১১, উর্ব্. শ্যাম্ অভয়ং জ্যোতির্ ইন্দ্র মা নো দীর্ঘা অভি নশন্ তমিস্রাঃ ১৪, জীবা জ্যোতির্ অশীমহি ৭।৩২।২৬…। [২৫৬] ঋ. ১০।৭৩।১১। [২৫৭] দ্র. ঋ. ১।১১৫।১, ঈ. ১৬, ঋ. ভদ্রং পশ্যেমা.ক্ষভির্ য়জত্রাঃ ১।৮৯।৮। [২৫৮] ছা. তস্যৈ.ষা শ্রুতির্ য়ত্রৈ.তৎ কর্ণা.বপিগৃহ্য নিনদম্ ইব নদথুর্ ইবা.গ্নের্ ইব জ্বলত উপশৃণোতি ৩।১৩।৭। [২৫৯] বৃ. ২।৪।৫। [২৬০] দ্র. সর্বানুক্রমণী, পরিভাষা ২।১৪-১৭ ; ঋ. ১।১১৫।১। [২৬১] বৃ. ৬।৫।৩। [২৬২] ছা. ১।৬।৫…। [২৬৩] দ্র. ঋ. ১।৮৪।১৫, ২।৩৫।১১, ৮।৪১।৫, ৯।৭৫।২, ৮৭।৩। [২৬৪] দ্র. জৈউ. সোঽয়ং রাগ্ অভবৎ। ওম্ এব নামৈ.ষা ১।১।১।৭। [২৬৫] ছা. ৮।১৪।১। [২৬৬] দ্র. ঋ. ১।১৬৪।৪১-৪২। [২৬৭] ঋ. গৌরীর্ মিমায় সলিলানি তক্ষতী। এই হাম্বারব ওঙ্কার অথবা হিঙ্কার (সামের)। [২৬৮] ঋ. ১০।১১৪।৮। [২৬৯] তু. ঋ. আশ্রুৎকর্ণ শ্রুধী হবং… স্তোমম্ ইমং মম কৃষ্বা য়ুজশ্ চিদ্ অন্তরম্ ১।১০।৯। [২৭০] ঋ. ৫।৮২।৯। সবিতার মন্ত্র। তার ‘শ্লোক’ বা বাণী গুঞ্জরিত হচ্ছে সবার অন্তরে, আর তাইতে তাদের ধীকে প্রচোদিত করছে অহরহ। [২৭১] বৃ. ইমা দিশঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধু, আসাং দিশাং সর্বাণি ভূতানি মধু। য়শ্ চা.য়ম্ আসু দিক্ষু তেজোময়ো ঽমৃতময়ঃ পুরুষো, য়শ্ চা.য়ম্ অধ্যাত্মং শ্রৌত্রঃ প্রাতিশ্রুৎকস্ তেজোময়ো ঽমৃতময়ঃ পুরুষো ঽয়ম্ এব স য়ো ঽয়ম্ আত্মা। ইদম্ অমৃতম্ ইদং ব্রহ্মে.দং সর্বম্ ২।৫।৬। [২৭২] দ্র. বৃ. ৩।৯।১৩। [২৭৩] ঋ. ১০।১২৯।৪, ৬। ‘কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ’ এই প্রশ্নের উত্তর আগের মন্ত্রে। [২৭৪] তু. মা. সবিতা দেবান্ স্বর্ য়তো…বৃহজ্ জ্যোতিঃ করিষ্যতঃ…প্রসুবাতি ১১।৩ (তৈস. ৪।১।১।৩ ; সবিতার প্রেষণায় আলো ফুটছে, তার ছবি) ; ঋ. স্বর্ বৃহৎ ১০।৬৬।৪। ল. ‘উর্বশী’ বা বিদ্যুতের ছটা ‘বৃহদ্দিবা’ (ঋ. ৫।৪২।৯ ; নি. ১১।৫০)। তু. উত্তরমেরুর অরোরা। দ্র. কে. ‘বিদ্যুৎ’ ৪।৪ ; তু. ছা. ‘স্মর’ চিদাকাশে আলোর ঝলক ৭।১৩।১। [২৭৫] এইজন্য সবিতা অন্তরিক্ষস্থান দেবতাও (নিঘ. ৫।৪, তত্র নি. আদিত্যোঽপি সবিতো.চ্যতে…১০।৩২)। দ্যুস্থান সবিতা নি. ১২।১২ তত্র দুর্গ। [২৭৬] ঋ. তানি বিদুর্ ব্রাহ্মণা য়ে মনীষিণঃ ১।১৬৪।৪৫। [২৭৭] এটি জৈউ.র মতে, তু. (আদিত্য) ব্যাহৃষি সবিতা ভর্বাস,

উদেষ্যান্ বিষ্ণুঃ ; উদ্যান্ পূরুষঃ, উদিতো বৃহস্পতিঃ অভিপ্রয়ন্ মঘরেন্দ্রো বৈকুণ্ঠঃ, মধ্যান্দিনে ভগঃ, অপরাহ্নে উগ্রো দেবো লোহিতায়ন্ অস্তমিতে য়মো ভৱাস ৪।৫।১।১। নিরুক্তের প্রসিদ্ধ ক্রম হল অশ্বিদ্বয় উষা সবিতা ভগ সূর্য পূষা বিষ্ণু বা মাধ্যন্দিন আদিত্য। এখানে ভগের জায়গায় বিষ্ণু, আর বিষ্ণুর জায়গায় ভগকে পাচ্ছি। কারণ পরে বোঝা যাবে (দ্র. টীমূ. ৬৯২-৯৫)। [২৭৮] দ্র. তৈউ. ১।৪ ; ঋ. ৫।১১।৫, ১।৪৩।১। [২৭৯] তু. ঋ. ৭।১০৩।৫ ; ১০।১২৫।৪। [২৮০] নি.তে উল্লিখিত কৌৎসের মন্ত্রানর্থক্যবাদের (১।১৫) রহস্য এইখানে। অর্থভাবনাসহ জপের বিধান আছে তর্কপ্রস্থানে (দ্র. যোসূ. ১।২৭-২৯)—যেখানে মন ও মনীষা হল প্রধান সাধন। কিন্তু 'শব্দই ব্রহ্ম' এই বাদ অর্থবোধের অপেক্ষা রাখে না। বৈষ্ণবের মতে অর্থবোধ তখন সাধক নয়, বাধক—কেননা নামই অনির্বচনীয়ভাবে নামী। [২৮১] তু. প্র. ৪।৪। [২৮২] ছা. ৮।১২।৫। [২৮৩] বৃ. ৩।১।৯। [২৮৪] তু. প্র. ৪।২ ; ছা. ৫।১।৫ [২৮৫] দ্র. ব. ৪।১। [২৮৬] দ্র. 'বল' তনূতে ঋ. ৩।৫৩।১৮, ১০।২৮।১১, ৮৩।৫ ; আত্মায় ৯।১১৩।১, ১০।১২১।২। [২৮৭] ঋ. 'ওজঃ' ৭।৮২।২, ১০।১৫৩।২, ৬।৪৭।৩০ ; 'বীর্য' ১।৮০।৮, ৯।১১৩।১, ১০।৮৭।২৫। তু. শৌ. অপাং তেজো জ্যোতির্ ওজো বলং চ ব্রনস্পতীনাম্ উত বীর্য়াণি ১।৩৫।৩। [২৮৮] তু. ঋ. ত্বম্ ইন্দ্র বলাদ্ অধি সহসো জাত ওজসঃ ১০।১৫৩।২ (তু. ১০।৭৩।১০) ; ৩।৫৩।১৮, ১০।৫৪।২। আরও তু. উগ্রায় তে সহো বলং দদামি ১০।১২৬।৫। হিরণ্যগর্ভও 'আত্মদা বলদা' (১০।১২১।২)। [২৮৯] ঋ. ১০।১০৩।৫। [২৯০] মু. ৩।২।৪। [২৯১] দ্র. যোসূ. ১।২০, ২।৩৮। [২৯২] অগ্নি তাই 'সহসঃ সূনুঃ' (তু. ১০।১১৬।৫) ; জুহোমি হব্যং তরসে বলায় ৩।১৮।৩। [২৯৩] দ্র. ছা. ৭।৮।১-২। [২৯৪] তু. ছা. ৫।১০।১, মু. ১।২।১১। [২৯৫] দ্র. ঋ. অয়ং রথম্ অয়ুনক্ সপ্ত-রশ্মিম্…সোমো দাধার দশয়ন্ত্রম্ উৎসম্ ৬।৪৪।২৪। অত্র 'সপ্তরশ্মি রথ' শরীর। 'রশ্মি' লাগাম, আবার আলোকরশ্মি বা মূর্ধন্যপ্রাণের সপ্ত অর্চিঃ (তৈস. ৫।১।৭।১)। তারা এসে সংহত হয়েছে মস্তিষ্কে, আর সেখান থেকেই সোম দেহরথকে হাঁকাচ্ছেন দশটি ঘোড়ার মুখে সাতটি লাগাম পরিয়ে। দশটি যন্ত্র 'ইন্দ্রিয়' (দ্র. টী. ১৯৪), আবার সাতটি রশ্মি 'প্রাণ-চৈতন্য' যা অন্নের বিকার (ছা. ৬।৫।১…)। [২৯৬] বৃ. ৩।৯।৪। [২৯৭] বৃ. ২।৪।১১ (=৪।৫।১২)। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে ইন্দ্রিয়দের মুখ্য অধিপতি আত্মা। আত্মার দুটি বিভাব—মন আর হৃদয়। তাই এরাও ইন্দ্রিয়াধিপতি। মন থেকে মনীষা, আর হৃদয় থেকে প্রতিবোধ—এই দুটি সূক্ষ্মতর সাধনের উদ্ভব। আগেরটি মৌনেয় দর্শনের উপজীব্য, পরেরটি আর্ষের দর্শনের। হৃদয়ের প্রতি যাজ্ঞবল্ক্যের পক্ষপাত ল. (বৃ. ৪।১।৭)। [২৯৮] প্র. ৪।২। [২৯৯] কৌ. ৩।৮। [৩০০] তু. বৃ.।

সর্বেষাম আনন্দানাম্ উপস্থ একায়নম্ ২।৪।১১। যাজ্ঞবল্ক্যের দর্শনে 'প্রজাতি' একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে, এও ল. (তু. রেতঃপ্রসঙ্গ ৩।৭।২৩, ৯।১৭, ২২)। [৩০১] তু. তৈউ কর্মে·তি হস্তয়োঃ ৩।১০। [৩০২] ঋ ৮।৩।২০, ৯।৪৭।৩, ২৩।৫, ৮৬।১০; ১০৭।২৫, ৮।৩।১৩, ৫৯।৫, ১০।১১৩।৩। [৩০৩] ঋ. ৮।১৫।৭; ১।১০৪।৬, ১০।১১৬।১; ১২৪।৮। [৩০৪] শৌ. ১১।৯।১৫ (তু. গী. ১৫।৭)। [৩০৫] পাস্. ৫।২।৯৩, দ্র. তত্র কাশিকা। [৩০৬] ছা. ৭।২৫।১-২। এই ভাবনার সঙ্গে তু. ঋ. সবিতা পশ্চাতাৎ সবিতা পুরস্তাৎ সবিতো·ত্তরস্তাৎ সবিতা·ধরস্তাৎ, সবিতা নঃ সুবতু সর্বতাতিম্ ১০।৩৬।১৪; অনুরূপ ৭।৭২।৫, ৭৩।৫, ৬।১৯।৯, ৮।৬১।১৬, ১০।৮৭।২০। [৩০৭] তৈউ. ৩।১০। 'সমাজ্ঞা' ব্রহ্মের প্রচোদনা। এখানকার ইন্দ্রিয়োপসংখ্যান ল.। [৩০৮] ঋ. ১।৮৯।৮। [৩০৯] < √ভন্দ্ 'জ্বলতি' 'অর্চতি' নিঘ. ১।১, ৩।১৪। > ভন্ড > ভল্ল > বাংলা 'ভাল'। [৩১০] তু. ঋ. ১৬৭।১, ৯১।৫; ৮।৬২ সূ·র ধুবা 'ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ'। [৩১১] ছা. ৩।১৪।১; তু. ভাগবতদের আদেশ 'বাসুদেবঃ সর্বম্' গী. ৭।১৯। [৩১২] ঋ. ১০।১১৪।৮ [৩১৩] তু. ছা. ৩।৫।১-৪। তত্রত্য 'গুহ্য আদেশ'ই মহাবাক্য বা ইষ্টমন্ত্র। [৩১৪] বৃ. ৩।৯।১০-১৭, ২৬। [৩১৫] তু. জৈউ. তদ্·ধ বিশ্বামিত্রঃ শ্রমেণ (> 'শ্রমণ' বৃ. ৪।৩।২২, তৈআ. বাতরশনা হ বা ঋষয়ঃ শ্রমণা ঊর্ধ্বমন্থিনঃ ২।৭।১, ঋ. মুনয়ো বাতরশনাঃ ১০।১৩৭।২) ব্রতচর্যে·ণে·ন্দ্রস্য প্রিয়ং ধামো·পজগাম। তস্মা উ হৈ তৎ প্রোবাচ য়দ্ ইদং মনুষ্যান্ আগতম্। তদ্·ধ স উপনিষসাদ (ইন্দ্রের প্রবচনের দ্বারা আবিষ্ট হয়ে উপলব্ধি করলেন) জ্যোতির্ এতদ্ উকথম্।...অথ হৈ·নং (উক্থপ্রবক্তা ইন্দ্রকে) উপনিষসাদায়ুর্ এতদ্ উক্থম্ ইতি।...অথ হৈ·নং বসিষ্ঠ উপনিষসাদ গৌর্ এতদ্ উক্থম্ ৩।১।৩।৭-১৩। [৩১৬] তু. কে. ১।৩, ২।২, ৩; ৪।৭। আরও তু. ঋ. বি মে মনশ্ চরতি দূরআধীঃ কিং স্বিদ্ বক্ষ্যামি কিম্ উ নূ মনিষ্যে ৬।৯।৬। অবাঙ্মানসগোচরের আবেশজনিত উন্মনোভাবের বিবৃতি। দ্র বেমী. ৩।২৮[১] টীমু.। [৩১৭] তু. কে. ৪।৪-৫। [৩১৮] তু. ঋ. ৭।৮৬।৬ (বেমী. ৩।২২৩[৩]); 'অচিত্তি' একটা-কিছু থাকা সত্ত্বেও দেখতে না পাওয়া—'অবিদ্যা'র প্রাচীন সংজ্ঞা, 'অবিবেকে'র সঙ্গে তু. (দ্র. ঋ. ৪।২।১১): আর 'অনৃত' অচিত্তিজনিত প্রমাদ বা স্খলন। আরও তু. 'অচিত্তী য়ৎ তব (হে বরুণ) ধর্মা য়ুয়োপিম (আমরা ব্যাহত করেছি) ৭।৮৯।৫। [৩১৯] তু. ঋ. ৭।৮৯।৩-৪। [৩২০] 'ক্রতু' < √কৃ 'সামর্থ্য; সঙ্কল্প; সিসৃক্ষা'। 'ক্রত্বঃ·· দীনতা' সঙ্কল্পের দৈন্য। [৩২১] তু. ক. ২।১।১৫। [৩২২] 'নিরতি' < নি (গভীরে অন্তরে) √রম্ 'থেমে যাওয়া' আন্তর বিশ্রান্তি। মধ্যযুগের মরমীয়াদের সন্ধাভাষায় শব্দটির অনেক প্রয়োগ আছে; তু. ঋ. ২।১৮।৩, ৩।৩৫।৫, ৭।৩২।১... ('মা নি রীরমন্' যেন আটকে

না রাখে)। [৩২৩] দ্র. ঋ. ১৷২২৷১৬, ১৮ ; বিষ্ণুর উত্তরণ এবং অধিষ্ঠান। [৩২৪] ঋ. ১০৷৯০৷১৬। তত্র 'সাধ্যদেবে'রা লোকোত্তর। [৩২৫] তু. ঋ. শং নো দ্যাবাপৃথিবী পূর্বহূতৌ শম্ অন্তরিক্ষং দৃশয়ে নো অস্তু ৭৷৩৫৷৫। [৩২৬] কে ২৷২, ৪৷৭। [৩২৭] ঋ.তে দীর্ঘতমার অস্যবামীয় সূক্তটি ব্রহ্মোদ্যের একটি সুন্দর উদাহরণ (১৷১৬৪)। তত্র বিশেষ দ্র. ৫, ৬, ৭, ৩৪ ঋক্। আরও দ্র. ১০৷৭১ সূ. ; ১০৷৩১৷১০, ৩২৷৭, ৮৮৷১৮, ৭৷১৷২৩। [৩২৮] দ্র. ঋ. ১০৷৩১৷১০, ৩২৷৭, ৮১৷৪। আরও দ্র. নাসদীয়সূক্ত ১০৷১২৯ সূ.। [৩২৯] তু. ঋ. ১৷৪৷৪ ; ১০৫৷৪, ১২০৷২, ৪, ১৪৫৷১, ২, ১৬৪৷৫, ৬৷২১৷৬, ২২৷৫, ৭৷৮৬৷৩, ৯৷৯৭৷৩৫, ১০৷৭৯৷৬। [৩৩০] দ্র. ঋ. ১৷১৬৪৷৫, ১০৷৭৷৬, ২৮৷৫, ১৷৩১৷১৪, ১৬৪৷২১, ৪৷৫৷২, ৭৷১০৪৷৮, ১০৷১১৪৷৪। তু.নি. 'পাকো পক্তব্যো ভবতি' অর্থাৎ কাঁচা (৩৷১২)। [৩৩১] তু. ঋ. ইনো বিশ্বস্য ভুবনস্য গোপাঃ স মা ধীরঃ পাকম্ অত্রা-বিবেশ ১৷১৬৪৷২১। 'বিজ্ঞানময়' তু. বৃ. স বা অয়ম আত্মা ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণময়শ্ চক্ষুর্ময়ঃ...৪৷৪৷৫। [৩৩২] তু. ঋ. ব্রহ্মচারী চরতি বেবিষদ্ বিষঃ স দেবানাং ভবত্যেকম্ অঙ্গম্ ১০৷১০৯৷৫ ; দ্র. শৌ. ব্রহ্মচারিসূ. ১১৷৫, তত্র সূর্যরূপে 'ব্রহ্মচারী সিঞ্চতি সানৌ রেতঃ পৃথিব্যাং তেন জীবন্তি প্রদিশশ্ চতস্রঃ' ১২। [৩৩৩] বৃ. ৪৷২৷১। [৩৩৪] তু. ঋ. হৃদা তষ্টেষু মনসো জবেষু ১০৷৭১৷৮। 'জব' সংবেগ, 'তক্ষণ' রূপায়ণ। [৩৩৫] ঋ. ৬৷৯৷৬। [৩৩৬] তু. প্র. প্রাণাগ্নি ৪৷৩ ; = প্রজ্ঞা কৌ. ৩৷৩-৪। [৩৩৭] তু. প্র. ৪৷৪। [৩৩৮] তু. ঋ. পরা হি মে বিমন্যবঃ (মনের বিচিত্র সংবেগ) পতন্তি বস্যইষ্টয়ে (উত্তরজ্যোতিকে খুঁজে-খুঁজে), বয়ো (পাখিরা) ন বসতীর্ উপ ১৷২৫৷৪। √পত্ 'ওড়া', তু. 'পতঙ্গ' পাখি (হিন্দীতে 'ঘুড়ি'), 'পতত্র' যা দিয়ে ওড়া যায়, পাখা। [৩৩৯] তু. জৈউ. ৪৷৫৷১৷৫, দ্র. টী. ২৭৭। √ইষ্ 'ছোটানো, প্রেরণা দেওয়া,' তু. 'ইষু' তীর। [৩৪০] ঋ. ৫৷৪৬৷১। [৩৪১] দ্র. বৃ. ৪৷৩৷১২, প্র. ৪৷২-৩, ক. ২৷২৷৮। [৩৪২] দ্র. ছা. ১৷২৷১...। [৩৪৩] দ্র. ঋ. পরমপুরুষের প্রাণ হতে বায়ু ১০৷৯০৷১৩। [৩৪৪] দ্র. ঋ. ৩৷২৯৷১১. বেমী. ৩৷৩৫৬[২]। [৩৪৫] ঐআ. ২৷৩৷২। [৩৪৬] ঋ. ৬৷১৷৮। 'প্রেতি' এবং 'ইষ্'এর সহচার ল.—দুয়ের মধ্যে প্রযোজ্য এবং প্রযোজকের সম্পর্ক। [৩৪৭] তু. ঋ. ১০৷৮৮৷১৮ ; ১৷১৬৪৷৬। [৩৪৮] তু. ঋ. যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়ম্ আয়ন্ তাম্ অন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্ ১০৷৭১৷৩...। [৩৪৯] দ্র. ঋ. ১০৷১১৪৷৮, ১৷১৬৪৷৪৫ ; আবার ১০৷৭১৷৪। [৩৫০] তু.ক. ১৷২৷৭। [৩৫১] ছা. ৩৷১৩৷৬। [৩৫২] কৌ. ৩৷৮। [৩৫৩] তু. ঋ. অন্বীমূ (অগ্নিকে) অবিন্দন্ 'নিচিরাসো' অদ্রুহো ঽপ্সু (অর্থাৎ প্রাণসমুদ্রের গভীরে) সিংহম্ ইব শ্রিতম্ ৩৷৯৷৪। < নি (অন্তরে, গভীরে) √চি 'লক্ষ্য করা, অভিনিবেশ নিয়ে দেখা'। মিত্রাবরুণের বিণ (তু. নি চিন্ মিষন্তা নিচিরা নি চিক্যতুঃ ৮৷২৫৷৯ ;

১।১৩৬।১). তাঁরা আমাদের গভীরে দৃষ্টি ফেলে সব দেখেন বলে। [৩৫৪] ঋ. ১০।৮২।৭। [৩৫৫] তু. ঋ. ইন্দ্রায় হৃদা মনসা মনীষা প্রত্নায় পত্যে ধিয়ো মর্জয়ন্ত ১।৬১।২। [৩৫৬] ঋ. ৭।৯০।৫ ; আরও তু. দেবদ্রীচা মনসা দীধ্যানঃ ১।১৬৩।১২, ৪।৩৩।৯, ১০।১৮।১৩। [৩৫৭] তু. কে. ২।৪ ; ঋ. য়ারৎ তরস্ (তীব্র সংবেগ) তন্বো য়ারদ্ ওজো য়ারন্ নরশ্ চক্ষসা দীধ্যানাঃ ৭।৯১।৪। [৩৫৮] ঋ.৪।৫৮।১১, বেমী. ৩।২১৩[৪]। [৩৫৯] ঋ. সতো বন্ধুম্ অসতি নির্ অবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা ১০।১২৯।৪ [৩৬০] ঋ. ১০।১৯ সূ.। ঋষি 'য়ামায়ন' অর্থাৎ নচিকেতার মতই মৃত্যুপ্রসৃষ্ট (ক. ১।১।১)। এই উপমণ্ডলের সমস্ত ঋষিই তা-ই, কেননা উপমণ্ডলটিতে মৃত্যুরহস্য বিবৃত হয়েছে। আর মৃত্যুই চেতনার পরম নিবর্তন। বৈবস্বত মৃত্যুর চরমে এক বারুণী শূন্যতা (ঋ. ১০।১৪।৭)। বর্তমান সূক্তটিতে দেবতাবিকল্প ল.। তত্র 'অপ্' প্রাণ ; আর 'গাবঃ' ইন্দ্রিয়। তু. ঋ. ইমা য়া গাবঃ স জনাস ইন্দ্রঃ ৬।২৮।৫। সংহিতায় ইন্দ্র গোপতি (ঋ. ১।১০১।৪, ৩।৩১।২১, ৪।২৪।১, ৭।৯৮।৬…) এবং 'প্রথমো মনস্বান্'। মন ইন্দ্রিয়পতি। সুতরাং 'গো' ইন্দ্রিয়। এই সূক্তটিতেও দেবতা-বিকল্প—ইন্দ্র অথবা গো। [৩৬১] ঋ. ২।১২।১। [৩৬২] দ্র. ঋ. ৬।৫৭ সূ., তত্র ইন্দ্র ও পূষা 'রিৎদেব (='রয়ি' প্রাণ ও প্রজ্ঞার প্রবাহদের) নেতা (৪)। [৩৬৩] ঋ. ১০।১৯।১, ৩। 'পূষ্যন্তু'তে পূষার ধ্বনি ল.। [৩৬৪] দ্র. ঋ. ৩।৬২।৭-১২। তার প্রথম তৃচ পূষার, দ্বিতীয়টি সবিতার—প্রসিদ্ধ সাবিত্রী গায়ত্রী ঋক্ যার অন্তর্গত। পুনঃপুনঃ 'ধী'র উল্লেখ ল. (৮, ১০, পুরস্ধ্যা ১১, ১২)। ঊষার পর সবিতা, আর বিষ্ণুর আগে পূষা—অধ্যাত্ম-সাধনার আদি এবং অন্ত। ঊষা আর বিষ্ণু বেদের প্রসিদ্ধ 'যোষা' এবং 'মর্য' (ঋ. ১।১১৫।২, তত্র সূর্য সামান্যবাচী—'আত্মা জগতস্ তস্থুষশ্ চ)—একটি শাশ্বত দিব্যামিথুন। আরও তু. ধিয়ং পূষা জিন্বতু ২।৪০।৬. নরং (পূষাণং) ধীজবনম্ ৯।৯৭।৪৯, পূষে.র ধীজবনঃ ৯।৮৮।৩। [৩৬৫] ঋ. ১।১০।৯ (ইন্দ্র)। [৩৬৬] তু. ঋ. ১০।৫৫।৪ (ইন্দ্র)। [৩৬৭] তু. ঋ. য়ং কাময়ে তং-তম্ উগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তম্ ঋষিং তং সুমেধাম্ ১০।১২৫।৫। দৈবী বাক্ই মানুষী বাকের প্রচোদয়িত্রী। [৩৬৮] দ্র. ঋ. ৬।১।৪, ১০।৮৮।১, ৬, ৫।৬, ১।১১৩।১৬ ; [৩৬৯] দ্র. ঋ. ১।২২।২০ (বেমী. ৩।৪৬২) ; ঋ. ১।৯।৪ (বেমী. ১।১০৭ টীমূ…)। [৩৭০] ঋ. ১০।৯১।১-৩ ; ১০।৮।১৩ তু. অদিতি ১।৮৯।১০ ; এবং বা ইদং বি বভূব সর্বম্ ৮।৫৮।২। [৩৭১] দ্র. বৃ. ৪।৩।২-৭। তু. ঋ. ৬।৯।৪-৫। [৩৭২] দ্র. ঋ. ১০।৮৮।৬ ; ১।১১৫।১ ('অনীক' পুঞ্জজ্যোতি)। [৩৭৩] ছা. ৩।১১।১। এইটি অগ্নিহোত্রীর সিদ্ধি। [৩৭৪] দ্র. ঋ. ১।১১০।৪ ; তু. ৭।৬৬।১০ (আদিত্যগণ, সূর্য যাঁদের চোখ, অগ্নি যাঁদের জিহবা)। [৩৭৫] দ্র. বেমী. পৃ.

৮৯। [৩৭৬] তু. বৃ. ৩।১।৩।৬। [৩৭৭] তু. জৈউ. স য়দি কাময়েত পুনর্
ইহা-জায়েয়ে-তি, য়স্মিন্ কুলে হভিধ্যায়েৎ তস্মিন্ন্ আজায়তে। স এতম্
এব লোকং পুনঃ পুনঃ প্রজানন্ন্ অভ্যারোহন্ন্ এতি ৩।৫।৯।৪ ; ঈ. ১১, ১৪।
[৩৭৮] দ্র. শৌ. ১০।২।২৮ ; অষ্টচক্রা নবদ্বারা দেবানাং পূর্ অয়োধ্যা ৩১ ; ছা.
৮।১।১ (৫।৪) ; কৌ, ১।৩…। [৩৭৯] ঋ. ১০।৭৩।১১। [৩৮০] ঋ. ১০।১২৯।১-২।
[৩৮১] আলোর পর আকাশ, তাই শ্রোত্র এখানে অপেক্ষিত। তু. বৃ. 'অদৃষ্টম্
অশ্রুতম্ অমতম্' ৩।৮।১১ ; পাঁচটি ব্রহ্মপুরুষের দুটি উহ্য। [৩৮২] ঋ. ৬।৯।৬।
[৩৮৩] দ্র. প্র. ৪।৩ ; বৃ. 'সম্প্রসাদ' ৪।৩।১[১]। [৩৮৪] 'সংবিৎ' তু. ঋ. কা স্বিৎ
তত্র য়জমানস্য সংবিৎ ৮।৫৮।১। <সম্ √বিদ্ 'জানা' এবং 'পাওয়া' দুইই,
সুতরাং তার মূলে তাদাত্ম্যবোধ। এই অর্থে সংহিতায় বহুপ্রযুক্ত। তু. ঋ.
অধা কৃণুষ্ব সংবিদং সুভদ্রাম্ ১০।১০।১৪। এখানে বৃ.র 'সম্পরিষ্বঙ্গে'র
ধ্বনি আছে (১।৪।৩ ; ৪।৩।২১)। [৩৮৫] তু. ঋ. চিত্তিম্ অচিত্তিং চিনবদ্
'বি' বিদ্বান্ ৪।২।১১। [৩৮৬] দ্র. ঋ. ২০।১২৯।৪। তু. শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি :
'ঈশ্বরকে কি জানা যায় ? তবে কিনা বোধে তাঁর বোধ হয়'। [৩৮৭] দ্র. ঋ.
১০।১২৯।৭। এই উপনিষদে 'বিদ্' ধাতুর বহুল প্রয়োগ ল. এবং তার সঙ্গে
তু. 'বি-জ্ঞা' ধাতুর প্রয়োগ। সর্বত্র দুয়ের ব্যঞ্জনায় সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে।
[৩৮৮] দ্র. ঈপ্র. ৯-৯১। [৩৮৯] দ্র. ঈ. ১০, ১৩। [৩৯০] দ্র. বেমী. টীম্. ৩।১২৮.…।
[৩৯১] ঋ. ১০।৯০।১। [৩৯২] তু. ঋ 'প্রজ্ঞাতারো ন জ্যেষ্ঠাঃ সুনীতয়ঃ'
১০।৭৮।২ ; 'সংজ্ঞানং' য়ৎ পরায়ণম্ ১৯।৪। [৩৯৩] তু. ঋ. ১০।১২৯।১।
[৩৯৪] তু. ঋ. ১০।৯০।১৬ ; 'সাধ্য' দ্র. ছা. ৩।১৯।১-৪, বেমী. ৩।১৫৭[৬] টী.।
[৩৯৫] দ্র. জৈউ. ১।১।১৬-৮। [৩৯৬] ঋ. ১।১৬৪।৪৫, এখানে মনুষ্যের 'উদিত'
ব্রহ্মাভিসারিণী বাক্এর ধ্বনি আছে। [৩৯৭] ঋ. ১।১৬৪।৪১। [৩৯৮] ঋ.
১০।১১৪।৮। [৩৯৯] দ্র. ঋ. ৯।৩৩।৫। পূর্ব ঋকে তিনটি বাকের প্রসঙ্গ ল.।
[৪০০] ঋ. ৩।৫৩।১৩। [৪০১] তু. ঋ. ১০।৫।৭। [৪০২] দ্র. ঋ. তিস্রো বাচ উদ্
ঈরতে গাবো মিমন্তি ধেনবঃ, হরির্ এতি কনিক্রদৎ ৯।৩৩।৪। [৪০৩] তু. ঋ.
মন্দ্রং বোচেম ১।৭৪।১, ২।৩৫।২…। তখন মন্ত্রের বচনে মননের স্ফুরণ বাকে,
আর এই বাক্ বৈখরী (মনুষ্যোদিত ১।১৬৪।৪৫)। কিন্তু আবার 'মন্ত্রয়ন্তে
দিবো অমুষ্য পৃষ্ঠে বিশ্ববিদং বাচম্ অবিশ্বমিন্বাম্ ১।১৬৪।১০ (দ্র. বেমী.
৩।১২৫ টীম্.)। এখানে বাকের মন্ত্রে পরিণমন, অতএব তার উজানধারা।
বিশ্ববিৎ বাক্ 'ব্রহ্মী' (৯।৩৩।৫)। [৪০৪] ঋ. ৫।২২।৩ (অগ্নির বিণ.)।
'বোধিন্মনাঃ' ৫।৭৫।৫ (অশ্বিদ্বয়)। একজন পৃথিবীস্থান দেবতাদের আদিতে
আর দুজন দ্যুস্থান দেবতাদের আদিতে। [৪০৫] দ্র. বৃ. ১।৫।১৪। [৪০৬] দ্র.
মা. ১৮।৪০। তত্র নি. ২।৬। [৪০৭] তু. ছা. ৮।১২।৫, ফোটে ব্রহ্মলোকে।

[৪০৮] মূলে একবচনে 'পশ্যাতি'। ছন্দের অনুরোধে বচনব্যত্যয়। রঙ্গরামানুজের পাঠ 'পশ্যান্তি'। [৪০৯] দ্র. ঋ. ১০।৬৬।৪; মা. ১১।৩, (তৈস. ৪।১।১।৩)। [৪১০] দ্র. ছা. ১।৬।৬; ঋ. ১০।১২৯।২। [৪১১] দ্র. ঋ. রাত্রিসূক্ত ১০।১২৭।১-২, তত্র 'জ্যোতিষা বাধতে তমঃ' অমানিশার অব্যক্ত জ্যোতি। [৪১২] দ্র. বৃ. জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ ৪।৩।২…। [৪১৩] 'পূর্বচিত্তি' সংহিতায় দিব্যদর্শনের প্রথম ঝলক। তু. ঋ. ১।৮৪।১২, ৮।৩।৯, ৬।৯…। [৪১৪] তু. ঋ. ৬।৯।৬, ১০।৭১।৪। [৪১৫] তু. তৈউ. কর্ণাভ্যাং 'ভূরি' বিশ্রুবম্ ১।৪। [৪১৬] তু. ব্রহ্মের নিশ্বসিতে সবার উদয়-বিলয় বৃ. ২।৪।১০, ৪।৫।১১। [৪১৭] প্র ৪।৩। [৪১৮] তু. দ্র. ঋ. ১৯।১২৯।২-৩। [৪১৯] দ্র. প্র. ৪।৪, ছা. ৮।৩।৪. বৃ. ২।১।১৯, ৪।৩।৯-১৮…। [৪২০] তু. ঐব্রা. উদ্যান্ খলু বা আদিত্যঃ সর্বাণি ভূতানি প্রণয়তি, তস্মাদ্ এনং প্রাণ ইত্যাচক্ষতে ৫।৩১; ঋ. বরুণ প্রণেতঃ ২।২৮।২; ইন্দ্র ৩।৩০।১৮, প্রণেতারং বস্যো অচ্ছা (আলোর দিকে) ৮।১৬।১০, ২৪।৭, ৪৬।১; মরুদ্গণ ৫।৬১।১৫, নিচেতারঃ প্রণেতারো যজমানস্য মন্ম ৭।৫৭।২; অগ্নি 'বস্য আ প্রণেতা' ২।৯।২, অধ্বরস্য ৩।২৩।১, প্রেতীষণিম্ ৬।১।৮…। [৪২১] দ্র. জৈউ. ৩।১।২।৫-৯, ১।১৩।২।১০। [৪২২] অদিতি ঋ. ১।৮৯।১০ ব্যাখ্যা দ্র. জৈউ. ১।১৩।২।৭-৮। [৪২৩] তু. ঋ. দেবানাং পূর্ব্যে যুগে (যুগে প্রথমে) অসতঃ সদ্ অজায়ত ১০।৭২।২, ৩। [৪২৪] তু. ঋ. নাসদ্ আসীন্ নো সদ্ আসীৎ ১০।১২৯।১। [৪২৫] বৃ. দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে, মূর্তং চৈবা মূর্তং চ ২।৩।১…। [৪২৬] বৃ. তস্য হৈতস্য পুরুষস্য রূপম্…সকৃদ্বিদ্যুত্তম্।…অথাত আদেশো নেতি নেতি ২।৩।৬। [৪২৭] তু. ছা. সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্ ইতি শান্ত উপাসীত ৩।১৪।১। [৪২৮] দ্র. ঐআ. ২।১।৫। [৪২৯] ক. ২।১।১। [৪৩০] দ্র. ঋ. ১০।১২১ সূ.। [৪৩১] তু. ছা. ৭।২৫।১-২। [৪৩২] দ্র. ঋ ১০।৮২।২ (বেমী. ৩।১৩৩ টী.) [৪৩৩] তু. ঋ. য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ, যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ ১০।১২১।২। [৪৩৪] তু. ঋ. অন্যদ্ যুষ্মাকম্ অন্তরং বভূব ১০।৮২।৭; তু. বৃ. অন্তর্যামী ৩।৭।৩…। [৪৩৫] তু. ঋ. এবা মহান্ বৃহদ্দিবো অথর্বাবোচৎ স্বাং তন্বম্ ইন্দ্রম্ এব ১০।১২০।৯। [৪৩৬] ঋ তে 'দভ্রে'র বিপরীত 'ভূয়স্', তু. ১।৩১।৬। তাথেকে ছা.র সনৎকুমার নারদ-সংবাদে 'ভুমা'। সেখানে ধাপে-ধাপে নাম হতে ভূমায় উত্তরণের প্রসঙ্গ আছে (৭।১।৫…) প্রত্যেক ধাপের গোড়ায় 'ভূয়ঃ' শব্দের প্রয়োগ ল.। [৪৩৭] তু. ঋ. মহদ্ দেবানাম্ অসুরত্বম্ একম্, ৩।৫৫ সূ.র ধ্রুবা। [৪৩৮] ঋ. ৮।৫৮।২। [৪৩৯] তু. ঋ. পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যো ভারতী মহিনা 'সং বভূব' ১০।১২৫।৮। [৪৪০] দ্র. ঋ. ১।১৬৪।৪১, ৩৯। [৪৪১] দ্র কে. ২।৫, এই প্রসঙ্গেরই শেষে। [৪৪২] দ্র. বৃ. ৪।৩।২১। এই রূপ 'অতিচ্ছন্দা' বা

বিশ্বাতীত। ব॑ধ্‌ 'ৱেন'>'ৱন' (কে. ৪।৬)। [৪৪৩] ঋ. ১৬১।২। 'প্রত্ন পতি' উশতী জায়াদের ইঙ্গিতবাহী। অহিহত্যায় 'গ্নাঃ দেৱপত্ন্যঃ' বলে তাঁদের উল্লেখ পরেই আছে (৮)। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এই দেবপত্নীরা আমাদের ধীবৃত্তি বা মনোবৃত্তি (তু. ঋ. ১০।৪৩।১)। [৪৪৪] দ্র. ছা. ৭।৩।১…৭।৭।১। [৪৪৫] মু. ৩।২।৯। [৪৪৬] দ্র. ঐউ. ৩।১।৩ ; এখানে 'প্রজ্ঞান' সাধ্য। আবার ক. প্রজ্ঞানেনৈনম্‌ আপ্নুয়াৎ' (১।২।২৪) ; এখানে 'প্রজ্ঞান' সাধন। প্রজ্ঞান দিয়ে প্রজ্ঞানকে পাওৱাই প্রতিবোধ। [৪৪৭] দ্র. বৃ. ৪।৫।১৩। [৪৪৮] তু. বৃ. এষ প্রজাপতির্‌ য়দ্‌ হৃদয়ম্‌, এতদ্‌ ব্রহ্ম, এতৎ সর্বম্‌ ৫।৩।১ ; ছা. ৮।৩।৩। [৪৪৯] তু. ঋ. ৱ্যুচ্ছন্তী (আলোয় ঝলমলিয়ে-ওঠা) জীৱম্‌ উদরয়ন্ত্যুষা মৃতং কংচন বোধয়ন্তী ১।১১৩।৮ ; আরও তু. প্রতি গাৱঃ সমিধানম্‌ (অগ্নিম্‌) বুধন্ত (রহস্যার্থ, ভোরে অভীপ্সার আগুন জ্বলে উঠতেই ইন্দ্রিয়েরা প্রতিবুদ্ধ হল অর্থাৎ অগ্নির বোধে তাদের বোধ জাগল) ৭।৯।৪, প্রতি ত্বা দ্য সুমনসো (সুমনা মানুষেরা) বুধন্ত, তিল্‌বিলায়ধ্বম্‌ (ঝলমলিয়ে ওঠ) উষসো ৱিভাতীঃ ৯।৮।৫। [৪৫০] তু. ঋ. অস্বপ্নজো (সুপ্তিহীন) অনিমিষা (আদিত্যাঃ) ·· ঋজৱে মর্ত্যায় ২।২৭।৯। [৪৫১] তু. ঋ. ৱিশ্বান্‌ দেৱাঁ উষর্বুধঃ (উষায় জাগেন) ১।১৪।৯, ৯২।১৮ ; উষর্ভুৎ (অগ্নি) ১।৬৫।৫, ৪।৬।৮, ৬।১৫।১… ; ৱসিষ্ঠা উষর্বুধঃ ৭।৭৬।৬। উষা বা প্রাতিভসংবিৎএর আলোয় 'প্রতিবুদ্ধ' হন অগ্নি যজমান এবং দেবতারা। [৪৫২] 'বোধিন্মনঃ', সর্বত্র বুধ্‌ ধাতুর প্রয়োগ ল.। এই প্রতিবোধের আরেক নাম 'প্রচেতনা' ; তু. ঋ. মহো (মহাজ্যোতির) অর্ণঃ (ঢেউ) সরস্বতী প্র চেতয়তি কেতুনা (তু. 'চিত্তি'), ধিয়ো ৱিশ্বা ৱি রাজতি ১।৩।১২। [৪৫৩] তু. ছা. ৮।১২।৫ ; বৃ. ৩।১।৯ ; ছা. ৩।১৮।১। [৪৫৪] তু. মু. আৱিঃ সন্নিহিতং গুহাচরং নাম ২।২।১। অধিদৈবতদৃষ্টিতে 'আৱিঃ', অধ্যাত্মদৃষ্টিতে 'গুহাচর', তু. ঐআ. ২।১।৫। [৪৫৫] ঋ. ১।৩।১২। [৪৫৬] দ্র. মাণ্ডু. ৪, ৫ (তত্র বেমী.) ; বৃ. ৪।৩।৯…। [৪৫৭] দ্র. বৃ. ৪।৩।১৫ ; ছা. ৮।১২।৩। [৪৫৮] দ্র. বৃ. ৪।৩।৩২। [৪৫৯] তু. যোসূ. স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানালম্বনং ৱা ১।৩৮। [৪৬০] প্র. ৪।৪। [৪৬১] বৃ. ৪।৩।৩২ এবং তারও আগের খণ্ডগুলি। [৪৬২] দ্র. বৃ. 'অস্বন্ত' বা আত্মতত্ত্ব ৪।১।১ ; তু. ক. ১।১।২১, ২।১৩, তত্র 'অণুঃ ধর্ম্মঃ' আত্মতত্ত্ব। [৪৬৩] দ্র. ছা. ৭।২৫।১-২। [৪৬৪] তু. ক. ২।১।১। [৪৬৫] দ্র. ঈ. ৩, তত্র ঈপ্র.। [৪৬৬] দ্র. ঋ. স্বধা অৱস্তাৎ ১০।১২৯।৫। ঋ.তে দেবতারা স্বধায় মত্ত ১।১০৮।১২, ৫।৩২।৪, ৭।৪৭।৩…। [৪৬৭] তু. ঈ. ৱিদ্যয়ামৃতম্‌ অশ্নুতে ১১। 'বিদ্যা' এখানে স্বপ্নসংবিৎ, বৃ.তে ইহলোক এবং পরলোকের মধ্যে 'সন্ধ্যস্থান' (৪।৩।৯…) বা ভাবলোক। তু. রামকৃষ্ণদেবের 'ভাবমুখে থাকা'। [৪৬৮] তু. ঈ. ঈশা 'ৱাস্যম্‌' ইদং সর্বম্‌ ১। 'ইদং সর্বম্‌' সূচিত করছে অন্তরে-বাইরে জাগরণে-নিদ্রায়

সব-কিছু। [৪৬৯] দ্র. ছা. ৮।৩।২…, বৃ. ৪।৩।৯… ; তু.প্র. ৪।৪-৫। [৪৭০] দ্র.ঋ. ১০।১২৯।১-৩। [৪৭১] দ্র.বেমী. পৃ. ৪৮১…। [৪৭২] ঋ. ১০।৭২।২, ৩। [৪৭৩] তু. ঋ. যস্য ছায়া-মৃতং যস্য (হিরণ্যগর্ভস্য) মৃত্যুঃ ১০।১২১।২। ল. সংহিতার 'হিরণ্যগর্ভ' একটি পূর্ণ এবং সংবর্তুল ভাবনা, নব্যবেদান্তের 'হিরণ্যগর্ভ' তার একদেশ মাত্র। [৪৭৪] তু. ঋ. পিতা নঃ…প্রথমচ্ছদ্ অবরাঁ আ বিবেশ ১০।৮১।১। [৪৭৫] দ্র. ঋ. ১০।১৩৫ সূ. ; বেমী. পৃ. ৮৬-৯২। [৪৭৬] 'বিচিতি' < বি √চি 'লক্ষ্য করা' বিবেক ; তু. ঋ. চিত্তিম্ অচিত্তিং চিনবদ্ বি বিদ্বান্ ৪।২।১১, অচিত্তি আর চিত্তিতে তফাত করতে পারাই বিদ্যার লক্ষণ। এখানে সাংখ্য-ভাবনার মূল পাওয়া যাচ্ছে। [৪৭৭] দ্র. ঋ. ১।১৬৪।৩০, বেমী. পৃ. ৩৮৭, টীমূ. ২৪৬। [৪৭৮] দ্র. ঐউ. ৩।৪. তত্র ঐপ্র.। [৪৭৯] তু. ক. ১।১।১০-১১। [৪৮০] দ্র. ঋ. ১৬।১২। [৪৮১] মু. ২।২।১। [৪৮২] তু. ঋ. ১।১৬৪।২০-২২, ৩০ (দ্র. বেমী. টীমূ. ২৪৬)। [৪৮৩] দ্র. ঋ. ১।১৬৪।৩৯, ৪১ ; ১০।১১৪।৮। [৪৮৪] দ্র. জৈউ. অথ যঃ পুরুষঃ স প্রাণস্ তৎ সাম তদ্ ব্রহ্ম তদ্ অমৃতম্। স যঃ প্রাণস্ তৎ সাম। অথ যদ্ ব্রহ্ম তদ্ অমৃতম্ ১।৮।১।১০। [৪৮৫] দ্র. জৈউ. তদ্ এতদ্ অমৃতং গায়ত্রম্। এতেন বৈ প্রজাপতির্ অমৃতত্বম্ অগচ্ছদ্, এতেন দেবা, এতেন ঋষয়ঃ। তদ্ এতদ্ ব্রহ্ম প্রজাপতয়ে হব্রবীৎ ৩।৭।৩।১-২। [৪৮৬] তৈব্রা. ৩।১১।৭।৪ ; ছা. ৩।১১।১-৩। [৪৮৭] ছা. ১।২।১ ; বৃ. ১।৩।১…। [৪৮৮] ঋ. ১০।৬৬।৪। 'স্বর' আদিত্য এবং দ্যুলোকের (আকাশের) সাধারণ নাম (নিঘ. ১।৪)। আকাশ পরমব্যোম এবং বাকের পরমধাম (দ্র. ঋ. ১।১৬৪।৩৯, ৪১)। [৪৮৯] ঋ. ১।১৬৪।৪৬ ; ৫।৬২।১। [৪৯০] ঋ. ১০।১২৯।১, ২, ৪। [৪৯১] শ. ৩।৯।২।৬, ১২, ৪।৩।১।২৬…। [৪৯২] তু. জৈউ. অথ যচ্ ছেত্রম্ আসীৎ তা ইমা দিশো। হভবন্। তা উ এব বিশ্বে দেবাঃ ৩।১।২।৪, ৩।৪।২।৫ (তু. শ. ৩।২।২।১৩, ঋ. ১০।৯০।১৪, ১।১৬৪।৩৯. ৪১)। [৪৯৩] দ্র. তৈউ. 'ব্রহ্ম-বিদ্যা 'ভার্গবী বারুণী বিদ্যা পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা' ৩।৬। [৪৯৪] ঋ. স সমুদ্রো অপীচ্যস্ তুরো দ্যাম্ ইব রোহতি…স মায়া অর্চিনা পদা. স্তৃণান্ নাকম্ আরুহন্ ৮।৪১।৮। বরুণ 'ধৃতব্রত' (১।২৫।৮, ১০…) এবং 'পূতদক্ষ' (১।২।৭, ৫।৬৬।৪…)। পুরাণে 'দক্ষ' প্রজাপতি। [৪৯৫] তু. ঋ. আরৈক্ পন্থাং যাতবে সূর্যায়া. গন্ম যত্র 'প্রতিরন্ত আয়ুঃ' ১১।১১৩।১৬। সূর্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই শুরু হল এই প্রতরণ বা আলোর স্রোতে ভেসে যাওবা। [৪৯৬] > √মহ্ 'সমর্থ হওয়া ; বৃহৎ হওয়া ; আলো দেওয়া'। তু. ঋ. এতাবান্, অস্য মহিমা, হতো জ্যায়াংশ্ চ পুরুষঃ ১০।৯০।৩, ১৬, ১২৯।৫, ৬৬।৫, ১১৪।৮, ১২৫।৮…। রূপান্তর 'মহি'। [৪৯৭] ঋ. ১০।৬৬।৪। [৪৯৮] দ্র. ক. ১।৩।১১, ২।৩।৭। 'বুদ্ধি' বা 'সত্ত্ব' ব্যক্তিগত, 'মহৎ' বিশ্বগত। [৪৯৯] কে. ২।১, ৩।

[৫০০] কে. ৪।২। [৫০১] বৃ. ইদং মহদ্ ভূতম্ অনন্তম্ অপারং বিজ্ঞানঘন এব ২।৪।১২। [৫০২] তু. কে ৪।৪। [৫০৩] তু. ছা. 'স্মর' ৭।১৩।১-২, তত্র বেমী.। [৫০৪] 'যক্ষ' দ্র. ঋ. ৪।৩।১৩, ৫।৭০।৪. ন য়াসু চিত্রং দদৃশে ন য়ক্ষম্ ৭।৬১।৫, অগ্নিং দেবা অজনয়ন্—য়ক্ষস্যাধ্যক্ষঃ...বৃহন্তম্ ১০।৮৮।১৩। < √*য়শ্ ॥ ঈশ্, 'ঈশনা, অনির্বচনীয় সামর্থ্য, মায়া ; ঈশ্বর'। [৫০৫] নিঘ.তে 'মায়া' প্রজ্ঞা (৩।১৬) ; আবার > √মা 'গড়ে তোলা', রূপায়ণী শক্তি, তু. ঋ. নি মায়িনো মমিরে রূপম্ অস্মিন্ ৩।৩৮।৭, তে মায়িনো মমিরে সুপ্রচেতসঃ... নব্যংনব্যং তন্তুম্ আ তন্বতে দিবি (যেন মাকড়সার জালের মত) সমুদ্রে অন্তঃ কবয়ঃ ১।১৫৯।৪। সুতরাং মায়াতে 'ধী'র মত প্রজ্ঞা এবং কর্ম দুয়েরই ধ্বনি আছে। [৫০৬] 'অগ্নি'র বিশেষ বিবরণ দ্র. বেমী. পৃ. ৩১৬...। যাস্কের ব্যু. 'অগ্রণীর্ ভবতি, অগ্রং য়জ্ঞেষু প্রণীয়তে' (নি. ৭।১৪)। > √অজ্ 'লাফিয়ে ওঠা', শিখার দিক থেকে। [৫০৭] তু. ঐব্রা. অগ্নির্ বৈ অবমো বিষ্ণুঃ পরমস্ তদ্ অন্তরেণ অন্যা দেবতাঃ ১।১। [৫০৮] দ্র. বৃ. অন্তর্যামি ব্রাহ্মণ ৩।৭।৩...। 'আত্মা' অন্তর্যামী অমৃত। জাতবেদা অগ্নি জীবাত্মা—জীবে-জীবে অন্তর্যামী, তু. ঋ. জন্মন্‌জন্মন্ (খুব সম্ভবত 'জীবে-জীবে' 'জন্মে-জন্মে' হওয়াও অসম্ভব নয় ; তাহলে দুটি জন্মের মধ্যে অগ্নি 'সূত্র'—বায়ুর মত, দ্র. বৃ. ৩।৭।১-২) নিহিতো জাতবেদাঃ ৩।১।২০-২১। [৫০৯] তু. ঋ. উদ্ উ ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ...সূর্যম্ ।...উদ্ বয়ং তমসস্ পরি জ্যোতিষ্ পশ্যন্ত উত্তরং দেবং দেবত্রা (দেবগণের মধ্যে) সূর্যম্ অগন্ম জ্যোতির্ উত্তমম্ ১।৫০।১, ১০। [৫১০] তু. ঈ. তদ্ ধাবতো ঽন্যান্ অত্যেতি তিষ্ঠৎ ৪। [৫১১] দ্র. টী. ৪৯১। [৫১২] তু. ঋ. নীচীনাঃ স্থুর্ উপরি বুধ্ন (বোধস্থান, মূল) এষাম্ অস্মে অন্তর্ নিহিতাঃ কেতবঃ স্যুঃ ১।২৪।৭ ; ঐউ. ১।৩।১২, ছা. ৮।৬।২, বৃ. ৫।৫।২...। [৫১৩] তু. বৃ. ৩।৯।১০...। [৫১৪] তৈউ. ১।৬। [৫১৫] দ্র. ছা. ৫।১৮।২, এষ (আকাশঃ) বৈ বহুল আত্মা বৈশ্বানরঃ ১৫।১। [৫১৬] দ্র. ঋ. ৩।২৯।১-৩। [৫১৭] ঋ. ১০।৮৮ সূ.। ঋষি আঙ্গিরস 'মূর্ধন্বান্' অর্থাৎ শিরোব্রতচারী (মু. ৩।৩।১০, তু. শৌ. শিরো দেবকোশঃ ১০।২।২৭)। [৫১৮] তু. ঋ. তপা তপিষ্ঠ তপসা তপস্বান্ ৬।৫।৪। [৫১৯] শ্বে. ১।১৪, ২।১২। [৫২০] দ্র. ছা. ১।১।১-২। [৫২১] তু. ঐউ. ১।২।৪ ; ঋ. মুখাদ্...অগ্নিঃ ১০।৯০।১৩। [৫২২] দ্র. ছা. ৩।৬।১-৪ (বেমী. পৃ. ১২৬)। [৫২৩] ক. ১।২।২৩। [৫২৪] দ্র. ঋ. ১০।৯০।১৩-১৪। [৫২৫] ঋ. ২।১২।১। [৫২৬] ছা. ১।৩।৩। [৫২৭] তু. ছা. ৩।১৩।৭। [৫২৮] ঋ. ১০।৬৩।৪। [৫২৯] বৃ. ২।৩।৩ ; আরও তু. ২।৩।৫। [৫৩০] দ্র. ছা. ৪।৩।১...। [৫৩১] দ্র. পাসূ. ১।৩।২০। [৫৩২] ঋ. ১।২।১। [৫৩৩] মু. ২।১।৮। [৫৩৪] ঋ. ৩।২৯।১১। [৫৩৫] ছা. ৩।৫।৩। [৫৩৬] ঋ. ১০।১২৯।২। [৫৩৭] তু. ঐব্রা. ৩।৩০ ; ঋ. ১।১১০।৪। [৫৩৮] তু. ছা. ৮।১২।৫। [৫৩৯] দ্র.

টীম্. ১২২এর পর। [৫৪০] কে. ১৩। [৫৪১] দ্র. টীম্. ১০২…। [৫৪২] তু. জৈউ. ১।৮।১।১…, দ্র. টীম্. ১১৪…। [৫৪৩] ঋ. ১।৮৯।১০। [৫৪৪] দ্র. টীম্. ৫৩৯…। [৫৪৫] তু. ঋ. ১০।১১৪।৮। [৫৪৬] ঋ. ১।১৬৪।৪৫ এবং ১০।৭১।১৫। [৫৪৭] তু. ঋ. ১।১৬৪।৩৯, ১০।৮২।৭। [৫৪৮] কৌ. ২।৫। [৫৪৯] বৃ. ১।৫।২১-২৩; ল. শেষের অনুশাসন, 'তস্মাদ্ একম্ এব ব্রতং চরেৎ প্রাণ্যাচ্ চৈ. বা. পান্যাচ্চ।' এইটিই তন্ত্রোক্ত হংসমন্ত্র জপের মূল। [৫৫০] ছা. ১।১।১। [৫৫১] অত্র দ্র. বেমী. পৃ. ১১১, টী. ৫৭। [৫৫২] দ্র. ঋ. ৪।৩০।৮-৯; তত্র ল. 'স্ত্রিয়ং… দিবঃ দুহিতরং… মহীয়মানাম্'; কে.র বিবৃতিও অনুরূপ। [৫৫৩] নি. ১২।১২, তত্র দুর্গ। [৫৫৪] ছা ৮।১৪।১। [৫৫৫] ঋ. ১০।১২৫।৮। ল. 'এতাবতী মহিনা সং বভূব'। [৫৫৬] বৃ. তস্মাদ্ ইদম্ অর্ধবৃগলম্ ইব স্বঃ।…তস্মাদ্ অয়ম্ আকাশঃ স্ত্রিয়া পূর্যত এব ১।৪।৩। কাকে লক্ষ্য করে যাজ্ঞবল্ক্যের এই উক্তি, তার কোনও উল্লেখ নাই। তবে মৈত্রেয়ীকে তিনি বলেছিলেন, দাম্পত্য-প্রেমের মূলে আছে আত্মাকেই পরস্পরের মধ্যে কামনা করা ২।৪।৫। [৫৫৭] ঋ. ১০।১২৯।২, ৪। [৫৫৮] দ্র. ঋ. মাতা বৃহদ্দিবা ১০।৬৪।১০; উর্বশী বৃহদ্দিবা ৫।৪১।১৯; সরস্বতী বৃহদ্দিবা ৪২।১২; দ্র. বেমী. টীম্. ৩।৪১৩…। [৫৫৯] দ্র. বেমী. 'মরুদ্গণ'। তাঁরা 'শুভংয়াবা' (ঋ. ৫।৬১।১৩)। [৫৬০] দ্র. বেমী. 'লোকসংস্থান'। [৫৬১] দ্র. ছা. একবিংশত্যা.দিত্যম্ আপ্নোতি।… দ্বাবিংশেন পরম্ আদিত্যাজ্ জয়তি, তন্ নাকম্, তদ্ বিশোকম্ ২।১০।৫। তু. শ. ৮।৪।১।২৪, তা. ১০।১।১৮; নি. কম্ ইতি সুখনাম তৎ প্রতিষিদ্ধং প্রতিষিধ্যতে ২।১৪। [৫৬২] তৈআ. ১০।১৮।১ (খিল)। [৫৬৩] তৈস. ১।৮।৬।১; দ্র. বেমী. পৃ. ১১১[৫৭]। [৫৬৪] দ্র. ঋ. ১০।৩।৩ (উষা এবং সূর্য); ৬।৫৫।৪, ৫ (উষা এবং পূষা); ১০।১০।১১, ১২ (যমী এবং যম)। [৫৬৫] তু. ঋ. পুষ্যাৎ ক্ষেমে অভি য়োগে ভবাতি ৫।৩৭।৫; ক্ষেমস্য চ প্রয়ুজশ্ চ ত্বম্ ঈশিষে ৮।৩৭।৫ (দ্র. 'য়োগক্ষেমম্' ১০।১৬৬।৫)। [৫৬৬]শৌ. ১৯।২।১। [৫৬৭] দ্র.পাস্. ৪।৪।১১২, তত্র কাশিকায় ধৃত উদাহরণ 'হৈমবতীভ্য স্বাহা'। [৫৬৮] ঋ. ১০।১২১।৪। [৫৬৯] বৃ. ৩।৮।৯। [৫৭০] ঋ. ৭।৯৫।২। [৫৭১] দ্র. ঋ. ৯।৬৭।৩১-৩২। [৫৭২] ঋ. অম্বিতমে নদীতমে দেবিতমে সরস্বতি ২।৪১।১৬; যস্ তে স্তনঃ…সরস্বতি তম্ ইহ ধাতবে (পানের জন্য)কঃ ১।১৬৪।৪৯। 'অম্বা, অম্বী' > 'অম্বিকা, অম্বালী, অম্বালিকা'। এখনও শৌরসেনী প্রাকৃত থেকে উদ্ভূত হিন্দীতে 'অম্মা' = মা। [৫৭৩] তু. ঋ. মাতা বৃহদ্দিবা ১০।৬৪।১০ (২।৩১।৪); অদিতির্ মাতা ১।৮৯।১০। [৫৭৪] ঋ. ৩।৬।৮, ৪।১৯।১, ৫।৫।১, ৫২।১২, ৭।৩৯।৪, ১০।৬।৭, ৩১।৩, ৩২।৫, ৭৭।৮, ১২০।১, ৩। [৫৭৫] ঋ. ১।৩৪।৬, ১১৮।৭, ৬।৫০।৭, ৭।৬৮।৫, ৬৯।৪; ১০।৩৯।১। প্রায় সমস্ত প্রয়োগ অশ্বিদ্বয়ের প্রসঙ্গে—যাঁরা মধ্যরাত্রের পর হতে দ্যুস্থান

দেবতা। বরুণের মতই তাঁদের 'ওম' যেন আমাদের 'আবৃত' করে আছে। একজায়গায় দেবতারা 'ওমাসঃ' ১৩।৭। আবার 'ওমম্'এর অনুরূপ 'ওম্য'- ১।১১২।৭, ২০ (পদপাঠ 'ওম্যা'-)। এ-দুটি প্রয়োগও অশ্বিদ্বয়ের প্রসঙ্গে। মনে হয়, 'ওম' যেন চেতনার গহনে অনতিস্বচ্ছ একটি আলোর ঘেরাটোপ। [৫৭৬] শ. ৬।৬।১।২৪। [৫৭৭] দ্র. পাসূ. ৫।২।১, ৪। উমার খেতের সংজ্ঞা 'উম্য' বা 'ঔমীন'। প্রত্যয়টি হচ্ছে 'ধান্যানাং ভবনে ক্ষেত্রে'। কিন্তু উমা ঠিক ধান্য নয়। এ নিয়ে মহাভাষ্যে কিছু বিচার আছে (৫।২।১)। সূত্রের 'ধান্য' উপলক্ষণ মাত্র। [৫৭৮] দ্র. শ. সাভা. ঐ; অমরকোষ ২।৯।৩০। [৫৭৯] দ্র. বেমী. টীমূ. ২২৭...। [৫৮০] দ্র. শ. ৬।৬।১।২২-২৪, তত্র সাভা.। যজমানের শরীরই 'উখা' ('উষা')। অনুষ্ঠানটি অগ্নিচয়নপ্রকরণের অন্তর্গত। অগ্নিচয়নের লক্ষ্য হল শরীরস্থ যোগাগ্নিকে আদিত্যদীপ্তিতে রূপান্তরিত করে। পিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডের একত্বসাধন। উষায় ব্রহ্মের আকাশ-শরীরে প্রথম আগুন ধরে। [৫৮১] ঋ. খিল. প্রৈষাধ্যায় ২। [৫৮২] দ্র. ঋ. ১০।১৩০।১-২, ৬।৯।২-৩। এই উপমা চলে এসেছে মধ্যযুগ পর্যন্ত। তাইতে যোগী=যুগী=জোলা। [৫৮৩] সপ্তশতী ২।১২। [৫৮৪] দ্র.ঋ. ১০।৮৩, ৮৪ সূ.। [৫৮৫] সপ্তশতী ২।২৯, ৩৪। [৫৮৬] সপ্তশতী ৫।৭, ৮৪, ৮৮, ৯০, ৬।৮, ১৫-১৯, ৭।৩। [৫৮৭] সপ্তশতী ৩।২৮, ৩০, ৩৪, ৩৫, ৪।৪, ৫।৮৯, ৬।১৩, ২৪, ৭।২৩, ৮।৮, ১৩, ৯।১৭, ৩২-৩৪, ১০।১২, ২২, ২৪, ২৫...। [৫৮৮] সপ্তশতী ৮।২২, ২৪, ২৮। [৫৮৯] ঋ. ১০।৯২।৯, দ্র, বেমী. পৃ. ১১৯[৮৪]। [৫৯০] দ্র. নি. ১।২০। [৫৯১] তু. ঋ. ১।১০।২। [৫৯২] দ্র. যথাক্রমে ঋ. ৮।৯৪।১২; মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ (=১।১৫৪।২, বিষ্ণু, ইন্দ্র এবং বিষ্ণুর সারূপ্যের ধ্বনি) ১০।১৮০।২; পীয়ূষম্ অপিবো গিরিষ্ঠাম্ (তু. তন্ত্রের 'সহস্রারচ্যুতামৃত') ৩।৪৮।২, ৯।১৮।১, ৬।২।৪, ৮৫।১০; ১।১৫৪।২, ৩ ('গিরিক্ষিৎ')। [৫৯৩] তৈস. ৪।৫।১।১, ২, ৫।১; মা. ১৬।২৯। [৫৯৪] তু. ক. ১।৩।১; দ্র.ঋ. ১০।১২৯।২খ। [৫৯৫] ঋ. ১০।৮৮।১৩। [৫৯৬] ঋ. ৭।৮৮।৬। [৫৯৭] ঋ. ১।১৯০।৪। [৫৯৮] ঋ. রুক্মদৃশো ন শুভয়ন্ত মর্যাঃ ৭।৫৬।১১ এখানে বাজিকরের খেলার ধ্বনি আছে—সুরূপ তরুণেরা যেন সেজে-গুজে বাজি দেখতে যাচ্ছে। কিন্তু 'মর্য' এবং 'শুভ্' দুটি সংজ্ঞাই মরুদ্গণের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত—এইটি ল.। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে, এ হল অনালোকের আলোয় ক্রমে ঝলমলিয়ে ওঠা (তু. ক. ২।২।১৫)। [৫৯৯] দ্র. ঋ. ৪।৩।১৩, ৫।৭০।৪; প্রতিতু. ৭।৬১।৫। [৬০০] শৌ. ১০।২।৩১-৩২। 'ত্র্যর' তিনটি অর বা চক্রশলাকা যার; তিনটি গুণের ইশারা। তিনটি 'প্রতিষ্ঠা' তিনটি ভুবনে। [৬০১] শৌ. ১০।৮।৪৩। [৬০২] শৌ. ১০।৭।৩৮। [৬০৩] শৌ. ১০।৮।১৫। [৬০৪] শৌ. ১১।২।২৪। [৬০৫] মা. ৩৪।২। [৬০৬] শ. ১১।২।৩।৫। [৬০৭] তৈব্রা. ৩।১১।১।১-২১। [৬০৮] তৈব্রা. ৩।১২।৩।১।

[৬০৯] গোপথব্রা. ১।১।১। [৬১০] দ্র. সামবিধানব্রা. ২।৫।৭। [৬১১] ছান্দোগ্যব্রা. ১।৭।১৪। [৬১২] শাআ. ১২।৫। [৬১৩] ঋ. ১।১১৫।১। [৬১৪] ঋ. ১০।১২৫।৫। [৬১৫] ছা. ৪।১৫।৫, ৫।১০।২ ; তু. বৃ. ৬।২।১৫, তত্র 'পুরুষো মানসঃ=পুরুষঃ অমানসঃ। [৬১৬] ক. ২।১।৭। [৬১৭] দ্র. ঋ. ১।১৬৪।৪৬ (দ্র. বেমী. ৩।৪২ টী.)। [৬১৮] 'ভূমন্' দ্র. ঋ. ৯।৯৭।২৩, ৭৪।৭, ১০।১।৭...। সাধারণত 'ভূমি'-অর্থেই প্রয়োগ বেশী। [৬১৯] দ্র. ছা. ৭।১।১...। নারদের প্রতি সনৎকুমারের অনুশাসন 'ভূমৈ-র সুখম্' ৭।২৩।১। প্রসঙ্গের পর্বে-পর্বে 'ভূয়ঃ' শব্দের উল্লেখ ল.। [৬২০] ঋ. ১।১৬৪।৪৬। [৬২১] ঋ. ১০।১২৯।১, ৭। [৬২২] ঋ. অর্বাগ্ দেবা অস্য বিসর্জনেন ১০।১২৯।৬। [৬২৩] ঋ. ৩।৫৫ সূ.-র ধুয়া। [৬২৪] তু. ছা. ৩।১২।৭-৯। আকাশ বাইরে, আকাশ অন্তরে, আকাশ হৃদয়ে। [৬২৫] ঋ. ১০।৯১।১৩। [৬২৬] ঋ. ১।৬২।১১। [৬২৭] দ্র. ঋ. ১০।১১২।৩। [৬২৮] ঋ. ৯।১১৩।৬, ৫। [৬২৯] ঋ. ১০।১৪৯।১-২। [৬৩০] দ্র. ঋ. ১০।১২৫।৮। [৬৩১] গী. ৬।২৮। [৬৩২] ঋ. ৯।১১৩।৮-১১। [৬৩৩] দ্র. জৈউ. ৪।১২।১।১-১৭। [৬৩৪] দ্র. ছা. ১।৬।১-৭।৪। আরও তু. শৌ. ১৪।২।৭১ ; ঐব্রা. ৮।২১ ; তৈব্রা. ৩।৭।১।৯ ; বৃ. ৬।৪।২০। [৬৩৫] তু. শ অগ্নি-সম্পর্কে বিভিন্ন 'আদেশ' ১০।৪।৫।১... ; তৈউ. ১।১১, ছা. ৩।১৯।১, ৬।১।৩, ৬, ৩।১৮।১ ('আদিষ্টম্') ; বৃ. ২।৩।৬ (৪।২।৪, ৪।২২, ৫।১৫)। [৬৩৬] দ্র. তৈউ. তস্য...আদেশ আত্মা (দেহকাণ্ড ; হৃদয় ; চৈতন্যের অধিষ্ঠান) অথর্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা ২।৩। ওই আদেশ পুচ্ছ হতে উজিয়ে চলেছে তু. ছা. ৩।৪।১, ৫।১। [৬৩৭] ছা. ৩।৫।১-২। [৬৩৮] দ্র. টীমূ. ৪২৮। [৬৩৯] ঐব্রা. ২।৪০। [৬৪০] ঋ. ১।১১৫।১। [৬৪১] তৈউ. য়শ্ চা-য়ং পুরুষে, য়শ্ চা-সাব্ আদিত্যে স একঃ ২।৮। [৬৪২] ঋ. ১০।৯০।২। [৬৪৩] ঈ. ১৬। [৬৪৪] ক. ২।১।১০-১১ ; তু. বৃ. ৪।৪।১৯। [৬৪৫] তু. ঋ. আরে অস্মদ্ অমতিম্ আরে বিশ্বাং দুর্মতিং য়ন্ নিপাসি (অন্তর্যামী হয়ে বাঁচাও যখন) ৪।২।১১, আরও তু. ন দক্ষিণা বি চিকিতে (তফাত করতে পারিনি) ন সব্যা (বাঁদিক) ন প্রাচীনম্ (পূবদিক) আদিত্যা নো-ত পশ্চা, পাক্যা (নির্বোধ) চিদ্ বসবো (হে জ্যোতির্ময় দেবগণ) ধীর্য়া চিদ্ য়ুষ্মানীতো অভয়ং জ্যোতির্ অশ্যাম্ ২। ২।২৭।১১, উর্ব্-শ্যাম্ অভয়ং জ্যোতির্ ইন্দ্র, মা নো দীর্ঘা অভি নশন্ (নাগাল পায়) তমিস্রাঃ ১৪। [৬৪৬] তৈউ. আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন ২।৪, কুতশ্চন ৯। [৬৪৭] তু. ঋ. ৮।৪৮।৩। [৬৪৮] বৃ. তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ ৩।৫।১। [৬৪৯] ঋ. ১।১১৫।১, ৪-৬। [৬৫০] ঋ. ৫।৪৪।১, নিত্যকালের মত, আগেকার মত, সবার মত, এই (আমার) মত করে। [৬৫১] রবীন্দ্রনাথ, 'গীতবিতান' পূজা ৩৪০। [৬৫২] ঋ. ১।২২।২০। [৬৫৩] ঋ. ৬।৯।৬। [৬৫৪] ঋ.... কুবিৎ পতিদ্বিষো য়তীর্ ইন্দ্রেণ সংগমামহৈ ৮।৯১।১, ৪। [৬৫৫] দ্র. ছা. ৭।

১৩।১···, তত্র বেমী.। [৬৫৬] < √স্মৃ > *মৃ ‘ঝলমল করা’ > ‘ময়ূ’, ‘মরুৎ’ ;
তু. ঋ. প্রতি স্মরেথাং (ঝলমলিয়ে ওঠ চোখের সামনে)···ইন্দ্রসোমা ৭।১০৪।৭,
অনু হি স্মরাথঃ (অশ্বিদ্বয়) ১০।১০৬।৯। আদ্যবর্ণলোপ তু. √*স্পশ্ >
পশ্, স্পৃৎ > পৃৎ...। [৬৫৭] যোসূ. ১।৬, ১১ ; প্রতিতু ১।২০ ; তু. ১।৪৩।
[৬৫৮] ছা. আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ ৭।২৬।২। [৬৫৯] দ্র.
গী. ৮।৭, ৯। এ-স্মৃতি তৈলধারাবৎ। [৬৬০] ঋগ্‌বেদ-সর্বানুক্রমণী ২।১৪,
১৫ ; ঋ. ১।১১৫।১। [৬৬১] দ্র. ছা. ৮।১।১, ৩। [৬৬২] ঋ. ১০।১৫১।৪।
[৬৬৩] ঋ. ১।৬১।২। [৬৬৪] বৃ. ৪।২।৭। [৬৬৫] তৈউ. রসো বৈ সঃ, রসং হ্যে-বা য়ং
লব্ধ্বা নন্দীভরতি ২।৮। [৬৬৬] দ্র. ঋ. ১।৯০।৬-৮। [৬৬৭] তু. ঋ. ১০।৯১।১৩।
[৬৬৮] বৃ. ১।৪।৩, ৪।৩।২১। [৬৬৯] দ্র. মু. ২।২।১। [৬৭০] দ্র. নি. ১২।১২ ;
ঋ. ৫।৮।১২, ৪।৫৩।৬, ৪।৫৪ সূ.। [৬৭১] নি. ১২।১২, তত্র দুর্গ। [৬৭২] দ্র. ঋ.
৪।৪২।৮-৯। [৬৭৩] তু. ঋ. পতিং ন পত্নীর্ উশতীর্ উশন্তং স্পৃশন্তি ত্বা
শবসাবন্ (তোমার শৌর্য দিয়ে আমায় আগলে আছ, হে দেবতা) মনীষাঃ
১।৬২।১১ ; তু. ১০।১৬।১২···। [৬৭৪] ‘বন্’ : অগ্নি ‘বনাং গর্ভঃ’ ১০।৪৬।৫,
শ্যেনো বংসু সীদতি ৯।৫৭।৩, ৮৬।৩৫ ; ‘বনা’ অধরারণি : বনা জজান সুভগা
বিরূপম্ ৩।১।১৩ (অনন্য প্রয়োগ) ; ‘বনস্’ : আয়াহি (উষঃ) বনসা সহ
১০।১৭২।১ (ঐ)। [৬৭৫] নিঘ. ‘বনোতি কান্তিকর্মা ২।৬। দ্র. বেমী. ৩।২২৪[১]
টী.। [৬৭৬] দ্র ঋ. ১।৪৩।৯, ৫।৩১।২, ৩৬।৪. ১০।১৩৫।১··। [৬৭৭] দ্র. ঋ
৮।৩।১৮, ১।৩৪।২, ৮।১০০।৫, ৯।৬৪।২১ ; ৮।৪১।৩। [৬৭৮] দ্র. ঋ: ইন্দ্র ৮।৬৩।১ ;
বৃহস্পতি ১।১৩৯।১০ ; সূর্যো ব্রতপা বেনঃ ১।৮৩।৫ ; সোম অথবা সূর্য
বেনসূক্তে ১০।১২৩ সূ. তত্র ঋষিও ‘বেন’। [৬৭৯] দ্র. ঋ. সোমস্য বেনা
১।৩৪।২ ; সূর্যাবিবাহ ১০।৮৫ সূ.। [৬৮০] ঋ. ৪।৫৮।৪। ‘গো’ সূর্য (১০।
১৮৯।১), তাতে ‘ঘৃত’ জ্যোতির ধারা (দ্র. বেমী. ৩।১৬৪।১ টী.), ‘পণি’
মানুষের মধ্যে বণিক্-বৃত্তি, দেবতার সম্বন্ধে বিত্তশাঠ্য (দ্র. বেমী. পৃ. ২৭৮)।
[৬৮১] ঋ. ১০।৮১।৪। উপনিষদের সঙ্গে ভাষাসাদৃশ্য ল.। ‘তদ্ বনম্’ যেন
প্রশ্নের উত্তর—‘সেই বঁধুই দ্যাবাপৃথিবীর উপাদান’। প্রশ্ন জাগে ‘মনে’—
মনীষার একধাপ নীচে। উত্তর খোঁজা হৃদয়ে—তার একধাপ উপরে (১০।
১২৯।৪)। [৬৮২] দ্র. ঋ. ১০।১২৯।৩, ৫ ; আরও তু. গৌরীর সলিলতক্ষণ ১।
১৬৪।৪১, বরুণের জীবে-জীবে ‘কেতু’র নিধান ১।২৪।৭। [৬৮৩] নিঘ. ১।১২, ৫।
[৬৮৪] দ্র. ঋ ১।১৬৪।৪। [৬৮৫] ঋ. ১০।১৭৩।১। [৬৮৬] শৌ. ৬।৯।১, ৩। [৬৮৭] দ্র.
বেমী. ৩।২৪৬ টী. ‘বৃক্ষ’। [৬৮৮] ঋ. ১।১৬৪।২২, ২০। [৬৮৯] ঋ. ১।১৫৫।৬৭।
[৬৯০] ঋ. প্রাতর্জিতং ভগম্ উগ্রং (বজ্রের মত চক্রবাল বিদীর্ণ করছেন বলে)
হুবেম ৭।৪১।২। [৬৯১] ঋ. ১।১৬৩।৬ (দ্র. বেমী ৩।৫১৫[৬] টী.)। তু. শৌ.

ব.বি./উপনিষৎ/পূ.৬২-৯

২।৩০।৫, তত্র 'ভগ'=সোহাগ (<'সৌভাগ্য'; 'favors' Whitney)। [৬৯২] জৈউ. ৪।৫।১।১। [৬৯৩] দ্র. ঋ. ১৩৫ সূ. (২, ৪, ৬, ৯); ১০।১৩৯।৪-৫ ('বিশ্বাবসু' বিশ্বকে যিনি উদ্‌ভাসিত করেন)। [৬৯৪] দ্র. ঋ. ১০।৮৮ সূ., বিশেষত (৬)। [৬৯৫] শৌ. ৬।১২৯।৩। শব্রা. পূষার অন্ধতা প্রাশিত্রভক্ষণের পরিণাম ১।৭।৪।৬। 'প্রাশিত্র' পুরাণের হলাহল—নীলকণ্ঠ শিব ছাড়া যার ভোক্তা নাই। ওটি কুর অনালোকের প্রতীক (২।২।১৫)। [৬৯৬] তৈউ. ২।৭; আরও তু. ঋ. ৯।১১৩।৩। [৬৯৭] ঋ. ৩।৫৩।১০, ৯।৭৪।৩, ১০।৯৪।৯, ১৭০।১; ৯।১১৩।৬-১১। [৬৯৮] দ্র. ছা. ৮।১২।৩, ৩।৪, ৬।৩; বৃ. ২।১।১৮-১৯, ৪।৩।৯-১৮...। [৬৯৯] ছা. ৮।১২।৩। [৭০০] দ্র. বৃ. 'স্বপ্ন চরিত্র' ৪।৩।১৫, ৩৪। [৭০১] জৈউ. ৩।৬।১।৭-২।২। [৭০২] তু. বৃ. তদ্ বা অস্যৈতদ্ অতিচ্ছন্দা অপহতপাপ্মাভয়ং রূপম্। তদ্ যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্, এবম্ এবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্ ৪।৩।২১। [৭০৩] দ্র. কে. ১।৩। [৭০৪] তু. ঋ.... এতদ্ বৈ ভদ্রম্ অনুশাসনস্যোত শ্রুতিং বিন্দত্যঞ্জসীনাম্ ১০।৩২।৭। [৭০৫] ক. ১।২।৭। [৭০৬] দ্র. ঋ. ৭।১০৩।৫। [৭০৭] তু. ঋ. অধি পেশাংসি বপতে নৃতুর্ ইবাপোর্ণুতে বক্ষঃ ১।৯২।৪, ৬।৬৪।২। [৭০৮] দ্র. কে. ১।৩; ৪।৪; ৪।৭। [৭০৯] দ্র. ছা. যদ্ এব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা, তদ্ এব বীর্যবত্তরং ভবতি ১।১।১০। [৭১০] ঋ. ইনো বিশ্বস্য ভুবনস্য গোপাঃ স মে ধীরঃ পাকম্ অত্রাবিবেশ ১।১৬৪।২১। [৭১১] তু. জৈউ. তদ্ ধ বিশ্বামিত্রঃ শ্রমেণ তপসা ব্রতচর্যেণেন্দ্রস্য প্রিয়ং ধামোপজগাম। তস্মা উ হৈতৎ প্রোবাচ যদ্ ইদং মনুষ্যান্ আগতম্। তদ্ ধ স্ম উপনিষসাদ জ্যোতির্ এতদ্ উক্থম্ ইতি (এমনি করে ইন্দ্রের কাছ থেকে জমদগ্নি পেলেন আয়ুর রহস্য, বসিষ্ঠ গোর রহস্য) ৩।১।৩।৭...। 'উপনিষৎ' সংজ্ঞার প্রাচীন ব্যু. পাওয়া যাচ্ছে। [৭১২] দ্র. শব্রা. ১০।৪।৫।১। [৭১৩] তু. ঋ. ১০।৭৩।১১। [৭১৪] তু. শব্রা. তস্য বা এতস্যাগ্নেঃ বাগ্ এবোপনিষৎ ১০।৫।১।১ আরও তু. তৈউ. আচার্যের অনুশাসনের পর্ব-পরম্পরাঃ 'এষ আদেশঃ, এষ উপদেশঃ, এষা বেদোপনিষৎ। এতদ্ অনুশাসনম্, এবম্ উপাসিতব্যম্' ১।১১। [৭১৫] তু. ঋ. মা নো নিদ্রা ঈশত মোত জল্পিঃ ৮।৪৮।১৪। [৭১৬] অগ্নি তপোদেবতা, তিনিই তপস্বান্, তু. ঋ. তপা তপিষ্ঠ তপসা তপস্বান্ ৬।৫।৪। আরও তু. শমায়ে অগ্নে তন্বং জুষস্ব (অধিযজ্ঞ-দৃষ্টিতে বেদিতে, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে দেহে) ৩।১।১। তপের পরিণামে 'স্বর্' আলো বা সুর বা দুইই (ঋ. ১০।১৫৪।২)। তৈউ. তে তপোনিত্য পৌরুশিষ্টি তপঃকে সবার উঁচুতে রেখেছেন (১।৯)। [৭১৭] দ্র. ঋ. যজ্ঞসূ. ১০।১৩০ (তত্র 'দেবকর্ম' ১)। [৭১৮] দ্র. বৃ. ৫।২।১; আরও তু.

‘দান্ত’ ৪।৪।২৩। [১১৯] দ্র. ঋ. ১০।১৯০।১+১২৯।৩। [১২০] দ্র. বৃ. ৫।৩।১+৪।১। [১২১] দ্র. ঋ. ৭।৩২।১৮, ৯৪।৩, ৮।১৯।২৬। [১২২] দ্র. ঋ. ৯।১১৩।৬-১১। [১২৩] দ্র. বৃ. ২।৩।৬। [১২৪] ছা. ৮।৫।৩ (কৌ. ১।৩)। ‘অজ্যেয়’ দ্র. শ. ১১।৫।৭।১।

নির্ঘণ্ট

[সংখ্যাগুলি মূলস্থ টীকার সংখ্যা। শব্দটি তার কাছাকাছি কোথাও আছে। উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যকার শব্দগুলি পারিভাষিক। † 'এবং' ; ॥ 'সমার্থক'।]

গ্রন্থকার পরিচিতি

অনির্বাণ—মরমী বেদ ভাষ্যকার, মনীষী অধ্যাত্মপুরুষ। ১৩০৩ সালের (ইং ১৮৯৬) ২৪শে আষাঢ় মৈমনসিংহে জন্ম। পূর্ব নাম নরেন্দ্রচন্দ্র ধর। পিতা রাজচন্দ্র ধর ও মাতা সুশীলা দেবী। ঢাকা ও কলকাতায় কঠোর ছাত্রজীবন যাপন করে ম্যাট্রিকে বৃত্তিলাভ এবং বি.এ. ও এম.এ. পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। পিতা সপরিবারে সংসার ত্যাগ করে শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দের আশ্রয় গ্রহণ করেন। নরেন্দ্রচন্দ্রও তাঁর কাছে ১৯১৪ সালে ব্রহ্মচর্য ও ১৯২৭ সালে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস নাম শ্রীমৎ নির্বাণানন্দ সরস্বতী। আসামের কোকিলামুখস্থিত আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠে সুদীর্ঘ বারো বৎসর পরিচালক, ঋষি বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও পরে আচার্য এবং প্রখ্যাত আর্যদর্পণ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

১৯৩০ থেকে স্বাধীন পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরূপে হিমালয়ের বিভিন্ন স্থানে নিভৃতে সাধনা করেন। আলমোড়ায় বালক বয়সে দৃষ্ট জীবনদেবতা হৈমবতী বা বেদময়ী বাকের পূর্ণ উদ্ভাস লাভ করে বেদকে সমগ্র ভারতীয় সাধনা, দর্শন ও সংস্কৃতির মূলাধাররূপে দর্শন করেন। তাঁর বাকি জীবন এই সত্যদর্শনেরই বিবৃতি। এই মহাসমন্বয়ের উপলব্ধি বিস্ময়কর পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে মণ্ডিত করে শিলঙে রচনা করেন মহাগ্রন্থ বেদমীমাংসা, যা পরে রবীন্দ্রপুরস্কার লাভ করে। শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে উপলব্ধ সত্যের প্রতিফলন দেখে বেদভাষ্যের সঙ্গে সঙ্গে অরবিন্দ-ভাষ্য রচনাও তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রত হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর Life Divine-এর অনুবাদকে শ্রীঅরবিন্দ A living translation বলে অভিনন্দিত করেন।

১৯৬৪ সাল থেকে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করেন এবং বৈদিক ও অরবিন্দ-সাহিত্য সম্পর্কে নিয়মিত প্রবচন, উপনিষদ্-ভাষ্য রচনা, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদির মধ্য দিয়ে উপলব্ধ জীবনসত্যকে প্রকাশ করে চলেন।

বাইরে শীর্ণ তপস্বীমূর্তি, ভেতরে রসাবিষ্ট অনির্বাণ ছিলেন অন্তরে অন্তরে বাউল। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর প্রাণপুরুষ। তিনি মনে করতেন, বৈরাগ্য ও প্রেম এই উভয়ের যুগনদ্ধতাই জীবনের মহত্তম শিল্প।

ভারত-বন্দনা রূপে সংকল্পিত তাঁর ভারত-পরিক্রমা ১৯৬৭তে কেদার-বদ্রিনাথে সমাপ্ত হয়। ১৯৭১-এ আকস্মিক পতনজনিত আঘাতের ফলে গুরুতর ব্যাধিগ্রস্ত হন। ঐ অবস্থাতেও বহু স্বদেশী ও বিদেশী অধ্যাত্মপিপাসু ও জ্ঞানার্থীর আশ্রয়-স্থল ছিলেন। ১৯৭৮-এর ৩১শে মে পরলোকে প্রয়াণ করেন।

গৌরী ধর্মপাল